অন্নপূর্ণাচরিত।

শ্রীশ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

১ম সংস্করণ।

বগুড়া রায় প্রেসে

শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

১৫২. বেঙ্গ. ৪৭৩.৪

উৎসর্গ।

—o—

পরম কল্যাণীয়া,

স্নেহময়ী, দয়াশীলা, শ্রীমতি শরৎশশী গুপ্তা
সমীপে—

শরৎশশি!

তুমি অন্নপূর্ণাকে যেরূপ ভাল বাসিতে স্ত্রীজন মধ্যে তাহার আর এরূপ সুহৃদ ছিল না; সংসাররূপ মরুভূমে তুমি তাহার একমাত্র উৎস ছিলে, অন্নপূর্ণাও তোমার একমাত্র প্রাণ জুড়াইবার স্থল ছিল; তোমাদের পরস্পরের ভালবাসার উপমা এ জগতে অতীব বিরল। অন্নপূর্ণার মৃত্যুতে তুমি প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবার স্থান হারাইয়াছ; আমি যখন বহরমপুর উন্মাদাগারে নিঃসহায় ও একান্ত নিরুপায় অবস্থায় যন্ত্রণায় অধীর হইয়াছিলাম তুমি প্রকৃত পিতৃসম জ্ঞানে দুই বৎসর কাল অশেষ প্রকার যত্নে দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য করিয়া আমাকে সুস্থির করিয়াছিলে। আরোগ্যলাভের পর যখন অন্নপূর্ণার জীবনচরিত লিখিবার সংবাদ জানাই তুমি উত্তরে লিখিয়াছিলে "অন্নপূর্ণার জীবন স্বার্থক; যে নারীর মৃত্যুর পরে স্বামীর অশ্রুপাত হয় সে নারীই প্রকৃত ধন্যা, বিশেষতঃ যে নারীর পুণ্যচ[illegible] স্বামীর হৃদয়পটে মুদ্রিত হইয়া তাঁহাকে চিরকাল অ[illegible] রাখিতে সমর্থ হয় সে নারী প্রকৃত সাধ্বী; বস্তুত [illegible]

তাঁহারই প্রকৃত প্রণয় জন্মিয়াছিল বলিতে হইবে ; পরমেশ্বরের অভিপ্রায়ানুরূপ তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন।"

শরৎশশি! তোমার সাহায্য না পাইলে আমি আর আরোগ্য হইয়া অন্নপূর্ণা চরিত লিখিতে সমর্থ হইতাম না। আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও বহু কষ্ট কল্পনা করিয়া অন্নপূর্ণা চরিত সম্পন্ন করিয়াছি, কিন্তু আমার বড়ই দুর্ভাগ্য যে ইহা তোমার করে সমর্পণ করিতে পারিলাম না ; ইতি মধ্যেই তুমি স্বর্গে গমন করিয়া অন্নপূর্ণার সহিত সম্মিলিত হইয়াছ এইক্ষণ আমার পরম আদরের ও প্রীতির কুসুমস্বরূপ অন্নপূর্ণাচরিত তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম। পরম কারুণিক পরমেশ্বর অবশ্যই এ দুঃখীর প্রীতিউপহার অন্নপূর্ণাচরিতের সংবাদ তোমাকে জানাইয়া, আমার প্রাণের আশা পূর্ণ করিবেন।

দীন—

শ্রীশ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়।

অন্নপূর্ণা চরিত।

অন্নপূর্ণা তাঁহার মাতুলালয় ত্রিপুরার অন্তর্গত চন্দ্রাণী গ্রামে, রামকুমার চোধুরীর ঔরসে, ভৈরবা দেবীর গর্ভে, ১২৬৩ সনের কার্ত্তিক মাসে জন্ম গ্রহণ করেন।

অন্নপূর্ণার পিতা রাম কুমার চৌধুরী রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের অবস্থা এক সময়ে খুব ভাল ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দিগের মধ্যে কেহ রাজা উপাধি লাভ করিয়া ছিলেন। রামকুমারের পিতা পর্য্যন্ত রাজা উপাধি ব্যবহার করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহারা কয়-কীর্ত্তণের মাসচরক শ্রোত্রীয়। ক্রমাগত কুল ক্রিয়া করিতে করিতে পৈত্রিক সম্পত্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আইসে, সুতরাং রামকুমারকে চাকুরী করিয়া সংসার চালাইতে হয়। ঘটকেরকোলা গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ীতে তাঁহার বিষয়স্থল ছিল। তিনি নিজের সৎ স্বভাব প্রযুক্ত সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাঁহার নিরীহ স্বভাবের জন্য কাহারও সহিত কোন প্রকার সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় নাই। জমিদারী লিখা পড়া ও যাজনিক ক্রিয়া কলাপাদিতে সুশিক্ষিত ছিলেন।

জেলা কুমিল্লার অন্তঃপাতী চন্দ্রালী গ্রামে ভৈরবী দেবীকে রামকুমার চৌধুরী বিবাহ করেন। অন্নপূর্ণার মাতা ভৈরবী দেবী সংসার কার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন। তাঁহার গৃহকার্যের সুশৃঙ্খলার জন্য রামকুমারকে কখনও কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই।

ভৈরবী দেবীর গর্ভে অন্নপূর্ণা ব্যতীত স্বর্ণময়ী, প্রসন্নময়ী ও রামলক্ষ্মী নাম্নী তিন কন্যা এবং কৃষ্ণকিশোর নামে এক পুত্র সন্তান জন্মে। স্বর্ণময়ী ব্যতীত ইহাদের মধ্যে আর কেহই এক্ষণ জীবিত নাই। স্বর্ণময়ী পিতার ন্যায় নিরীহ ও সৎ স্বভাবা। শিশুকাল হইতে কনিষ্ঠা অন্নপূর্ণাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। অন্নপূর্ণা শিশুকালে কিছু চঞ্চল স্বভাবা ছিলেন। সকলের শেষ সন্তান বলিয়া পরিবারস্থ সকলেরই অতিশয় স্নেহপাত্রী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে অন্নপূর্ণা স্বর্ণময়ীর নিকট গৃহ কার্য্যাদি শিক্ষা করিতে থাকেন। অন্নপূর্ণা সমবয়স্ক খুল্লতাত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থের নিকট লিখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কন্যাদিগের শিক্ষাতে বৈধব্যের আশঙ্কা করিয়া আত্মীয় স্বগণ শিক্ষা বন্ধ করিবার জন্য নানা প্রকার লাঞ্ছনা করেন। শিশুকাল হইতেই অন্নপূর্ণার অত্যন্ত দৃঢ়তা ছিল। যখন যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিতে সহস্র বাধা উপস্থিত হইলেও তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। সুতরাং নানা প্রকার বাধার মধ্যেও শিক্ষা কার্য্য চলিতে লাগিল। একবার অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহার ঠাকুরদাদা শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও ঠাকুরাণী দিদি সুখমণি দেবীর দয়ায় এক খানা শিশুবোধ ক্রয় করিয়া আনেন। ইহাই তাঁহার শিক্ষার প্রথম পুস্তক। এই পুস্তক তিনি এত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন যে, কোন কোন অংশ

অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিতেন। এই সময়ে তাঁহার মাতা ভৈরবী দেবীর মৃত্যু হয়। ভৈরবী দেবী একটী মৃতসন্তান প্রসব করিয়া কঠিন সূতিকা-জ্বরে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, রামকুমারের হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া যায়। এই সময় তিনি প্রায়ই কর্ম্মস্থলে থাকিতেন; অনুপূর্ণার প্রতি-পালনের ভার স্বর্ণময়ীর প্রতি অর্পিত ছিল। ঘটকেরকোলা নিবাসী রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের সহিত স্বর্ণময়ীর বিবাহ দিয়া রামকুমার একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। পঞ্চসার নিবাসী শ্রদ্ধেয় হরিমোহন গোস্বামীর কন্যা অনন্তময়ীর সহিত অন্নপূর্ণার সখ্যতা জন্মে। সেই সূত্রে তাঁহার বাটীতে সর্ব্বদা যাতায়াত হইতে লাগিল। একদিন হরিমোহন গোস্বামী অন্নপূর্ণার তৎকালীয় শিক্ষা কিরূপ হইয়াছে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা দ্বারা অন্নপূর্ণার তৎসময়োচিত স্বাভাবিক প্রতিভার বিলক্ষণ পরিচয়ে তিনি পরম সন্তোষলাভ করিলেন এবং যাহাতে তাঁহার শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে যত্ন পান। বাল্য কাল হইতেই অন্নপূর্ণার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয় তিনি নিজহস্তে একটী ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করেন এবং প্রতিদিন তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন।

শৈশবসময় হইতেই অন্নপূর্ণার গুরুজনে ভক্তি, ধর্ম্মে অনুরাগ, এবং সত্যনিষ্ঠার প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। হিন্দু বালিকার অবশ্য-প্রতিপালনীয় ব্রতনিয়মাদি আন্তরিক অনুরাগের সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। এই সময়ে অন্নপূর্ণার ধর্ম্ম শিক্ষার একটী অনুকূল অবস্থা দাঁড়ায়,—বাটীর অনেকেই পৌরহিত্য কার্য্য করেন তাহাতেই নানা প্রকার ধর্ম্মপ্রসঙ্গ প্রতি-

নিয়ত শ্রবণ, ধর্ম্মকার্য্য সকল দর্শন, সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর ছাত্র-বৃন্দের ধর্ম্মালোচনা ও শাস্ত্রালোচনা শ্রবণ প্রভৃতিতে অণু অণু করিয়া তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় অন্নপূর্ণার সর্ব্ববিধ সুখের ব্যাপার সংঘটিত হয়। একদিকে স্বর্ণময়ীর অতুল স্নেহে, অপর দিকে শ্যামসুন্দর ও সুখমণি দেবীর অকৃত্রিম ভালবাসায় নানা প্রকার সুখদ দ্রব্য আহার ও বিবিধ প্রকারের নিত্য নূতন বস্তু লাভ প্রভৃতিতে, তাঁহার হৃদয়ের প্রফুল্লতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাদের একটি ভাল-বাসার গাভী ছিল, প্রতি দিন গাভীটির সেবা করিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিতেন। গাভীটিও সেই সময় অন্নপূর্ণার মাতৃস্বরূপা হইয়া তাহাকে প্রচুর দুগ্ধদানে পরিতৃপ্ত করিত। এই সময়ে দেশীয় চিত্র ও শিল্পকার্য্যে বিশেষ মনোনিবেশ করেন; যখন যে কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করিতেন তাহাতে তিনি দক্ষতা লাভ না করিয়া কিছুতেই বিরত হইতেন না।

অন্নপূর্ণার ভগিনী স্বর্ণময়ীর স্বামী দেভোগগ্রামে আর একটী বিবাহ করেন। এই বিবাহে রামকুমার ও স্বর্ণময়ী বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন। অন্নপূর্ণার বয়স এই সময় দ্বাদশ বৎসর পার হইয়া যাওয়াতে, রামকুমার বিবাহ দিবার জন্য ব্যাকুল হন। রাম-কুমারের আত্মীয় স্বগণ মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অন্নপূর্ণার পরিবর্ত্তদ্বারা বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু রামকুমার বিশেষ মনস্বিতাবলে উক্ত প্রস্তাব অশ্রদ্ধার সহিত উপেক্ষা করেন। এখন স্বর্ণময়ী ও রামকুমারের বিশেষ চিন্তার ব্যাপার অন্নপূর্ণার বিবাহ। নানা স্থান হইতে নানারূপ সম্বন্ধ আসিতে থাকে স্বর্ণময়ী প্রায় সম্বন্ধেই আপত্তি উপস্থিত

করেন। তাঁহার আপত্তির মূল হেতু এই যে অন্নপূর্ণার পতির এইরূপ ধর্ম্মভাব থাকা আবশ্যক যে সে প্রাণান্তে ও দ্বিতীয়দার-পরিগ্রহ না করে এই কারণে অনেক সম্বন্ধ আশঙ্কার সহিত পরিত্যাগ করা হয়; কিন্তু এদিকে অন্নপূর্ণার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর হওয়াতে রামকুমার বিশেষ উদ্বিগ্ন হন।

এই সময় অন্নপূর্ণার পিস্‌তাত ভ্রাতা বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা মেডিকেল স্কুলে পাশ করিয়া নিজ আলয়ে আইসেন; এবং অন্নপূর্ণার বিবাহের জন্য রামকুমারের ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহার সহাধ্যায়ী শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সম্বন্ধ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করেন, তাহাতে সকলেই আমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হন। বিশ্বেশ্বর বিবাহের কোন কথা উত্থাপন না করিয়া সাক্ষাৎকার লাভ করিবার অভিপ্রায়ে, নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে আমাকে এক পত্র লিখেন; আমি তদনুসারে তাঁহার বাটী যাই। তথায় অনেক লোক আমাকে দেখিতে আসাতে বুঝিতে পারিলাম যে, বিশ্বেশ্বরের অভিপ্রায় অন্যরূপ। তখন নির্জ্জনে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে বিবাহ বিষয়ে আমার মতামত সম্বন্ধে আলাপ হয়। বিশ্বেশ্বর প্রকাশ করেন যে "আমি এ বিষয়ে তোমার আন্তরিক অভিপ্রায় অনেক জানি; আমার ভগিনী অন্নপূর্ণা ঠিক তদনুরূপই হইবে তবে তুমি দেখিতে কি বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিলে অনুসন্ধান করিতে পার"। ইহার পরে আমি বিশ্বস্তরূপে জানিতে পারিলাম যে, অন্নপূর্ণা বালিকা বয়স হইতেই প্রতিভাশালিনী বলিয়া প্রতিবেশিনী দিগের নিকট আদৃতা ছিলেন। এই সকল ঘটনার পর এক দিবস বিশ্বেশ্বর-সহ রামকুমার, সম্বন্ধনির্দ্ধারণপত্র করিবার জন্য বাহেরক গ্রামে

আমাদের বাটীতে উপস্থিত হন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে ইতঃপূর্ব্বে আমার চিরকাল অবিবাহিত থাকাই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল; কিন্তু বন্ধুবর বিশ্বেশ্বরের আগ্রহাতিশয়ে ও অন্নপূর্ণার গুণ-গ্রাম শ্রবণে আমার জীবনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। পত্রের সময় হঠাৎ অননুভূতরূপে আমার হৃদয়ের মধ্যে অসহনীয় যন্ত্রণার আবির্ভাব হইয়া সমস্ত শরীর ঘর্ম্মে আপ্লুত হইল এবং আমি বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। কিছু কাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া জানিতে পারিলাম যে বিবাহনির্দ্ধারণপত্রের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই অন্নপূর্ণার বিবাহ স্থান পঞ্চসার বাচস্পতি বাটিতে উপস্থিত হইলাম। অন্নপূর্ণার পিতা দরিদ্র; এদিকে আমাদের পারিবারিক অবস্থাও তৎ সময়ে তত ভাল ছিলনা বলিয়া সামান্য ভাবেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

অন্নপূর্ণার প্রথম দর্শনে আমি বিশেষ অসুখ অনুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু এরূপ ভাব অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল না। বিবাহ বাসরেই তাহার প্রফুল্ল সরল ভাব, নানা বিষয়িনী শিক্ষা, ও আমার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাইয়া আমার মানসিক ভাব সম্যক্ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অন্নপূর্ণাও যেন চিরপরিচিত প্রাণের বন্ধু লাভ করিয়া মহোল্লাসে বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময়েই অন্নপূর্ণা স্বীয় বাল্য জীবনের ইতিহাস আমার নিকট সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার কোন প্রকার সঙ্কোচভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। আমি তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্ন করি। তাঁহার সরল উত্তরগুলি আমার নিকট এত প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল যে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

১ম প্রশ্ন—তুমি পতি এবং পত্নীর সম্বন্ধ কিরূপ বুঝিয়াছ ?

১ম উত্তর—পত্নী সম্পূর্ণরূপে পতির অনুগামিনী হইবে।

২য় প্রশ্ন—তাহা হইলে আমি এখন হইতে তোমাকে যাহা যাহা বলিব তুমি তদনুরূপ কার্য্য করিতে সম্মতা আছ ?

২য় উত্তর—হাঁ আমি সম্পূর্ণরূপে আপনার কথানুরূপ চলিব।

তৎপর আমি তাঁহাকে যে কয়েকটী উপদেশ দিয়াছিলাম তাহা নিম্নে লিখিত হইল। "আমার বাটীতে গিয়া যে সকল পুস্তক পাইবে, তাহা অসঙ্কোচে মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবে। যে তোমার পড়া শুনিতে চায় তাহাকেই শ্রদ্ধার সহিত শুনাইবে। যে কোন স্ত্রীলোক তোমার সহিত আলাপ করিতে চায় তাহাদের সহিত সরল ভাবে হৃদয় খুলিয়া আলাপ করিবে, এবং আমি যে যে ভগ্নী ও ভ্রাতৃবধুদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, তুমি তাহাদের সহিত বিশেষরূপে মিশিলে, ও আমার মত অনেকটা জানিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিলে আমাকে সুখী করিতে পারিবে। যদি কখন কেহ আমার নিকটে থাকে এবং তৎসময়ে আমার সঙ্গে তোমার আলাপের প্রয়োজন বোধ কর, তাহা হইলে লজ্জা বোধ না করিয়া অবাধে আলাপ করিবে"।

বিবাহের পর দিবস অন্নপূর্ণা সহ পঞ্চসার হইতে আমরা সকলেই সায়ংকালে নিজ বাটী বাহেরক গ্রামে পৌঁছি। বিবাহ রাত্রিতে অল্প সময়ের মধ্যে অন্নপূর্ণাকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অন্নপূর্ণা তৎসমস্তই স্মরণ রাখিয়া সুচারুরূপে চিরপরিচিতার ন্যায় অধ্যয়ন অধ্যাপন আলাপ ব্যবহারাদি দ্বারা সুশিক্ষিতা প্রবীনার ন্যায় পরিবারস্থ সকলেরই সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা পতির

বাটীতে যাইয়া যে সকল বস্তু উপহার পাইয়াছিলেন তন্মধ্যে পুস্তক গুলিই তাঁহার অধিক আদরের সামগ্রী হইয়াছিল।

কিছু দিন নানা প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতে লাগিল। হটাৎ এক দিন গুরুতর পীড়ায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ক্ষণ-কাল চিকিৎসার পর চৈতন্য লাভ করায় অবগত হওয়া গেল যে কৃমিজনিত বেদনায় পূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ হইত। এবারের চীকিৎসার পর আর কখনও তাঁহার ঐ রূপ ব্যারাম হইতে দেখা যায় নাই।

ঐ সময় মধ্যেই অন্নপূর্ণা আমাদের বাটীস্থ পরিজনবর্গের সহিত আলাপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, হিন্দু ক্রিয়া কলাপাদিতে আমার আস্থা নাই। এক দিন ব্রত নিয়মাদি বিষয়ে আমার কি মত, জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম "ব্রত নিয়মাদির উদ্দেশ্য ভাল; কিন্তু যে নিয়মে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা ভ্রান্তিমূলক কুসংস্কারাচ্ছন্ন। যে সকল সাধ্বী নারীরা পতি ও সন্তানগণের মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরে আত্মসমর্পন করিয়াছেন তাঁহাদের ন্যায় দৃঢ় বিশ্বাসী ও মঙ্গলপ্রয়াসী হওয়া উচিত; কিন্তু ঐ সকল ব্রতাদিতে যে রূপ অলীক গল্প রহিয়াছে তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না এবং ধূপ দীপ নৈবেদ্য ইত্যাদি আয়োজন করিয়া যে অর্চ্চনা তাহাও ভ্রান্তি মূলক; মানসীক পূজাই প্রকৃত পূজা। ঈশ্বর নিরাকার ও অদ্বিতীয় তাঁহার মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ ইত্যাদি প্রবাদ সম্পুর্ণ অমূলক এই সম্বন্ধে সবিস্তার ধর্ম্ম বিশ্বাস আমি ক্রমে ক্রমে তোমাকে জানাইব" ইহার কিছু দিন পর পিত্রালয় যাওয়ার জন্য অন্নপূর্ণা ব্যাকুলা হন এবং শীঘ্রই তথায় যান।

প্রায় একমাস পর আমি কলিকাতা যাওয়ার সময় পঞ্চসার অন্নপূর্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সে সময় বলি, "যাহাতে লেখা পড়ার উন্নতি করিতে পার তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিও। এবং পত্রাদি দ্বারায় নিজের মানসিক অবস্থা জানাইবে"।

আমি কলিকাতা পোঁছিলে আমার সহাধ্যায়ী বন্ধুবান্ধব আমার স্ত্রীকে উপহার দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি তাহাতে তাঁহাদিগকে জানাইলাম যে অন্নপূর্ণা পুস্তক উপহারেই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ পাইবেন। তদনুসারে তাঁহারা অন্নপূর্ণাকে নানাবিধ পুস্তক (তাঁহাদিগের মন্তব্য সহ) পাঠাইয়া দেন। অন্নপূর্ণা বহু দিন পর্য্যন্ত এই পুস্তক গুলিকে সাতিশয় যত্ন ও মনোযোগের সহিত রক্ষাও পাঠ করিয়াছিলেন। এবং আমার সহিত পুনরায় দেখা হইলে উপহার প্রদাতা বন্ধুদের ধর্ম্মভাব, চরিত্র ও অবস্থার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আগ্রহের সহিত জানিয়া ছিলেন।

কিছুকাল পর অন্নপূর্ণার পিসতাত ভ্রাতা বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সাঙ্ঘাতিক যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়াতে তাঁহাকে দর্শন ও সেবা শুশ্রূষার জন্য অন্নপূর্ণা ঘটকেরকোলা তাঁহাদের বাটীতে যান। এবং সাধ্যানুসারে বিশ্বেশ্বরের যত্ন করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অল্পকাল মধ্যেই বিশ্বেশ্বর ইহলোক ত্যাগ করেন। বিশ্বেশ্বরের অকাল মৃত্যু ও তাঁহার স্ত্রীর বৈধব্য যন্ত্রণায় অন্নপূর্ণা তথা হইতে অত্যন্ত আঘাত পাইয়া পঞ্চসারে আইসেন।

এই সময় আমি জঙ্গীপুরে সরকারী কার্য্যে যাই। তথায় কিছু দিন থাকিয়া পলসা গ্রামে কলেরা এপিডেমিকে গিয়া

ঘোরতর সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃতবৎ হই। কিছু দিন পরে জীবনের আশা জন্মিলে এই পীড়ার বিষয় বাটীতে লিখি। অন্নপূর্ণা লোক পরম্পরা এই সাংঘাতিক পীড়ার কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হন, এবং আমার নিকট পত্র লিখিবার ঠিকানা পাইবার জন্য ব্যস্ত হন। অতঃপর আমি বহরমপুর গোয়াস হইয়া কলিকাতা যাই এবং তথা হইতে সরকারী কার্য্যে বগুড়ায় আসি।

বিবাহের সময় অন্নপূর্ণা নানা প্রকারে আমাকে যে রূপ সুখী করিয়াছিলেন কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমি তাঁহাকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এযাবৎ এক খানা পত্রও তাঁহাকে লিখি নাই। বগুড়া পৌছার পর হঠাৎ তাঁহার এক খানা পত্র পাই। তাহার মর্ম্ম এই যে "আপনি সাক্ষাতে আমার প্রতি যেরূপ ভালবাসা দেখাইয়াছিলেন, বিবাহের পর বাটী হইতে যাইয়া আমার নিকট এযাবৎ কোন পত্র না লেখাতে, আপনি যে আমাকে মনে রাখিয়াছেন তাহা কিসে বুঝিতে পারি? ইতিপূর্ব্বে পলসায় আপনার ব্যারামের কথা শুনিয়া মনে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলাম। পলসার ঠিকানা না জানাতে তৎসময়ে আমি চিঠি লিখিতে পারি নাই। এখন হইতে দয়া করিয়া উপদেশপূর্ণ পত্র দ্বারা সুখী করিবেন। এ দাসীকে ভুলিয়া আর মনকষ্ট দিবেন না"। সত্বরেই বাড়ী যাইব মনে করিয়া সম্ভবতঃ এই চিঠির উত্তর আমি অতি সংক্ষেপেই দিয়াছিলাম।

অন্নপূর্ণাকে এই চিঠি লেখার কিছু দিন পর বাড়ীতে আমার পিতৃদেব রামতনু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাংঘাতিক কাতরের সংবাদ প্রাপ্ত হই। বিদায়ের জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াও

আমি সেই সময় বাড়ী যাইতে পারি নাই। অল্প দিন পরে আমার পিতার মৃত্যুসংবাদ, এবং ঢাকায় বদলির সংবাদ পাই। বগুড়া হইতে ঢাকা যাইবার সময় বাড়ীতে যাই। বাড়ী যাইয়া জানিলাম অন্নপূর্ণা সেই খানে আছেন। ইতঃ-পূর্ব্বে পঞ্চসারে তাঁহার প্রথম ঋতু উপস্থিত হয়। পিতার ব্যারাম সময় অন্নপূর্ণাকে দেখার জন্য এখানে আনা হইয়াছিল আমি বাড়ী পৌছিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। কিন্তু আমার সহিত সাক্ষাৎ জন্য তাঁহার অত্যন্ত ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল। দুই এক দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বিবাহ হওয়ার পর তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর নিয়মিত কালতক অন্নপূর্ণা রীতিমত হবিষ্যাদি ব্রহ্মচর্য্য ভক্তির সহিত প্রতিপালনে সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

অনধিক সপ্তাহ কাল আমাকে বাড়ী থাকিতে হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই অন্নপূর্ণার সহিত আমার বহু প্রকারের আলাপ হয়। আমি যখন পলসায় সাংঘাতিক কাতর হই, তাহার কিছু পূর্ব্বে অন্নপূর্ণা পঞ্চসারে আমাকে স্বপ্নে দেখিয়া মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পান। সেই সময়ে তাঁহার সখিদিগের সহিত আলাপে প্রকাশ করেন যে তিনি যেরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তদনুরূপই পতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে অল্পবয়সেই পতি বিরহ যন্ত্রণায় এত কাতর করিয়াছিল যে তজ্জন্য তিনি আত্ম-বিস্মৃতা হইয়া মাঝে মাঝে তিরস্কৃতা হইতেন। তিনি এই সময় আমার সঙ্গে ঢাকা যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন; কিন্তু নানা কারণে তাঁহাকে সঙ্গে লইতে না পারিয়া আমি একাই ঢাকায় যাই।

মাসাধিক কাল মধ্যে আমি ঢাকা থাকিয়া অন্নপূর্ণার অনেক গুলি চিঠি পাই। এই চিঠি পাঠ করিয়া আমার ঢাকাস্থ বন্ধুগণ পরম প্রীতি লাভ করেন। প্রিয়তম বন্ধু পূর্ণচন্দ্র গুহ অন্নপূর্ণার চিঠি পাঠে তাঁহার মানসিক শক্তির পরিচয় পাইয়া আমাকে বলেন "তুমি স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াছ"। নানা কারণে এই সময় আমার চাকুরী পরিত্যাগের সংকল্প হয়। আমি অন্নপূর্ণার সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক চাকুরী পরিত্যাগ করিব, এই মর্ম্মে তাহাকে সত্বর ঢাকা পৌঁছিবার জন্য চিঠি লিখি। আমার চিঠি পাইয়া তিনি ঢাকা পৌঁছেন। অন্নপূর্ণা ঢাকা পৌঁছিয়া, আমার বন্ধুগণের সঙ্গে আলাপে একটু সংকোচ বোধ করেন, কিন্তু আমার উপদেশে অচিরাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুগণের সহিত সরল ভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বন্ধুবর পূর্ণচন্দ্র গুহের সঙ্গে অন্নপূর্ণার ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক আলাপ হয় এবং আমার অজ্ঞাতসারে অন্নপূর্ণা ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্তা হন।

চাকুরী পরিত্যাগ সম্বন্ধে অন্নপূর্ণার সঙ্গে আমার নানা কথা হয়। চাকুরী পরিত্যাগের মন্দ ফলটি তাঁহাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়াছিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি তাঁহার মত প্রকাশ করেন যে যদি দাসীবৃত্তি করিয়াও আমাকে খাওয়াইতে হয় তাহাতেও তিনি কুণ্ঠিতা নহেন। তথাপি স্বাধীনতাহীন দাসত্ব অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ইহার কিছু দিন পরেই চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া আমরা বাহেরক আসিলাম। বাড়ীতে আসিয়া একদিবস রজনীতে

আমি একটী অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখি। জাগ্রত হইয়া অন্নপূর্ণাকে তৎবৃত্তান্ত আমূল বলায় গুপ্তভাবে তাঁহার জীবনের একটী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এই ঘটনা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে জনৈক বন্ধু আমার বাটীতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে একত্রে এক রাত্রি যাপন করি। তাহাতে তাঁহার তৎসাময়িক জীবনের সমস্ত ইতিবৃত্ত আমাকে বলেন। অন্নপূর্ণা তৎসমস্তই বাহিরে থাকিয়া লুক্কায়িত ভাবে শ্রবণ করেন। প্রোক্ত ইতিহাস তাঁহার জীবনের উপরে পুরুষপ্রকৃতির কাঠিন্যভাবের প্রভাব বিস্তার করে। অনতিকালমধ্যেই নির্ব্বিচ্ছেদজ্বরাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়েন। আরোগ্য লাভের পর, তাঁহাকে পঞ্চসার তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া, আমরা বগুড়া পৌঁছি। বগুড়া পৌঁছার কিছু দিন পর, অন্নপূর্ণার এক পত্রে তাঁহার ব্যারামের সংবাদ জানিয়া, চিকিৎসার্থ কিছু ঔষধ এবং পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত জন্য দশটী টাকা পাঠাইয়া দেই। তাঁহার পিত্রালয়ে পথ্যাদির সুবন্দোবস্তের কোন ত্রুটি ছিলনা বলিয়া, তিনি প্রেরিত দশ টাকা খরচ না করিয়া হাতে রাখিয়াছিলেন। পরে আমাদের বাটীতে যাইয়া ঐ দশটী টাকা বাটীর তৎকালীয় কর্ত্তাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বগুড়া আসিয়া এবার তিন মাস কাল অবস্থান করি। এই সময়ের মধ্যে আমি অন্নপূর্ণাকে নিয়মিতরূপে চিঠি পত্র লিখি এবং তিনিও আমাকে লিখেন। পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাড়ী যাই। তখন অন্নপূর্ণা আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। এই সময়

তাঁহার নূতন বেশ দেখিলাম,—তাঁহার পিত্রালয় হইতেই হাতের শাঁখা বলয় প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। তথায় অবশ্য একটু তোলা পাড়া হইয়াছিল। আমাদের বাড়ীতে আসিলেও তাঁহার হস্ত হিন্দুসধবার লক্ষণশূন্য দেখিয়া, অনেকে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মভাব এবং শীলতা দেখিয়া কেহই তাঁহার প্রতি উৎপীড়ন করেন নাই।

আমার কোন অগ্রজ অন্নপূর্ণাকে অন্ততঃ দুগাছা সোনার বালা ব্যবহার জন্য বিশেষ যত্ন করেন। অন্নপূর্ণা সরল যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারা তাঁহার মত, এমন বিনয় ও দৃঢ়তা সহকারে, প্রকাশ করেন যে অগ্রজ মহাশয় কি অন্য কেহ, দ্বিতীয়বার আর তাঁহাকে ঐ প্রবৃত্তিটী লওয়াইতে চেষ্টা করেন নাই। অলঙ্কারাদি কিছুতেই আর ব্যবহার করিবেন না, ইহা আমি জানিয়া তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার গুলিই আমার ভগিনী ও ভাগিনেয়ীদিগকে দিবার কথা বলায়, তিনি অতীব আহ্লাদ সহকারে সমস্ত অলঙ্কার গুলিই তাহাদিগকে প্রদান করেন।

এই সময়ে বাহেরকে বা পঞ্চসারে যখন যেখানে থাকিতেন সেই স্থানে প্রত্যহ সংক্ষেপে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। এই সময় হইতে তিনি পৌত্তলিক ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন। এই ভাবে কিছু দিন বাটী থাকিয়া পরিবার সহ বগুড়ায় পৌঁছি। আমি বগুড়ায় বন্ধুবান্ধবের সহিত যে সব আলাপ করিতাম তৎসমস্তই অবিকল শুনিবার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। আমিও আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিতাম। এখানে আসিয়া তিনি স্বয়ং গৃহিণীর কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এই অল্প বয়সেই তৎকার্য্যে সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। এই সময়

হইতে সংবাদপত্র ও বিবিধপ্রকার পুস্তক পাঠ ও বন্ধুগণের সহিত সদালাপ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে প্রিয়তমবন্ধু রাজচন্দ্র গুপ্ত, তাঁহার অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। টেল্সি-মেকস, ও সাহিত্যগণিতভূগোলাদি শিক্ষা আরম্ভ হয়।

এইরূপ ভাবে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। অন্নপূর্ণা ১২৭৮ সনের ২রা আশ্বিন তারিখে এক কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন। তিনি 'সুশীলার উপাখ্যান' পড়িয়া বড়ই প্রীতি পাইয়াছিলেন। কন্যার নাম সেই দিবসেই তজ্জন্য সুশীলা রাখা হইল। এই সময়ে বন্ধুবর দ্বারকানাথ রায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, বরদানাথ হালদার, রণজয় সেন, কেশবনাথ রায়, কৃষ্ণপ্রসাদ রায়, প্রভৃতি বন্ধুগণ হইতে নানা প্রকারে অন্নপূর্ণা শিক্ষার সম্বন্ধে অনেক সহায়তা পান। অত্রস্থ কৈলাস চন্দ্র বক্সী মহাশয়ের কন্যা পরলোকগতা শরৎশশী গুপ্তার সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত হয়। এবং বামাসুন্দরী, বন্ধুবর বরদানাথ হালদারের স্ত্রী হরিসুন্দরী, গোবিন্দ দত্তের স্ত্রী হরসুন্দরী, দ্বারকানাথ রায়ের প্রথমা স্ত্রী, দিগম্বর চৌধুরির স্ত্রী, ও কাশীনাথ রায়ের স্ত্রী প্রভৃতি মহিলাগণের সহিত এই সময়েই তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা জন্মে।

এই সময় শ্রদ্ধাস্পদ বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্তের সহিত ও শ্রদ্ধাস্পদ বাবু বরদা নাথ হালদারের সহিত অন্নপূর্ণার বিশেষ পরিচয় হয়। এই দুই জন, এই হইতে তাঁহার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নকরি-য়াছেন। অন্নপূর্ণার মানসিক শক্তির উৎকর্ষতা দেখিয়া ইহারা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। ইহারকিছু দিন পর মাননীয়া মিসেস্ বিগ্নোল্ড বগুড়া অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ মনো-

যোগী হন এবং নানাপ্রকার চেষ্টাদ্বারা জেনানামিশন স্থাপিত করেন। তিনি ঢাকা হইতে এক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা আরম্ভ করান। অন্নপূর্ণা প্রোক্ত শিক্ষয়িত্রীর নিকট শিল্প শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। কিছুকাল পর জেনানামিশন হইতে শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে যুবতী-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অন্নপূর্ণা ঐ স্কুলে প্রথম হইতেই শিক্ষা আরম্ভ করেন। সম্বৎসর পরে যে বার্ষিক পরীক্ষা হয় তাহাতে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং নানাবিধ পুরস্কার পান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ঐবিদ্যালয়টী অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে যখন ক্রমে কঠিন শিক্ষা সকল আরম্ভ হইল তখন তিনি প্রথম শ্রেণীর মধ্যেও প্রথম হইয়া দাঁড়াইলেন। এই সময় তাঁহার সহিত আমার একটী বিষয় লইয়া বিশেষ বাদানুবাদ হয়, তাহার মূলতত্ত্ব এই যে, তিনি আমাকে উপবীত পরিত্যাগ করার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলেন। আমি জাতীয় চিহ্ন উপবীত পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করি এবং যখন মুসলমান পাচক দ্বারা পাক কার্য্য সম্পাদিত হইতেছিল সে অবস্থায় জাতি ভেদের কোন আশঙ্কা থাকিবার সম্ভাবনা নাই, ইহা বুঝাই।

তদুত্তরে তিনি বলেন যে চট্টোপাধ্যায় উপাধিদ্বারা যখন জাতীয়-চিহ্ন থাকে, তখন কুসংস্কারের চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীত থাকা কোন প্রকারেই উচিত নয়। বিশেষত: ইহাদ্বারা হিন্দুগণ প্রতারিত হইতে পারেন। ইহার এক বৎসর পরে যখন বগুড়া ব্রাহ্মসমাজ অকস্মাৎ আমাকে আচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত করেন তখন আমি প্রথম উপাসনার পরেই প্রাণে বিশেষরূপে

বুঝিতে পারিলাম, এই কার্য্য করিতে হইলে উপবীত পরিত্যাগ করা নিতান্তই উচিত। উপাসনার পর নির্জনে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া আসি। এই সময়, হইতে আমার বাটীতে প্রাত্যহিক উপাসনার কার্য্য আরম্ভ হয়। তিনি তাহাতে রীতিমত যোগ দেন। এবং কখন কখন নিজে উপাসনা, সংগীত, ও সংকীর্ত্তন করিতেন। দিনে দিনে অনেক বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ হইতে লাগিল। বন্ধুগণ তাঁহার সহিত আলাপ দ্বারায় তাঁহার ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ে প্রগাঢ় প্রতিভা দর্শন করিয়া, সাতিশয় সন্তুষ্টি লাভ করেন। অনেক সময় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জটিল প্রশ্নের এমন সুন্দর সরল মীমাংসা করিতেন যে তাহা শুনিয়া বন্ধুগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। এই সময় তিনি বাসাবাটীতে এবং বাহিরের স্থলবিশেষের জন্য স্বাধীনতা পান।

(কিছু দিন পর ১২৮০ সনের আশ্বিন মাসে, সরলা নাম্নী তাঁহার একটী কন্যা সন্ততি হয়; এবং এক মাস পরেই ঐ মেয়েটী কালগ্রাসে পতিত হয়।) এই সময় ধর্ম্মতত্ত্ব, শ্রদ্ধেয় কেশব বাবুর সাপ্তাহিক উপদেশ এবং ভারতবর্ষীয় ও আদি-ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত বাঙ্গালা পুস্তক সমূহ তিনি অতীব মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে বগুড়া আইসেন। অন্নপূর্ণা তাঁহার ধর্ম্মালোচনা ও উপদেশ শ্রবণ এবং তাঁহার সহিত উপাসনায় যোগদান করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন।

(১২৮১ সনের ১৮ ভাদ্র তারিখে সুধীর নামে অন্নপূর্ণার একটী পুত্র সন্তান হয়।) এই সময়ে আমাদের বাটীতে "বগুড়া জাতীয়-সাহিত্যসমিতি" নামক পুস্তকালয় সংস্থাপিত হয়; তাহাতে

তৎসাময়িক এবং তৎপূর্ব্বের প্রচারিত প্রভৃত পুস্তক আইসে, ও বঙ্গদর্শন আর্য্যদর্শন, বান্ধব, জ্ঞানাঙ্কুর, সোমপ্রকাশ, সাধারণী অমৃতবাজার, ভারতমিহির প্রভৃতি অনেকানেক পত্রিকা আসিত। সুতরাং সুবিখ্যাত লেখকদিগের গদ্য ও পদ্য পুস্তকাদি পাঠ করিবার তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইল। তিনি আন্তরিক অনুরাগের সহিত সেই সকল পাঠ করিয়া অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

সুধীর হওয়ার পরেই পূজার সময় সপরিবারে বাড়ী যাই। ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক বৎসর পূজার সময় আমরা বাড়ী যাইতাম। উমাসুন্দরী নাম্নী আমার সহোদরা ভগ্নী আমাদের সঙ্গে এক বৎসরকাল বগুড়া বাস করে। তাহার সহিত আমার স্ত্রীর বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। এই সময়ে শ্রীনাথ বাবুও তাঁহার স্ত্রীর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। শ্রীনাথ বাবু কিছু দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিয়মিত রূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার স্মৃতিশক্তির ও বুদ্ধিশক্তির তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বাড়ী যাইয়া সুধীরের নিউমোনিয়া হওয়ায় সমস্ত পরিবারের চিন্তার কারণ উপস্থিত হয়। নানা প্রকার চিকিৎসাতে নিউমোনিয়া কিছু আরোগ্য হইলে গলদেশে একটী বৃহৎ এব্‌সেস্‌ হয়, তাহাতে সুধীরের জীবনের আশা কম হইয়া পড়ে। অস্ত্র করার পরে ক্রমশঃ ভাল হইয়া উঠে। এই সময় গ্রামের সম্ভ্রান্তহিন্দু মহিলাগণ অন্নপূর্ণার সহিত নানা প্রকার আলাপ করেন। তাহাদের প্রধান জিজ্ঞাস্য বিষয় এই ছিল যে তিনি হাতে অলঙ্কারাদি দেন না কেন। তিনি তদুত্তরে বলেন, অলঙ্কার ব্যবহার ভাল নহে; হাতে শঙ্খাদি ব্যবহার

না করিলে যে পতির কোন অনিষ্ট হয় এই রূপ ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস তাঁহার নাই। ইহা লইয়া গ্রামে নানা প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই অবধি আমার সহোদর ভ্রাতাগণ ও দেশস্থ স্বজাতীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ আমাদের সঙ্গে একত্র আহার আদি পরিত্যাগ করেন। আমার শ্বশুরালয় পঞ্চসারেও এইরূপ ঘটনা উপস্থিত হয়। ইহার পর আমি সপরিবারে পঞ্চসার হইয়া ঢাকা শ্রীযুত নবকান্ত বাবুর বাসায় যাই। তথায় বঙ্গ বাবু কেদার বাবু প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধুদিগের ও তাঁহাদিগের পরিবারবর্গের সহিত আমার সহধর্ম্মিণীর আলাপ পরিচয় হয়। তৎপর ঢাকার দর্শনীয় নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া দেখান হয়, তন্মধ্যে রমণীয় উদ্যান সকল দেখিয়াই তিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। এই বারেই ঢাকা ব্রাহ্মপরিবার দিগের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। ঢাকা হইতে আমি সপরিবারে কলিকাতা শ্রদ্ধেয় গুরুচরণ মহালানবিশ মহাশয়ের বাটীতে পৌছি। তত্রস্থ ব্রাহ্ম পরিবারবর্গের সহিত আমার সহধর্ম্মিণীর ক্রমশঃ আলাপ পরিচয় হইতে থাকে। তিনি এক দিন কেশব বাবুর ভারতাশ্রমের ব্রাহ্মপরিবারদিগের সহিত আলাপ করিতে যান। এই আলাপে বিশেষ প্রীতি পাইয়াছিলেন। এক দিন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনার জন্য যান। সেই দিন কেশব বাবু স্বয়ং আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তথায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্রাহ্মিকাদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কলিকাতা ইডেন্ গার্ডেন, ফোর্টউইলিয়ম্, বড়বাজার, চৌরিঙ্গি লালদিঘি, গড়েরমাঠ, গঙ্গার পুল প্রভৃতি দর্শন করেন। এই সময় প্রিন্সঅব্ ওয়েলস্ কলিকাতায় শুভাগমন করায় সমস্ত সহর

আলোকিত হয়, এবং গড়েরমাঠে নানাবিধ আতসবাজী হয়। অন্নপূর্ণা এই সব সুন্দর রূপ দেখিয়াছিলেন।

প্রায় ১৫ দিবস কলিকাতা বাসের পর আমরা তথা হইতে গোয়ালন্দ পৌছি। তথায় পানইংনিবাসী প্রিয়তম বন্ধু বঙ্গচন্দ্র বৰ্দ্ধনের সহিত অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ হয় ও নানা প্রকার আলাপ হয়। তথা হইতে নৌকায় বগুড়া পৌছিলাম। বগুড়া আইসার পর ধৰ্ম্ম, সমাজ ও নীতি সম্বন্ধীয় কতকগুলি মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক নূতন পত্রিকা রীতিমত লওয়া হইতে লাগিল। তিনি ঐ সমস্ত রীতিমত পাঠ করিতেন। এই সময় আমাদের বাটীতে একটি পারিবারিক উপাসনা-সমাজ সংস্থাপিত হয়,—প্রতি বুধবার রাত্রিতে ইহার অধিবেশন হইত। এই সঙ্গেই বাটীর মধ্যে একটী উদ্যান প্রস্তুত করা হয়। অন্নপূর্ণা পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। ২৬ কার্ত্তিক পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব ও নগর কীৰ্ত্তনাদি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়।

(অন্নপূর্ণা ১২৮২ সনের ১৭ চৈত্র সুবোধ নামে আর একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন।) ইতিপূৰ্ব্বে জনৈক বন্ধু তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতকগুলি জটিল প্রশ্ন সম্বলিত এক পত্র লিখেন। তিনি ঐ সকল প্রশ্নের এমন সরল, সুন্দর ও যুক্তি পরিপূর্ণ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ও সংক্ষেপে সমস্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্বগুলি এমন সুন্দর ও নূতন ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গবেষনার অতুলনীয় স্ফূৰ্ত্তি প্রতিভাত দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এই সময় শ্রদ্ধেয় গৌরগবিন্দ বাবু ধর্ম্ম প্রচার জন্য বগুড়া আইসেন। তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া এবং উপাসনায় যোগ দিয়া তিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

এইরূপ ধর্ম্মালোচনায় দিন রাত অতিবাহিত হইতে থাকে। (১২৮৪ সনের অগ্রহায়ণ মাসে সুখময় নামক আমার তৃতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে।)

শ্রদ্ধেয় প্রচারক বাবু রামকুমার বিদ্যারত্ন, শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের সহিত, এই সময় বগুড়া আইসেন। ইঁহাদিগের উপাসনা ও ধর্ম্মভাবে অন্নপূর্ণা বিশেষ রূপ উৎসাহিত হন। অনেক বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধীয় মূল তত্ত্ব বিষয়ক অনেক আলোচনা হয়। তাহাতে তাঁহার মানসিক প্রতিভা এতদূর প্রকাশিত হয় যে উপস্থিত বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার আশ্চর্য্য চিন্তা শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের উৎকর্ষতা বিষয়ে আশান্বিত হন। এই সময়ের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই প্রতি দিন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিত্য নূতন প্রশ্নের উত্থাপন হইয়া বিশেষরূপ আলোচনা হইত। এবং প্রাত্যহিক উপাসনা হইয়া আলোচনায় শেষ হইত। এই আলোচনায় অন্নপূর্ণার চিন্তাশক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির আশ্চর্য্য নিদর্শন পাওয়া যাইত।

বগুড়া ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মিকাদিগের আসিবার বন্দোবস্ত হওয়ার পরে তিনি নিয়মিতরূপে সন্তানাদিসহ ব্রাহ্মসমাজে আসিতে আরম্ভ করেন ও মেম্বর হন। এই সময় সন্তান সন্ততি দিগের জন্য পত্রিকা উপলক্ষে বৈশাখের প্রথম ভাগে উৎসব হয়। সেই সময় শ্রদ্ধেয় রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আসিয়া উৎসবে যোগ দান করায় জীবন্ত ভাবে উৎসব সমাধা হইয়াছিল।

ইহার পর ১২৮৬ সনের আশ্বিন মাসে সুকুমারী নাম্নী তাঁহার আর একটী কন্যার জন্ম হয়। এই সময় মধ্যে বগুড়া ব্রাহ্মসমাজে আলোচনা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বিশেষ প্রতিভার সহিত আলোচনাসমাজের কার্য্য করিতেন এবং সারগর্ভ প্রবন্ধাদি দ্বারা আলোচনা-সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন। এই সময় হইতে মাঘোৎসবে এবং পারিবারিক উৎসবে এমন সুযুক্তিপূর্ণ স্বরচিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধ সকল পাঠ করিতেন যে, তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অনেকেই উৎসব পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন নাই।

এই সময়ে আমি নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিলাম। আমার সহধর্ম্মিণীর বিশেষ যত্ন ও শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করি। এবং তাঁহারই অনুরোধে বহুদিনের বাঞ্ছনীয় পশ্চিমের তীর্থস্থান ও ভারতবর্ষের দর্শনীয় ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান স্থানগুলি দর্শনার্থ গমন করি; এবং তিন চারি মাস পরিভ্রমণের পর দিল্লী হইতে বগুড়া প্রত্যাগত হই। আমি যে সমস্ত স্থানগুলি পরিভ্রমণ করিব মনে করিয়া বগুড়া হইতে বাহির হইয়াছিলাম ঘটনাচক্রে তাহার অধিকাংশই না দেখিয়া আমাকে বগুড়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। পরিভ্রমণ কালে আগ্রা অবস্থিতির সময় বগুড়াস্থ জনৈক বন্ধুর পত্রে আমার পত্নীর বিশেষ মানসিক কষ্টের সংবাদ শুনিয়া আমার কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি না করিয়াই সহসা গৃহে প্রত্যাগত হই।

এই সময়ে আমার সহধর্ম্মিণী বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদ প্রাপ্ত হন। ১২৮৭ সনের কোন এক সময় সুদাস বা অমৃতানন্দ নামে তাঁহার একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার

পর তিনি প্রায় দুই তিন মাস কাল গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়িনী থাকেন। কিছু দিন পর বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ আমার সঙ্গে পাবনা যাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়া আইসেন।)

এই সময় হইতে বৈশাখের প্রথম তারিখে আমাদের বাড়ীতে নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব হইতে আরম্ভ হয়। তাহাতে পরলোকগত আত্মার ও পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার জন্য শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রদান ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা বিশেষ ভাবে আরম্ভ হয়। এই ভাবে নিত্য নূতন উৎসবে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

(১২৮৮ সনের শ্রাবণ মাসে সুমতি নাম্নী আমার আর একটী কন্যা জন্মে।) এই সময়ে শ্রদ্ধেয় প্রচারক নবদ্বীপচন্দ্র দাস আমাদের বাসায় প্রচার উপলক্ষে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহার সহিত উপাসনা ও আলোচনাদিতে বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি দেবী বাবু প্রণীত 'শরচ্চন্দ্রের' সমালোচনা করেন, এবং তাহা 'অবলাবান্ধবে' মুদ্রিত হয়।

১২৯০ সনের ৩রা বৈশাখে আমাদের বাসাতে বগুড়া আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্নপূর্ণা তাহাতে ছাত্রী হন, এবং প্রবন্ধাদি সংশোধনের ভার প্রাপ্ত হন। এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান প্রধান গ্রন্থ, খৃষ্টধর্ম্মের বাইবেল, মুসলমান ধর্ম্মের কোরাণ, ব্রাহ্মধর্ম্মের রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী, বৌদ্ধ ধর্ম্মের শাক্যসিংহের জীবনচরিত এবং পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান মহাপুরুষ ও সাধ্বী নারীদিগের চরিত্র ও ধর্ম্মভাব ভক্তিসহ আলোচনা ও পাঠ করেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি সময় সময় প্রথমশিক্ষকের কার্য্য করিতেন। এই বিদ্যালয়েই তিনি মৌখিক বক্তৃতা দিতে প্রথম আরম্ভ করেন, এবং পুস্তক পাঠ

করিয়া নূতন ধরনে তাহার ব্যাখ্যায় সকলকে পরিতুষ্ট করিতেন। এই সময় হইতে যাবতীয় উৎসবেই তিনি কখন আচার্য্যের কার্য্য, কখন বক্তৃতা, এবং কখন প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিশেষরূপে অনেকের ভক্তি ভাজন হইয়াছিলেন।

(১২৯০ সনের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি সুহৃদ নামে অন্য একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন।) ইহার কিছু পুর্ব্বে বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতসভার কার্য্যোপলক্ষে বগুড়া আইসেন। ইহার কিছু দিন পর বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয়ও বগুড়া আইসেন। তাঁহারা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া আমাদের বাটী যান। তিনি তাঁহাদিগকে রীতিমত অভ্যর্থনা করিয়া আলাপাদি করেন। বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাবু আনন্দমোহন বসু আমার সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা ও উপাসনাদিতে অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার ধর্ম্মভাবে ও অমায়িক ব্যবহারে বাবু যাদব চন্দ্র পাল বিশেষরূপে ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং তদবধি কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় পরিবার মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন।

এই সময় প্রমত্তভাবে শারদীয় উৎসব আরম্ভ হয়। বাবু পূর্ণ চন্দ্র দাসের বাসায় সকল ধর্ম্মাবলম্বী একত্র হইয়া এক সার্ব্বজনিক সভা সংস্থাপিত করেন। তিনি সভার আলোচ্য বিষয়ের আলোচনায় যোগদান ও স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেককে সুখী ও চমৎকৃত করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ সকল সৎসঙ্গ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার পরে আলোচনা পত্রিকায় ধর্ম্মপ্রচার

মাসে একটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, এবং তত্ত্বকৌমুদীতে একটি প্রবন্ধ এবং 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম,' ও 'সত্যমেব জয়তে' নামক দুইটী প্রবন্ধ দুই খানা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। সারধর্ম্ম নামক পুস্তকে তদ্বিরচিত ১৪টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি সারধর্ম্মের সংশোধন কার্য্য সম্পাদন করেন।

এই সময় শ্রদ্ধেয় আদিনাথ ও বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় আমাদের বাটীতে আসিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনায় সুখী ও আপ্যায়িত হন। এই সময় তিনি ভয়ঙ্কর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ১২৯২ সনের ভাদ্র মাসে সুষমা নামে একটি মৃতসন্তান প্রসব করেন। এই সময় হইতে প্রত্যেক বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় তৃতীয় দিবসে বগুড়া আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের বার্ষিকউৎসব কার্য্য মহোৎসাহের সহিত সম্পাদিত হইতে থাকে। এই বৎসর মাঘোৎসবের এক দিন ব্রাহ্মিকাদিগকে লইয়া অন্নপূর্ণা মহোৎসাহের সহিত উৎসব করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ হইতে সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় বিস্তীর্ণ ভাবে সারসঙ্কলন করিতে আরম্ভ করেন। তাহার কতকাংশ সারধর্ম্মে মুদ্রিত হইয়াছে।

এইসময় বগুড়া বাসা আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। ইহারঅব্যবহিত পরেই আমি উন্মাদরোগে আক্রান্ত হই। গৃহের দ্রব্যসামগ্রী প্রায় সমস্ত বিক্রয় করিয়া আমরা সকলেই মৃৎপাত্রে আহারাদি করিতে থাকি। এই সময়ে আমার ব্যারাম জন্য অন্নপূর্ণার অন্তরের বিশেষ কষ্ট থাকিলেও, বিলক্ষণ ধীরতার সঙ্গে আমার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। অর্থনাশ ও গৃহদাহে তাঁহার হৃদয় কিছু মাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই। এই সময় শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে কলিকাতা লইয়া যান, তথায় কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধু-

গণের সমবেতচেষ্টায় আমাদের সেবাশুশ্রূষা সুন্দররূপে চলিতে থাকে। এই সময়ে এক দিন অন্নপূর্ণা উপাসনার জন্য কেশব বাবুর কমলকুটীরে যান এবং উপাসনায় প্রীতিলাভ করেন। তথায় কেশব বাবুর পরিবারের সহিত আলাপ করেন এবং কেশব বাবুর সমাধি দর্শনান্তে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বগুড়ার ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার উমেশ বাবুর স্ত্রীর বাসায় আইসেন এবং সেই খানে আহারাদি করেন। উন্মাদ অবস্থায় কলিকাতা অবস্থান কালে, অগ্রজ শ্রীযুক্ত ভগবান্ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত অভিলাষ জন্মে। তাহা জানিতে পারিয়া অন্নপূর্ণা তাঁহাকে টেলিগ্রাফ্ করেন।

কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ভ্রাতা ভগিনীগণ ইতিপূর্ব্বেই অন্নপূর্ণার বন্ধুগণের নিকট তাঁহার সাধুজীবনের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি ইঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই সমধিক শ্রদ্ধা জন্মে; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময় তাঁহার সহিত উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনাদিতে যোগ দিতে না পারিয়া তাঁহারা আন্তরিক কষ্ট পাইতেন। অন্নপূর্ণাও তজ্জন্য দুঃখিত হইতেন। অন্নপূর্ণাকে আমার পীড়ার জন্য সর্ব্বদা নিকটে বসিয়া থাকিতে হইত; এবং আমার জীবনের ক্ষতি আশঙ্কায় অনেক সময় তাঁহাকে চিন্তায় আকুল করিত। এই সব কারণে তিনি বিশেষ কোন ব্যাপারে যোগ দিতে পারিতেন না; কেবল বন্ধুগণের সহিত সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ করিতেন মাত্র।

অন্নপূর্ণার টেলিগ্রাম পাইয়া ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতা মহেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবি চাকর বগুড়া হইতে আমাদের সঙ্গে

ছিল। আমরা সকল সহিত কলিকাতা হইতে বাহেরকের বাটিতে পহুঁছিলাম।

রামনিধি চট্টোপাধ্যায় আমার পিতামহ। ত্রিপুরা সুন্দরী নামে তাঁহার এক মাত্র স্ত্রী। আমার পিতা রামশম্ভু চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের প্রথম সন্তান। জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দুর্গাদেবী-নামে তাঁহাদের আর দুইটি সন্তান। আমার পিতা চারিটি দার-পরিগ্রহ করেন,—প্রথমা স্ত্রী ক্ষমা দেবী, দ্বিতীয়া কমলিনী দেবী, তৃতীয়া আমার গর্ভধারিণী জাহ্নবী দেবী এবং চতুর্থা স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী দেবী। ক্ষমাদেবীর গর্ভে গিরীশ চন্দ্র, হরিচরণ, অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় নামে আমার তিন ভ্রাতা; কমলিনী দেবীর গর্ভে চন্দ্র কান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে আমার এক ভ্রাতা ও শ্যামাসুন্দরী নামে এক ভগ্নী জন্মে। জাহ্নবী দেবীর গর্ভে বামাসুন্দরী দেবী, মহেশচন্দ্র, আনন্দ চন্দ্র, ভগবান্ চন্দ্র, নবীন চন্দ্র, গণেশ চন্দ্র বা শ্রীমন্ত, মনাইজঙ্গলি চট্টোপাধ্যায় ও উমাসুন্দরী দেবী নামে আমরা কয়েক সহোদর ও সহোদরা জন্মি। সিদ্ধেশ্বরী দেবী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

আমার মাতামহ রামজয় মুখোপাধ্যায়; তাঁহার একমাত্র পুত্র আমাদের মাতুল মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দুই বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রী জগদম্বা; রাধামণীদেবী নামে তাঁহার একমাত্র কন্যা। দ্বিতীয়া স্ত্রী আমার পিতৃষসা দুর্গাদেবী। সারদাসুন্দরী দেবী নামে দুর্গাদেবীর এক কন্যা। সারদাসুন্দরির সুখদা, গঙ্গা, আন্নামনি, কালীতারা ও মোক্ষদাদেবী নামে পাঁচ কন্যা।

আমার খুল্লতাত জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুই বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রী হরসুন্দরী দেবী; প্রসন্ন কুমার, অক্ষয়কুমার, কালী-

কুমার, মহেন্দ্র কুমার, অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় নামে তাঁহার পাঁচ পুত্র ও বরদা সুন্দরী ও সৌদামিনীদেবী নামে তাঁহার দুই কন্যা সন্তান হয়। দ্বিতীয়া স্ত্রী বামাসুন্দরী দেবী ; তাঁহার এক মাত্র কন্যা।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী ত্রিপুরা সুন্দরীদেবী : তাঁহার রাজমোহন, লালমোহন নামে দুই পুত্র, মাণিক্য দেবী নামে এক কন্যা।

সর্ব্বাগ্রজ মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী নবকুমারী দেবী ; তাঁহার বিন্দুবাসিনী, বিভাসিনী, সুহাসিনী নামে কন্যা ও দীনেশচন্দ্র নামক এক পুত্র জন্মে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে ক্ষীরোদবাসিনী নামে এক কন্যা জন্মে।

অগ্রজ আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ও দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী পরেশমণি দেবী। তাঁহার মহানন্দ, সর্ব্বানন্দ নামে দুই পুত্র। দ্বিতীয়া স্ত্রীর কয়েকটী কন্যা সন্তান হয়।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক স্ত্রী। তাঁহাদের কোন সন্তান জীবিত নাই।

অগ্রজ ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিন বিবাহ। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে মনোরমা, প্রিয়তমা, অনুপমা ও নিরুপমা নামে কন্যা এবং শ্রীশচন্দ্র নামে পুত্র সন্তান হয়।

অগ্রজ নবীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্ণময়ীদেবী নামে এক স্ত্রী। তাহার কন্যা দুইটী ও সতীশ নামে পুত্র একটী।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়ের এক স্ত্রী। তাঁহার তিনটী পুত্র ও দুইটি কন্যা।

কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের এক স্ত্রী।

কনিষ্ঠ খুল্লতাতভ্রাতা অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের এক স্ত্রী। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা।

কনিষ্ঠ খুল্লতাত ভ্রাতা মহেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়ের এক স্ত্রী।

কনিষ্ঠ খুল্লতাতভ্রাতা অশ্বিনিকুমারের এক স্ত্রী। তাঁহার এক সন্তান।

এই বৃহৎ পরিবারের মধ্যে অন্নপূর্ণা সকলেরই আদরের পাত্রী ছিলেন। শ্বশুর, ভাশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি যথোচিত বিনয় ও ভক্তিভাব প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। ননদিনী ও জাদিগের সহিত অকৃত্রিম ভালবাসায় দিন কাটাইয়াছেন। এক দিনের তরেও কাহার সঙ্গে কোনপ্রকার অকৌশল ঘটে নাই। প্রত্যুত সকলেরই সহিত অতি সদ্ব্যবহারে জীবন কাটাইয়াছেন। দেবর ও ভাশুরপুত্রদিগকে স্নেহ ও ভালবাসা দ্বারায় সুখী করিয়াছেন।

কিছু দিন বাহেরকে থাকিয়া আমার ব্যারামের অবস্থাতে শ্বশুরালয় যাইবার জন্য ব্যস্ত হই। অন্নপূর্ণা পিত্রালয়ের দরিদ্রাবস্থার জন্য যাইতে অসম্মত হন, কারণ আমার ব্যারামের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার ব্যয় সঙ্কুলন তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু আমি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বারংবার উত্তেজনা করাতে দাদা ভগবান্‌চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেখানকার ব্যয়ের জন্য অর্থ সঙ্গে দিয়া নৌকাযোগে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দেন।

আমরা অন্নপূর্ণাসহ পঞ্চসার পহুঁছিলাম। এই সময়ের পূর্ব্বে আমার শ্বশুর রামকুমার চৌধুরী মহাশয়ের অভাব হয়। অন্নপূর্ণার জ্যেষ্ঠসহোদরা স্বর্ণময়ী তখন বিধবা। নাবালক দুইটি পুত্র মাত্র সম্বল। এই অবস্থায় ও যথোচিত সেবা শুশ্রূষার কোন প্রকার

ত্রুটি হয় নাই। তত্রস্থ মহেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ ও চন্দ্রকান্ত আচার্য্য এবং দুর্গাদেবী ও নৃত্যকালীদেবী অন্নপূর্ণাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; অন্নপূর্ণা শৈশবাবস্থায় তাহাদিগের নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহারা অন্নপূর্ণার প্রতি বিশেষ যত্ন এবং আমার সেবাশুশ্রূষাদি সুন্দররূপে করিয়া বিশেষ সদাশয়তার পরিচয় দান করেন

ইহার পর আমরা ঢাকায় যাত্রা করিলাম; তথায় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় পহুঁছিলাম। বাহেরক নিবাসী বরদাকান্ত বসু আমাদের সহিত আসিলেন। ইনি বাহেরকের বাটী হইতেই আমাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন এবং নানাপ্রকার সেবা শুশ্রূষা করিয়া অন্নপূর্ণার বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

ঢাকা যাওয়ার পর বাবু রজনীকান্ত ঘোষ ও বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রেরিত অর্থদ্বারা আমাদের ভরণপোষণ চালাইতে লাগিলেন; তাঁহারা সহৃদয়তাগুণে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও যত্নের ত্রুটি করেন নাই। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। হটাৎ এক দিন আমি নিরুদ্দেশ হইলাম। অন্নপূর্ণা আমার জীবনের আশায় হতাশ হইয়া তথাকার বন্ধুগণের দ্বারা বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু যখন কিছুতেই আমার সন্ধান পাইলেন না, তখন ভগ্নহৃদয়া হইয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় আবার সুখময়ের দাস্ত হওয়ায় তাঁহার মানসিক ক্লেশের পরিসীমা রহিল না। রাত্রি ১টার পর সহসা আমি বাসায় উপস্থিত হইলাম আমাকে দর্শন করিয়া তিনি আশ্চর্য্য প্রফুল্লভাব প্রকাশ করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে আমি উন্মাদাবস্থায় ঢাকা জেলে যাই। অন্নপূর্ণার হৃদয় তাহাতে একেবারেই ভাঙ্গিয়া যায়। ইতি মধ্যে আবার সুশীলা কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়াতে তাহার সেবা শুশ্রূষায় তাঁহাকে কতক ধৈর্য্যশীলা করিয়াছিল। এক মাস পরে আমি আরোগ্য লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিছু দিন পরে তিনি উরুস্তম্ভরোগে আক্রান্ত হইয়া ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মুক্তি লাভ করেন। এই সময় শ্রদ্ধেয় বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় সদলে আমাদের বাসায় আসিয়া উপাসনা সংগীত, সংকীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাকে বিশেষ সুখী করিয়াছিলেন। এবং বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ চন্দ্র সেন, প্রসন্নকুমার ঘোষ, কেদারনাথ রায়, কেদারেশ্বর সেন, হারান বাবু, হরিসুন্দর বাবু, পণ্ডিত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বন্ধুগণ বিশেষ রূপে সাহায্য করিয়া তাঁহার দুঃখের লাঘব করেন। যে বামাসুন্দরী এক সময়ে আমাদিগের বগুড়ার বাটীতে থাকিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন, এখন আমার এই দুরবস্থার সময় তিনি আশ্চর্য্য শ্রদ্ধার সহিত নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রদান, ও সন্তানদিগের প্রতি যত্ন, এবং সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া বিশেষ ভালবাসার পরিচয় দান করিয়াছেন। অন্নপূর্ণা ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়া এবং ব্রাহ্মপরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতীব প্রীতি লাভ করেন। তৎপর তথা হইতে নৌকাযোগে ভাই কেদারেশ্বর সেন ও বালক বালিকাগণসহ তাঁহাকে লইয়া পুনরায় বগুড়ায় পৌঁছি।

এই সময়ে বগুড়ার বাড়ীর নিতান্ত দুরবস্থা। আমার স্ত্রী অসাধারণ শ্রম সহকারে সমস্ত বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ডিস্‌পেন্সারীর ঔষধাদির সুশৃঙ্খল করিয়া গৃহকার্য্যে পূর্ব্বের ন্যায় মনোযোগী হইলেন। এই হইতে পুনরায় রীতিমত উপাসনা সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন চলিতে লাগিল। কিছু দিন এই ভাবে চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা হটাৎ নিউমোনিয়া রোগে কাতর হইয়া পড়িলেন। অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া মৃতবৎ অবস্থা হইতে বাঁচিয়া উঠিলেন। কিছু দিন পর শরীর প্রকৃতিস্থ হইল। তখন নবোদ্যমে আবার সমস্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এই বারেও শারদীয় উৎসবে ও পারিবারিক উৎসবে পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যাদি করিয়াছিলেন।

(কিছু দিন পরে ১২৯৩ সনের পৌষ মাসে তিনি সুধাময় নামে আর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন।) এইটীই তাঁহার শেষ সন্তান। প্রসবের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু অপরিমেয় মানসিক বল থাকাতে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে কখন বিরত হন নাই।

তাঁহার এরূপ অবস্থায় কলিকাতায় মাঘোৎসবে যাইবার আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাঁহার একান্ত প্রযত্নে আমাকে যাইতে হইয়াছিল। মাঘোৎসব হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি তিনি মাঝে মাঝে জ্বর এবং পেটের ব্যারামে কষ্ট পাইতেছেন। অচিরাৎ এই জ্বরেই তাহার প্লীহা যকৃতাদি বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। এই রোগই পরিশেষে তাহার নিদানরোগে পরিনত হইল।

ব্যারাম চলিতে থাকিল, কেবল মাঝে মাঝে ভালও থাকিতেন। ইহাতেও তাঁহার কাজ কর্ম্ম বন্ধ হইল না। এই অবস্থায় ১২৯৪ সালের বৈশাখের উৎসব অতি ধুম ধামে সম্পন্ন হইল। ক্রমে বর্ষা উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যারামও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তৎ সঙ্গে জীবনের আশায় ক্রমেই নিরাশ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি এবার তাঁহার মৃত্যু এত নিশ্চিত মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার কোন কোন বন্ধুর নিকট "এবার আমি ফিরিতেছি না" এই কথাটী প্রায়ই বলিতেন।

বর্ষা উপস্থিত হইল। তাঁহার ব্যারামের ভোগ ও ক্রমশঃ দীর্ঘ কাল ব্যাপী হইতে লাগিল। আমার এবং আমার বন্ধুগণের সাহায্যে যতদুর সম্ভব চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন চিকিৎসার ফলই স্থায়ী হইল না।

এ সময় অন্নপূর্ণা নৌকায় পরিভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কোন চিকিৎসায় ফল না পাইয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে জল পথে ভ্রমণে তাঁহার এ কঠিন পীড়ার উপশম হইতে পারে। নানা প্রতিবন্ধকে তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

ইতি পূর্ব্বে আমার ব্যারাম সময় বাহেরকের বাড়ী হইতে অন্নপূর্ণার পিত্রালয় পঞ্চসার হইয়া যখন আমরা ঢাকা যাই, সেই সময় হইতে ঢাকা অবস্থান কাল পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। এই সময় অন্নপূর্ণার কন্যা শ্রীমতী সুশীলার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। আমাদের বগুড়া আইসার পর হইতে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ক্রমাগত চিঠি পত্র চলিতে থাকে। আমরা ঐ সমস্ত পত্র পাঠ করিয়া তাঁহাদের

উভয়ের মধ্যে পরস্পর প্রগাঢ় প্রণয়ের পরিচয় পাইলাম। তৎপর আমাদিগের মধ্যে এই বিষয়ে অনেক আলোচনা হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত বসুকে এই বিষয়ের মত জানিবার জন্য চিঠি লিখা হইল। বরদা বাবু সম্মত হইলেন।

অন্নপূর্ণা নৌকা পরিভ্রমণের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে বরদা বাবুকে দেখিবার ইচ্ছা ও প্রকাশ করিলেন। বরদা বাবুকে চিঠি লিখা হইল। কিন্তু অন্নপূর্ণার মনোরথ পূর্ণ হইল না।

ক্রমেই তাঁহার ব্যারাম বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দারজিলিংদর্শন তাঁহার জীবনের প্রধান সাধ ছিল;‌ এই সময় নৈসর্গিক শোভার আবাসভূমি দারজিলিং দর্শনস্পৃহা বড়ই বলবতী হইয়া উঠিল। দারজিলিং যাওয়ার আয়োজন হইতে লাগিল। সমস্ত প্রস্তুত,- দারজিলিং রওনা হইবেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার ব্যারাম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। সুতরাং তাঁহার এই মানসও অপূর্ণ রহিয়া গেল।

তাঁহার এই অবস্থাতেই শারদীয় উৎসব সম্পন্ন হইল। সাধ্যমত তিনি তাহাতে যোগদান করিলেন। পরে কার্ত্তিকের পারিবারিক উৎসব আসিল। এই সময়ে শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষাল বিনোদবিহারী রায় প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুগণ উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের উপাসনা, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তনে অন্নপূর্ণা ব্যাধি যন্ত্রণার অনেক লাঘব বোধ করিলেন। এবারকার পারিবারিক উৎসব মত্ততার সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যাপী হইয়াছিল। এই উৎসবে উপাসনাদি করিয়া অন্নপূর্ণা হৃদয়ে প্রচুর বল পাইয়াছিলেন।

উত্তরোত্তর অন্নপূর্ণার শরীর দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইতে লাগিল। এই সময় হইতে বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও তাঁহার পরিবার সর্ব্বদা

যাতায়াত করিয়া নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করত: বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এবং শ্রীমতী শরৎ শশী গুপ্তা, শ্রীযুক্ত মধুসূদন বক্সী, শ্রীযুক্ত সৈয়দ অলি উল্লা, বাবু কৃষ্ণগোপাল সান্যাল, বাবু শ্রীনাথ দে, বাবু রামচন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি বন্ধুগণ সপরিবারে অন্নপূর্ণার বিশেষ প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন। বাবু ভুবন মোহন সেন, কেশব নাথ রায়, বেণীমাধব চাকী, শশীকান্ত বসু, নবকান্ত রায়, শ্রীমন্ত কবিরাজ, মহিমচন্দ্র দাস, শরদিন্দু ভৌমিক, গিরিগোপাল রায়, প্যারি শঙ্কর দাসগুপ্ত, কামিনীকুমার ঘোষ, অনাথ বন্ধুসেন, আনন্দ চন্দ্র তর্কালঙ্কার, আনন্দচন্দ্র চৌধুরী, মোহিনী মোহন বসু, ভুবনেশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন সান্যাল, রাসবিহারী রায়, জগবন্ধু সেন, রুদ্রনাথ তরফদার, নৃত্যগোপাল সান্যাল, উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মহিমচন্দ্র রায় প্রভৃতি বন্ধুগণ সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। ইহাঁদের সদাশয়তায় অন্নপূর্ণা অতীব সন্তোষ লাভ করিতেন। বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ খাঁ তাঁহার পরিবার সহ নানা প্রকার যত্ন করিয়াছিলেন। ব্যারামের প্রাক্কাল হইতে অন্নপূর্ণার শরীরে এক আশ্চর্য্য ভাব পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছিল; মধ্যে ২ যখন তিনি একটু সুস্থ থাকিতেন তখনই তাঁহার এমন প্রফুল্লভাব উপস্থিত হইত যে আর রোগী বলিয়া কেহ সহসা অনুভব করিতে পারিতেন না। তৎসময়ে মানসিক বল ও তাঁহার এই রূপ বৃদ্ধি হইত যে তিনি অনায়াসে রুগ্ন শরীর লইয়া সন্তানগণ সহ পদব্রজে বগুড়া ব্রাহ্মসমাজে ও কোন ২ বন্ধুবান্ধবের বাটীতে যাতায়াত করিতেন।

অন্নপূর্ণার জীবনের ইতিহাস শেষ করিবার আর অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। এখন একবার তাঁহার জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া

দেখা যাউক। তিনি কি প্রকৃতি লইয়া জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন এবং কার্য্যত: এপর্য্যন্ত কি করিয়াছেন।

যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক বঙ্গদেশে প্রধান ২ নগর অতিক্রম করিয়া পল্লী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, পল্লী-গ্রামে হিন্দুবাসস্থলিতে দেবার্চ্চনা ও ব্রত নিয়মাদির প্রাধান্য সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান ছিল। এমত সময় হিন্দুধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাসী ধীরপ্রকৃতি নিষ্ঠাবান রামকুমারের ঔরষে ভৈরবীদেবীর গর্ভে অন্নপূর্ণা জন্মগ্রহণ করেন। জন্মিয়াই হিন্দুর রীতি নীতিতে সংস্কৃত হইয়া হিন্দু ক্রিয়াকলাপ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বাল্যকালেই জীবনে ধর্ম্মস্পৃহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। বাল্যোচিত ব্রত-নিয়মাদি বিশেষ অনুরাগের সহিত সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন। বালক বালিকা দিগকে লইয়া পূজার উপকরণাদি সংগ্রহ করিতেন। এবং দেব দেবীর স্তোত্র কণ্ঠস্থ করিয়া তাহা প্রতিদিবস পাঠ করত তৃপ্তিলাভ করিতেন খেলার সঙ্গিনীদের মনাকর্ষণ করিয়া নানা প্রকার বাল্যপ্রণয়ের সুমধুর ভাবে সকলকে আকৃষ্ট করিয়া-ছিলেন। যখন যে উৎকৃষ্ট কার্য্য দেখিতেন, তাহাতে প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি আয়াস স্বীকার করিয়া প্রধান স্থান অধিকার করিতেন। এই জন্য সমবয়স্ক বালিকারা তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিত না। বালিকা কালে মাতৃবিয়োগ হওয়াতে পরিজন দিগের বিশেষ আদরের পাত্রী ছিলেন। এই জন্য যখন যে ভাল বিষয় জেদ করিতেন তাহা সহজেই সম্পন্ন করিয়া লইতে পারিতেন। সমবয়স্ক বালকদিগকে লেখা পড়া করিতে দেখিয়া লেখা পড়ার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়েন। এবং বালিকাদিগের লেখা পড়া করিতে নাই বিশ্বাস সত্বেও তিনি

লেখা পড়া শিক্ষার অনুরাগ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রত্যুত নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও দৈনন্দিন লেখা পড়ায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালীয় শিক্ষক তাঁহার আশ্চর্য্য অনুরাগ, স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া গোপনে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সুমধুর অমায়িক সরল ব্যবহারে তিনি সঙ্গিনী ও অভিভাবকগণের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠেন। শিল্প-চিত্রবিদ্যায় তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা দেখিয়া পরিজনগণ তৎসম্বন্ধে তাঁহার নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন।

বালিকা কাল হইতে রীতিমত সুশিক্ষা পাইলে তিনি যে ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শনারীরূপে পরিচিতা হইতেন তাহা তাঁহার বাল্যজীবনের প্রভাব দেখিয়েই অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি আমাকে, বিবাহের পরে কোন এক সময় বলিয়াছিলেন, 'যদি বাল্যকালে তোমার সহিত দেখা হইত তাহা হইলে বিবাহ না করিয়াই আমি তোমার সঙ্গে যাইয়া কোন উচ্চতম শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিয়া মনের সাধ পূর্ণ করিয়া শিক্ষা করিতে পারিতাম।' বিবাহ দ্বারা সেই উচ্চতম আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশ্য এস্থলে আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাঁহার শিক্ষায় ব্যাকুলতা, বুদ্ধির প্রখরতা ও স্মরণশক্তির তীক্ষ্ণতার বিশেষ পরিচয় পাইয়াও যে তাঁহাকে কোন উচ্চতম শিক্ষালয়ে প্রেরণ করিয়া শিক্ষা দেই নাই, প্রত্যুত অশেষ প্রকারে তাহার শিক্ষার অন্তরায় হইয়াছি, তজ্জন্য আমাকে অনেক সময় অনুতপ্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু অন্নপূর্ণা স্বকীয়

মানসিক বলে চতুর্দ্দিকের বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়াও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষায় উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতেছিলেন।

যে বয়সে তিনি ভাল মন্দ বিচার করিয়া শ্রেয়ঃ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমি এপর্য্যন্ত সেইরূপ বয়সে কোন বালক বালিকাকে সেইরূপ করিতে দেখি নাই। তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহা অতীব দৃঢ়তার সহিত সম্পন্নকরিয়াছেন। এজন্য বিবাহ মাত্র পতির বাক্য প্রতিপালন করিয়া পিত্রালয়ে অশেষ প্রকার নিন্দা ও ভৎসনা ভাগিনীহইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্থিরসংকল্প রহিত হয় নাই।

অল্প দিন মধ্যে পতিপ্রেমানুরাগিণী হওয়াতে বাল্যসঙ্গিনী দিগের নিকট নানা প্রকার উপহাসের পাত্রী হইয়াছিলেন। গুরুজনদিগকে চিন্তিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তিনি যেমন বাল্যকালে পিতা, মাতা, গুরু, পুরোহিত প্রভৃতির নিকট পতি দেবতা বলিয়া শুনিয়া আসিয়াছিলেন, কার্য্যকালে সেইরূপ আচরণ দ্বারায় সকল লোকের বিশেষরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার আপনার জিনিসগুলির প্রতি সাতিশয় যত্ন ছিল, কিন্তু বিবাহের পরে পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন জিনিসের প্রতি তাঁহার বিশেষ কোন যত্ন দেখা যায় নাই। কারণ তিনি দেখিলেন পার্থিব সুখভোগের বস্তু লইয়া যাহারা বিশেষ যত্ন করে, সামান্য কারণে লোকের সহিত তাহাদিগের ঝগড়া কলহ উপস্থিত হয়। ঝগড়া কলহ ও রাগ দেখিলে তিনি বড় ভীত ও চিন্তিত হইতেন। আমাদের বাটীতে যখন বিবাহের পর প্রথম আসিলেন, তখন আমার ও আমার ভ্রাতাদিগের রাগ দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন, এবং আমার নিকটে

বলিলেন, 'তোমাদের এত রাগ ভাল নয়, ইহাতে তোমাদের নিকট কেহ মন খুলিয়া আলাপ করিতে সাহসী হইবে না।' সেই হইতে আমার কোন কারণে রাগ উপস্থিত হইলেই নানা কৌশলে মূলেই যাহাতে তাহা বিনষ্ট হয় সতত তাহার চেষ্টা করিতেন। আমি কোন্ সময়ে কোন্ কথা কি ভাবে বলিতাম তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

অন্নপূর্ণা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, তাহা পালন করিতে ক্ষণকালও বিলম্ব করিতেন না। যখন বুঝিতে পারিলেন যে সৃষ্টিকর্ত্তা নিরাকার, তাঁহার অর্চ্চনা কেবল মানসেই সম্পন্ন হইতে পারে, বাহ্যপূজা ভ্রান্তিমূলক ও কুসংস্কারপ্রসূত, তখন হইতে গোপনে মানসে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করেন। যখন বুঝিতে পারিলেন, অলঙ্কারাদি বেশ ভূষা দ্বারায় অহঙ্কার বৃদ্ধি হইতে পারে সুতরাং তাহা নির্ম্মল সংসার সুখের অন্তরায়স্বরূপ, তখন হইতে সকল প্রকার বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিলেন। আমি এত অল্প বয়সে কোন বালিকার এইরূপ নিস্পৃহ ভাব দেখি নাই। যদিও এইরূপ বলবতী সত্যপরায়ণতায় তাঁহার পিতা, ভগ্নী, শ্বশুর, ভাসুর প্রভৃতি নিকটতম গুরুজনদিগের বিশেষ দুঃখ উৎপাদন করিয়াছিল, তথাপি কোন বাধাতেই তাঁহার সেই অদম্য বল হ্রাস করিতে পারে নাই। তিনি হিন্দুললনাদিগের অবশ্যপালনীয় কুসংস্কার পূর্ণ ব্যবহার পরিত্যাগ করাতে, তাঁহার আত্মীয়গণ আন্তরিক আঘাত পাইয়া কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, তিনিও কান্দিয়া ফেলিতেন, কিন্তু তাঁহার সত্যনিষ্ঠা কিছুতেই বিচলিত হইত না, কাহারও অনুরোধে কিম্বা মায়ায় আবদ্ধ হইয়া কদাচ

কোন অন্যায় কার্য্য করিতে সম্মত হইতেন না।

অন্নপূর্ণা যখন জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া 'একমেবা দ্বিতীয়মং পূর্ণব্রহ্মের' আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সর্ব্বপ্রকারে আত্মীয় স্বগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। আত্মীয়গণ অনেকেই তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিষ্কামধর্ম্ম-সাধনার দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁহাদের অন্তর হইতে অতি শীঘ্রই ক্রোধের ভাব তিরোহিত হইল। এই জন্য তিনি জাতি পরিত্যাগের পরেও যখন পিত্রালয়ে কি শ্বশুরালয়ে যাইতেন, তখন অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে আমার সহিত আলাপাদি করিতে দেখিয়াও বাল্যকালের ন্যায় সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন।

তাঁহার বাল্যজীবনেই এক অভিনব তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যখন যাহা সঙ্গত বুঝিয়াছেন কাহারও মতের অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই জন্য বন্ধুবর পূর্ণচন্দ্র গুহের নিকট ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি শ্রবণ করিয়া, পতির অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারেই উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। অল্প বয়সেই স্বাধীনতার বীজ তাঁহার কোমল হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল;—আমার চাকুরী পরিত্যাগের সময় তিনি যেরূপ স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও অদম্য বলের সহিত আমাকে অধীনতা-পাশ ছেদন করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা অতি অল্প লোকেই পরিলক্ষিত হয়।

এক সময় পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমি বলিয়াছিলাম, যে সকল পাপ চিন্তা, কার্য্যে পরিণত হয় নাই, তাহার জন্য ঈশ্বর বোধ হয় শাস্তি দিবেন না। এবং সেইরূপ পুণ্য-

বাসনা কার্য্যতঃ সম্পন্ন না হইলেও তিনি তজ্জন্য কোন সুফল প্রদান করিবেন না। আমার তৎকালিক এই বিশ্বাস জানিতে পারিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার হৃদয়ে কি এখনও পুনঃ পুনঃ পাপ চিন্তা উপস্থিত হয়?' আমি উত্তর করিলাম, 'মন এত চঞ্চল যে আমি সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার মন্দ বিষয়ের উদ্ভাবনীশক্তি লোপ করিতে পারিতেছি না'। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'আমার বিশ্বাস ছিল, তোমার হৃদয়ে কোন প্রকার কুচিন্তা বিচরণ করে না। আজ তোমার হৃদয়ের এই দুরবস্থা জানিতে পারিয়া সকল পুরুষের অন্তর অবিশ্বাসের ভূমি বলিয়া অনুমান হইতেছে। বহুদিবস হইতে আমি দেখিয়া আসিতেছি যে, তোমার অনেক সুহৃদ্ নিতান্ত অসচ্চরিত্র, তুমি তাহাদের সহিত যেরূপ মিশামিশি কর এবং যেরূপ ভাবে তাহাদের কুৎসিত আলাপ শ্রবণ কর, তাহাতে তোমার ঐ দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী। আমার অনুরোধ তুমি তাহাদের সহিত সেরূপ ঘনিষ্টতা পরিত্যাগ করিবে, তাহারা কোন মন্দ প্রসঙ্গ উঠাইলে তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে চলিয়া আসিবে এবং সদালাপী বন্ধুদিগের সহিত ঘনিষ্ট যোগে আবদ্ধ হইবে। তুমি সকলপ্রকার পুস্তকই আগ্রহের সহিত পাঠ কর; তাহা না করিয়া কেবল সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সদালাপ, সদালোচনা, উপাসনা, প্রার্থনা, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনে সমস্ত অবকাশ সময় কাটাইও; তাহা হইলে দেখিবে হৃদয় মধ্যে আর কুভাব উদয় হইবে না। সর্ব্বদা সচ্চিন্তায় হৃদয়ে নির্ম্মল সুখ অনুভব করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধী হইতে পারিবে। কুচিন্তা যেমন পুনঃ পুনঃ মনে উদয় হইয়া কুকার্য্যের সহায়তা করে, সৎচিন্তা

সেইরূপে সৎকার্য্য সাধনের সহায় হইয়া থাকে। কুচিন্তার জন্য আমরা নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকট অপরাধী, ও দণ্ডনীয় হই এবং সুচিন্তার জন্য তাঁহার নিকট পুরস্কৃত হইয়া থাকি।' এই উপদেশ আমাকে ভয়ে কণ্টকিত করিল। শৈশব হইতে এপর্য্যন্ত যতবার মানসিক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, তজ্জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইলে ভবিষ্যৎ জীবন কেবল যন্ত্রণাময় হইবে, অথচ মন এমন দুরন্ত যে তাহাকে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না; এই ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলাম।

মন্দ চরিত্রের সহিত মিলিত হইয়া দুই একবার জীবনের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল; কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য অন্নপুর্ণার বাক্য আমাকে মোহ-নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিল। 'আমি কিছু দিন পর্য্যন্ত দৃঢ় সংকল্পের সহিত এই উপদেশ মত চলিব' ইহার পর হইতে সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে এই ভাবটী জাগ্রত ছিল এবং সাধনাবলে ক্রমে ক্রমে অন্তরের মলিন ভাব উদ্ভাবনীশক্তি হ্রাস হইতেছে দেখিয়া প্রবল উৎসাহের সহিত প্রোক্ত ব্রতপালনে ব্রতী হইলাম। এই হইতে অন্নপূর্ণার জীবন আমার জীবনের উপরে গুরুভাবে কর্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করিল। এই হইতেই আমার হৃদয়ের কোমলতা ক্রমশ: হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। ইহার পর হইতে ;আমার দৈনিক কার্য্যকলাপের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কোন সময়ে কোন একটু অন্যায় কার্য্য করিলে, তজ্জন্য তাহার মিষ্ট ভৎসনার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম না।

অন্নপূর্ণার প্রথম হইতেই বর্ণাশুদ্ধিতে ও ভাষাবোধে বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। সামান্য সামান্য চিঠি পত্র গুলি যে

লিখিতেন তাহাতে অতি সুমধুর প্রাঞ্জল ভাষার পরিচয় পাওয়া যাইত। এই জন্য আমার চিঠি পত্রাদি অন্নপূর্ণাকে না দেখাইয়া প্রায় কোথায়ও পাঠাইতাম না। অনেক সময় সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তনে আমার শ্রুতি কর্কশ ভাষা গুলিও শ্রুতি মধুর করিয়া তুলিতেন। কিন্তু তাঁহার এই বিষয়ে প্রশংসা করিলে বড়ই লজ্জিত হইতেন।

তিনি প্রকৃত প্রণয়ের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। প্রণয় সম্বন্ধে তাঁহার ভাব বিশেষ উচ্চ ছিল। তিনি বলিতেন যে প্রণয়ীর নিকট প্রণয়পাত্রের সকলই সুন্দর। পৃথিবীর কোন লোক তাহার প্রণয়পাত্র হইতে অধিক সুন্দর হইতে পারেনা। এই বিষয়ে যদিও আমি কতকাংশে তাঁহার সহিত একমত ছিলাম, তথাপি একটী বিষয়ে আমার বিশেষ অনৈক্য ছিল। আমার মত যে পৃথিবীতে যথায় যে গুণ দেখিব প্রণয়ী ব্যক্তিতে সে সমস্ত গুণের একত্র সমাবেশ দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন। তিনি বলেন যখন যে লোকের গুণ দেখিয়া মোহিত হইবে তখনই প্রণয়ীর নিকট অপরাধী। তাঁহার বিশ্বাস যে প্রগাঢ় প্রণয় থাকিতে অন্য পাত্রে অধিক গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না ; যে দেখে সে ব্যাভিচারী। আমি বলি যে মনুষ্যের প্রকৃত জ্ঞান থাকিলে সে সকল পাত্রেই গুণ দেখিবে ও তাহার প্রশংসা করিবে। অবশ্য গুণ দেখিয়াই সেই বস্তু আমার হউক এরূপ ভাব হওয়া উচিত নয়, আমার প্রিয় পাত্রে সেইরূপ গুণ আসিলে আমি বড় সুখী হই। এইরূপ ভাবে গুণের পক্ষপাতী বলিয়া আমি অনেক সময় তাঁহার মনোবেদনার কারণ হইয়াছি। এই জন্য অনেক সময় তিনি বলিতেন,

আমি তোমার উপযুক্তা হই নাই বলিয়াই তোমার, এইরূপ ভাব বদ্ধমূল রহিয়াছে'। আমি কখনও তাহা স্বীকার করিনাই বরং আমি তোমার পক্ষে যেরূপ তুমি আমার পক্ষে তাহা অপেক্ষায় সহস্র গুণে অধিক। তবে আমার ভালবাসা তোমার নিকটে অধিক প্রকাশিত হয় না। অন্তর দেখিয়া বিচার করিলে বোধহয় তুমি আমার নিকট এই বিষয়ে অপরাধী হইবে। আমার উন্মাদ ব্যারামে কোন একসময় তিনি এ কথা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।

অন্নপূর্ণার সুমধুর পবিত্র প্রকৃতিতে আমার গৃহ আনন্দের নিকেতন ছিল। বহু দুঃখ কষ্ট করিয়া আসিয়াও অত্যল্প কালের ব্যবহারে সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছি। আমার অনেক সহৃদয় বন্ধু আমাকে অনেকবার আনন্দে গদ্ গদ্ হইয়া বলিয়াছেন যে, আপনার গৃহে আসিলে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না, কেবল বহু দিন পরে নিজ গৃহে আসিলে যেরূপ আনন্দ পাওয়া যায়, এইরূপ ভাব দ্বারায় তাহার কথঞ্চিৎ প্রকাশ হইতে পারে। কেবল অন্নপূর্ণার সদ্ব্যবহারেই আমার গৃহে আসিয়া লোকে শান্তি পাইত।

অন্নপূর্ণার সঙ্গে অতি দীন দরিদ্র হইতে সুশিক্ষিত সুসম্পন্ন ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই আলাপে বিশেষ সুখানুভব করিয়াছেন। এই জন্য বগুড়াস্থ অনেক লোকেই তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিতেন অন্নপূর্ণার তর্ক ও বিচার কথা শুনিয়া কোন ২ সুশিক্ষিত লোক সহসা কোন রূপে বিশ্বাস করিতে চান নাই। কিন্তু পরে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতে বিচার করিয়া তাঁহার

বুদ্ধি শক্তির এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

অন্নপূর্ণার বিনয় কিছু অতিরিক্ত ছিল। তিনি আপনাকে সকল বিষয়ে অতি দুর্ব্বল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সহসা কাহারও সহিত আলাপ করিয়া আপনার ভালবাসা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। যত অধিক দিন অধিক সময় ব্যাপিয়া তাঁহার সহিত আলাপ হইত, ততই তাঁহার ভালবাসা প্রকাশ পাইত। তাঁহার সহিত যে যত ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ ব্যবহারাদি করিয়াছেন তিনি তাঁহার সদাশয়তা ও উচ্চ হৃদয়ের তত পরিচয় পাইয়াছেন। সাধারণতঃ দেখাযায়, যে কাহার সহিত অল্প সময়ের মধ্যে অকাট্য বন্ধুতা জন্মে, কিন্তু যতই অভ্যন্তর জানা যায় ততই বন্ধুতা হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু অন্নপূর্ণার সঙ্গে অনেকের সহসা বন্ধুতা জন্মিয়া অন্তর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার পরে তাহা আরও ঘনিষ্টতর হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার সহিত দর্শনে প্রথম ২ বিশেষ ঘনিষ্টতার কারণ দেখিতে পান নাই, তাঁহারাও অধিক দিন যাতায়াতের পরে তাঁহাব একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহার বন্ধুতা, নর, নারী, বালক, বালিকা, বৃদ্ধ ও যুবতী, সকল বয়সের মধ্যেই বিশেষ রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। অনেক পরিবারের প্রসবের সময় তিনি উপস্থিত হইয়া সুনিয়মে ধাত্রীর কার্য্য ও পরিচারিকার কার্য্য পর্য্যন্ত সম্পন্ন করাতে অনেক মহিলার বিশেষ আদরের ও ভক্তির পাত্রী হইয়াছিলেন। তিনি একবার মাত্র ধাত্রী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতেই প্রসব সম্বন্ধে আবশ্যকীয় জ্ঞান সুন্দররূপে জন্মিয়াছিল। প্রসবের পরে, ও গর্ভাবস্থায় অনেক রমণী সাদরে তাঁহার পরামর্শ

গ্রহণ করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন।

তিনি একবার মাত্র সংক্ষেপে শারীরিকতত্ত্ব পাঠ করিয়াছিলেন, এবং সময় ২ আমার নিকট রোগীর অবস্থা চিকিৎসাতত্ত্ব শুনিতেন। নিজের গৃহে সরল চিকিৎসা এবং বন্ধুদিগের পীড়ার অবস্থা দেখিতে গেলে তাহাদিগের রোগের অবস্থা ও চিকিৎসা এমন অভিনিবেশ পূর্ব্বক জানিতেন যে, সাধারণতঃ কোন রোগের বিষয় উপস্থিত হইলে, তাহাতে কিরূপ সাবধানতা লইতে হয়, কিরূপ করিয়া সুচিকিৎসা হয়, তাহা সুন্দররূপ বলিতে পারিতেন। এই জন্য তাঁহার ডাক্তার বন্ধুগণ তাঁহার বাটীতে কোন রোগী দেখিতে গেলে তাঁহার সহিত রোগের অবস্থা ও ঔষধের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাপ করিয়া বিশেষ সুখানুভব করিতেন; তাঁহার অভিজ্ঞতা দেখিয়া সময় সময় বিস্তর প্রশংসা করিতেন। বস্তুতঃ যে সকল বিষয় তিনি একবার দর্শন কি শ্রবণ করিতেন, তাহাই তাঁহার হৃদয়ে প্রস্তররেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া থাকিত; এবং তাঁহার আশ্চর্য্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে এক গুণ শিক্ষা সহস্র গুণ কার্য্যকরী হইত। তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে শিক্ষা দিয়া অতীব পরিতোষ লাভ করিতেন। অনেকের মুখে শুনা যায় যে স্ত্রীলোক দিগকে শিক্ষা দেওয়া বড় কষ্টকর ব্যাপার কিন্তু অন্নপূর্ণাকে শিক্ষা দিয়া অনেকেই গৌরব বোধ করিতেন। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের প্রশংসা লোকপরম্পরায় স্বদেশে বিদেশে অনেক সহৃদয় বন্ধুদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অন্নপূর্ণা আশাতীত রূপে জন সমাজে আদৃত হইয়াছেন। একবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের

অধ্যক্ষ সভায় তাঁহাকে নিয়োগ করিবার সময়ে বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে কতিপয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু তাঁহার সম্বন্ধে এত উচ্চ ভাব সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সমস্ত উপস্থিত সভ্যগণ আহ্লাদের সহিত একবাক্যে তাঁহাকে অধ্যক্ষ সভার সভ্য করেন। তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া বিদেশীয় সভ্যগণের তুলনায় মন্দ কাজ করিয়াছেন বলিয়া কেহ বোধ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মহীয়সী শক্তির প্রভাবে মোহিত হইয়া একবার একজন সুপরিচিত শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার মহৎ চরিত্র সমালোচনায় তাঁহাকে এত উচ্চতর সোপানে স্থান দান করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি লজ্জিতা হইয়াছিলেন। লেখক একস্থানে লিখিয়াছেন যে তাঁহাকে না দেখিয়া আমি নারীচরিত্রের মহোচ্চ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতাম না। এইরূপ প্রশংসা অবশ্য তাঁহার শক্তি অপেক্ষা ও অধিক মনে করিতাম। তবে যাঁহারা তাহার জীবনের মূলে বিশেষ শক্তি দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহারা সেই অস্ফুট কবিত্বময় জীবনের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করিয়া থাকিবেন। আমার তত অন্তরদৃষ্টি নাই বলিয়া হয়তঃ অতিরঞ্জিত বলিয়া বুঝিয়াছি।

অন্নপূর্ণা নানা প্রকার শিল্প কার্য্যে প্রবেশ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই শিল্পকৌশল এমন চতুরতার সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেন যে তাঁহার শিল্পকার্য্যের শিক্ষয়িত্রীগণকে আর দ্বিতীয় বার তাঁহার জন্য প্রয়াস পাইতে হয় নাই; যত দিন পর্য্যন্ত শিক্ষয়িত্রীর সঞ্চিত শিক্ষা সমগ্র শেষ না হইত ততদিন পর্য্যন্ত এমন মনোযোগের সহিত শিক্ষা করিতেন যে কোন শিক্ষয়িত্রীই তাঁহাকে আর অধিক দিন শিক্ষা দিতে পারগ হন নাই। ইহার পরে নিজ

প্রতিভাবলে নানা প্রকার নূতন নূতন শিল্পের আবিষ্কার করিয়া শিক্ষয়িত্রীদিগের নিকট বিশেষরূপে প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার শিল্প কার্য্য এমন সুপরিস্কৃত ও সুচিক্কণ হইত যে তাহা দেখিয়া তিনি অনেকের নিকট পুরস্কৃত হইতেন।

কোন সময়ে তাহার শিল্প বিষয়ক প্রতিভা পরীক্ষা করিবার জন্ত কোন একটি শিল্পকার্য্যের আদর্শ দিয়া, বলিয়াছিলেন, কেহ আমাকে শীঘ্র অনুগ্রহ করিয়া ইহার প্রতিরূপ আর একটি নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। অন্নপূর্ণা তৎপূর্ব্বে কলের এরূপ শিল্পকার্য্য দেখেন নাই। কিন্তু উহা দেখিবা মাত্র বলিলেন, ইহা কলে নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি চেষ্টা করিয়া দেখিব হাতে ঐরূপ হইতে পারে কি না। ইহার কয়েক দিন পরে অন্নপূর্ণা অবিকল ঐরূপ একটী আদর্শ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়াতে প্রোক্ত ব্যক্তি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আমরা অনেক সময় তাঁহাকে ঐরূপ নানা প্রকার চিত্র দর্শনে শিল্প রচনা করিতে দেখিয়াছি।

একবার আমরা কয়েক জন একত্র হইয়া কোন একটী নূতন বিষয় লইয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। এক ঘণ্টা কাল লেখার পরে সমস্ত লেখাই পাঠ হইত। অন্নপূর্ণার এই প্রথম প্রবন্ধ লেখা। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধ গুলিতে সকলের অপেক্ষায় এমন মধুর মধুর সরল ভাব সকল প্রকাশিত হইত যে তাহা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেই সমধিক আনন্দিত হইতেন। এবং রীতিমত প্রবন্ধ লিখা অভ্যাস করিলে কালে তিনি যে একজন সুলেখিকা বলিয়া পরিগণিত হইবেন অনেকেই ইহা আশা করিয়াছিলেন।

এইবারে অন্নপূর্ণা সতর দিনে সতরটী প্রবন্ধ লিখেন। কিন্তু

দুঃখের বিষয় এই যে অনবধানতায় তাহা সমস্ত খোয়া গিয়াছে। ইহার পর মধ্যে ২ উৎসবে এক একটী করিয়া তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। তাহাতে উপস্থিত ব্যক্তিগণ অনেকেই মুগ্ধ হইতেন। সমস্ত প্রবন্ধের প্রথম প্রবন্ধটী তাঁহার কোন একটী সুশিক্ষিত অনুরাগী বন্ধুর যত্নে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হওয়ায় অনেকে তাঁহার প্রবন্ধ সমূহ মুদ্রিত করার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেন। সেই হইতে তাঁহার প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্য পত্রিকায় মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা দ্বারায় তিনি সুশিক্ষিত লোকের নিকট পরিচিতা ও আদৃতা হন। ইহার পরে আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় আরম্ভ হইলে তিনি প্রায় চল্লিশটী প্রবন্ধ তাহাতে দেন ঐ সময়ে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠে উপস্থিত সভ্যগণ ও ছাত্রবৃন্দ তাঁহার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন। আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের অধিবেশন কালে তাঁহার ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা শ্রবণে, তাঁহার মহতী শক্তির পরিচয় পাইয়া, অনেকেই অন্তরের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। কঠিন কঠিন গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি সুন্দররূপ তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করতঃ অনেকের গ্রন্থালোচনার পথ প্রদর্শিকা হইয়াছেন। তাঁহার রচনা, ব্যাখ্যা ও উপাসনা শ্রবণ করিয়া অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে আলাপাদি করিয়া তাঁহার সুচিন্তাপ্রসূত উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকা সময়ে, যে কোন সাহিত্যানুরাগী ও স্ত্রীশিক্ষানুরাগী সুশিক্ষিত লোক বগুড়া আগমন করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

অন্নপূর্ণার আশ্চর্য্য মনস্বিতার কথা শুনিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ব্যক্তিগণের মধ্যেও কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে কঠিনতর প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া কৌশলে তাঁহার পরীক্ষা করত বিরোধী ভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সুশিক্ষা, চিন্তা ও সুব্যবহারের অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিলে বিদ্যালয়ের কার্য্যে সকলেই বিশেষ উৎসাহী হইতেন এবং তাঁহার সাহায্যে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনে বিশেষ জমাট বাঁধিত। তিনি উপাসনা করিলে অনেকেই ভক্তির সহিত তাহাতে যোগ দান করিয়া বিশেষ কিছু লাভ হইল বলিয়া বোধ করিতেন। তাঁহার সহিত আলাপী নরনারিগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সদ্ভাবের ও উচ্চতর জ্ঞানের এবং প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন।

অন্নপূর্ণা, শৈশব হইতেই বিলাসিতার পরম শত্রু ছিলেন; জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বিষয় তৃষ্ণায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন সকল প্রকার আভরণ ও অর্থপিপাসা ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র পর-ব্রহ্মের আরাধনায় অবিরত চেষ্টা করিয়া তাঁহার গৃহ উপাসনার আলয় করিয়াছিলেন। দাস দাসীগণ তাঁহার বিনীত ব্যবহারে চির দিন তাঁহাকে ভক্তির সঙ্গে সাহায্য করিত ও আপন আপন অভাব প্রকাশ করিয়া তাহা পূরণ করিয়া লইত।

অন্নপূর্ণা, দীন, দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিদিগের অভাব দেখিলে, তাহাদিগের দুঃখ মোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ক্ষুধাতুর কোন দরিদ্র তাঁহার গৃহ হইতে আহার না করিয়া কখনও ফিরিয়া যায় নাই। অতিথি ও অভ্যাগতগণের প্রতি তিনি এমন

অমায়িক ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার সেবা সুশ্রুষায় অনেকের হৃদয়ে তিনি আদর্শ নারীরূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছেন। নূতন অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মভাব ও চরিত্র তিনি ক্ষণকালের মধ্যে এমন বুঝিতে পারিতেন যে বহু দিন একত্র বাসেও আমরা তদ্রুপ চিনিতে সক্ষম হই না। নূতন কোন লোকের সহিত আলাপ হইলে নির্জ্জনে আমাকে তৎবিষয়ক এমত সকল কথা বলিতেন যে আমি ক্রমে ক্রমে সেই সকল লোকের ঠিক তদ্রূপ ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। বস্তুতঃ অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার সমধিক প্রখরা ছিল। তিনি কাহার মন্দভাব দেখিয়াও তাহার প্রতি অবিনয় কিম্বা অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করেন নাই। এই জন্য তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয় যে, তিনি গৃহে থাকিয়াও লৌকিক সকল প্রকার সৌজন্যের আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধুর ও অমায়িক ব্যবহারে কেহই তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি এত লোকের সঙ্গে মিশিয়া, নানাবিধ তর্ক ও আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াও, এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন যে, কেহ তাঁহার বিদ্বেষী কি শত্রু আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

(তিনি অল্প বয়স হইতেই সন্তান প্রসব করিতে আরম্ভ করেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তদ্ধেতু অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন; কিন্তু কখন তাঁহাকে সে জন্য উগ্র কিম্বা মলিনভাবাপন্ন হইতে দেখা যায় নাই। নানা প্রকারে সন্তানদিগের প্রতিপালনে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন; কিন্তু কখনও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি কি বিশেষ বিরক্তি ভাব প্রকাশ

পায় নাই। তাঁহার নিকট কন্যা পুত্রের কোন পার্থক্য ভাব ছিলনা। তাঁহার কোমল ব্যবহারে অনেক সময় সন্তানগণ তাঁহার অবাধ্য হইয়াছে তথাপি তিনি তাহাদিগকে কঠিনতর শাসন করেন নাই। তিনি সাধ্যমত সন্তানদিগের শৈশব হইতে শিক্ষা দান করিতেন এবং বাগানে সন্তানদিগকে লইয়া পৃথক্ ভাবে উপাসনা করিতেন। সন্তানদিগকে গৃহকার্য্য ও পাকাদি শিক্ষা দিতেন। তিনি পাক কার্য্যে বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। নানা প্রকার সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া অনেক বন্ধু বান্ধবকে সাদরে আহার করাইয়াছেন।

তাঁহার দত্ত আহার আস্বাদন করিয়া অনেকেই অপরিমেয় সুখলাভ করিয়াছেন, এবং এই জন্য তিনি অনেকের হৃদয়ে বিশেষ রূপে চিহ্নিত হইয়াছেন। রোগের সময় তাঁহার শুশ্রূষায় অনেকেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছেন। তাঁহার প্রসন্ন মূর্ত্তি, ও সুমধুর ব্যবহারে, অনেকে রোগ, শোক, যন্ত্রণা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতেন বাস্তবিক তাঁহার দর্শনে অনেকে পুলকিত হইতেন। যে গৃহে তিনি গমন করিতেন, সেই গৃহের নরনারী সকলেই তাঁহাকে সাদরে শ্রদ্ধাসহকারে অভ্যর্থনা করিতেন। তাঁহার পরিচিত নারীগণ যখন যে কোন সুখ দুঃখে পতিত হইতেন, তাঁহাকে তাহার অংশী না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজের, তাঁহার সন্তানের কিম্বা দাসীর কোন পীড়া কি দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে, অনেকেই মনোবেদনার সহিত সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতেন, ও তাহার অপনোদনের জন্য যথোচিত সাহায্য করিতেন। অনেক যুবক তাঁহার গৃহে আসিয়া এমন ভাবে ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছেন যে তাঁহাকে সীতা

সাবিত্রী কি দময়ন্তীর ন্যায় প্রতিভান্বিতা দেখিয়া, ধর্ম্ম শিক্ষায় জীবন লাভ করিয়া, চিরদিনের তরে তাঁহাকে ধর্ম্মমাতারূপে স্মৃতিপটে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন।

অন্নপূর্ণা ঈশ্বর দত্ত বিশেষ প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ সেই প্রতিভা তাঁহাকে নানা প্রকারে উচ্চতর মহৎ জীবনের উচ্চতর সোপানে উত্থিত করিয়াছিল। বালিকাকাল হইতে সমবয়স্ক ও গুরুজনদিগের বাক্যানুরূপ জীবন গঠন করিতে একান্ত যত্নবতী ছিলেন বলিয়াই, আমি প্রথম দর্শনে তাঁহাকে যে সকল কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে তাহা সুখাবহ হইবে বলিয়া অনবরত পালন করিয়া আসিতেছিলেন। উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু উপদেশানুরূপ কার্য্য করা কঠিন। অনেককে তাহাতে অপারগ হইতে দেখা যায়।

অন্নপূর্ণা উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা উপদেশ গ্রহণে ও তৎপ্রতিপালনে বিশেষ যত্নবতী ছিলেন। প্রথম হইতে দশ বৎসর কাল স্বামির সদুপদেশানুরূপ জীবন পরিচালনে তিনি এমত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপদেষ্টা স্বামীকে তাঁহার পরবর্ত্তী সমস্ত জীবনের দ্বারায় নানা প্রকার শিক্ষা দান করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইলে, কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি এমন আশ্চর্য্য প্রতিভা দ্বারায় স্বামির দোষ গুলি দেখাইতে সমর্থ হইতেন যে, স্বামী অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। তিনি যে সকল লোকের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, উন্নত জীবন আরম্ভের পরে, তাঁহাদিগকে অশেষ প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন।

প্রথমেই বিশ্বস্ত শিষ্যের কার্য্য করিয়া পরিণামে উৎকৃষ্ট গুরুর স্থানে উৎকৃষ্টতর অভিনয় দেখাইয়া একটী আশ্চর্য্য জীবন গঠনের উৎকৃষ্ট পথ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। সে পথে তাঁহার ন্যায় ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা সহকারে বিনীত ভাবে চলিলে সত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রই উন্নত হইতে পারেন।

অন্নপূর্ণার জীবনের একবিন্দু ধর্ম্মাগ্নি এমত জ্যোতি বিকাশ করিয়াছিল যে তাঁহাকে যখন যে দেখিয়াছে অন্নপূর্ণা তাহা-কেই আপনার ধর্ম্মভাব প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অন্নপূর্ণার ক্ষুদ্র জীবনের অগ্নি প্রতি জীবনের সহিত মিলিত হইয়া এমত আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছিল যে, কালে তাহার প্রভাবে অনেকের হৃদয়ের নির্ব্বাণ প্রায় ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া অন্নপূর্ণার আত্মার অশেষ বৈচিত্র প্রকাশ করত তাঁহাকে অমর করিয়া গিয়াছে। তিনি যেখানে যে ধর্ম্মভাব টুকু পাইয়াছেন, কৃপণের ধনের ন্যায় তাহা যত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ বহুদিন তাঁহার পরিচিত নর নারীগণের ধর্ম্মভাব সঞ্চিত হইয়া তাঁহার জীবন আলোকময় করিয়াছিল তিনি কপটভাব কি কুটিল বর্ত্ম কখনও আশ্রয় করেন নাই। এই জন্য সকলে হৃদয় খুলিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিয়াছেন ও সুখী হইয়াছেন।

অন্নপূর্ণা, ধর্ম্মপরিব্রাজক, উদাসীন, সন্ন্যাসী, ফকির, ভৈরব, ভৈরবী, বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীদিগকে সাদরে গৃহে স্থান দিয়াছেন ও ভক্তিপূর্ণ ভাবে তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া অশেষ প্রকারে প্রেম ভক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহারা ও তাঁহার মধুর সরল ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। কোন কোন সংসার বিরাগী

কুচরিত্র নর নারী তাঁহার ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া দুর্ম্মতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুপথ আশ্রয় করিয়া, ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি সাধন করত, তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

তিনি প্রথম জীবনে হিন্দুললনাদিগের উচ্চতম পতি-ভক্তির আদর্শ গ্রহণ করিয়া স্বামির ঘোরতর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াও স্থির ভাবে আত্মসংযম করিয়া, পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বামির ব্যারামে অশেষ প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আশ্চর্য্য সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছেন। স্বামী অপেক্ষা সহস্র গুণে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান, ধর্ম্ম ও লোকব্যবহারে উন্নত হইয়াও, স্বামির নিকট এমন দীন হীনের মত ব্যবহার করিয়াছেন যে স্বামীর হৃদয়ে কোন প্রকার বেদনার লেশ মাত্র আইসে নাই। স্বামী ব্যতীত ও অনেক সদাশয় ব্যক্তির হৃদয়ে তাঁহার এই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণের চিত্র মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি এত উৎকৃষ্ট জ্ঞানে অভিষিক্ত হইয়াও আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া জানিতেন। এই জন্য তাঁহার শিশু সন্তান দিগের মহৎভাব ও চাকর চাকরাণী দিগের সুপরামর্শ সাদরে গ্রহণ করিয়া; এক আশ্চর্য্য প্রেমের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবনের শেষ ৫। ৬ বৎসর বড় কন্যা সুশীলার অশেষ প্রকার সাহায্য পাইয়াছিলেন। এমন কি, বলিতে গেলে ৮। ৯ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সন্তান প্রতিপালনের ও সংসারের যাবতীয় কার্য্য কলাপের প্রধান ভার সুশীলার উপর ন্যস্ত করিয়া নিজে কেবল ধর্ম্ম সাধনে জীবন কাটাইয়াছেন। প্রথম হইতে অনেক বার শঙ্কট-রোগে আক্রান্ত হইয়া অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছেন। কিন্তু একটু সময়ের জন্যও ঈশ্বরে নির্ভর ও ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা

তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় নাই। অনেক বার ব্যারামের সময় উপাসনাদি, সঙ্গীত, ও সংকীর্ত্তনে এমত ডুবিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার তৎকালীন প্রফুল্লভাব দেখিয়া রোগী বলিয়া তাঁহাকে কেহ বুঝিতে পারেন নাই।

এখন হইতে আমরা তাঁহার জীবনালেক্ষ্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ব্যারাম কঠিনতর আকার ধারণ করিলে তাঁহাকে কোন ধর্ম্ম-বন্ধুর সহিত দারজিলিং কি কলিকাতা যাইয়া চিকিৎসিত হইবার জন্ত যোগেন্দ্র বাবুর দ্বারা অশেষ প্রকার বুঝান হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি সাতিশয় দৃঢ়তা সহকারে যোগেন্দ্র বাবুকে বুঝাইলেন যে, তিনি এসময়ে কোন প্রকারে স্বামী ও পুত্র কন্যা এবং চির-দিনের ধর্ম্ম বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায়ও যাইবেন না; সুতরাং তাঁহার স্থানান্তর গমনের আশায় নিরাশ হইয়া দূরস্থিত প্রিয়তম ধর্ম্মবন্ধুদিগকে আসিয়া দেখিবার জন্য ও বৈশাখের উৎসবে বিশেষ ভাবে যোগ দিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে পত্র লিখিতে লাগিলাম।

ইতি মধ্যে শ্রীমান্ মনোমোহন উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহার ধর্ম্মমাতা অন্নপূর্ণা দেবীর নিকট শান্তিলাভার্থ তাহার পত্নী শ্রীমতী সুনীতি সহকারে আমার গৃহে সমাগত হন। অন্নপূর্ণা এই গুরুতর পীড়ার সময়েও আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত, তাহাকে সদুপদেশ দিতেন ও তাহার সেবা শুশ্রূষার প্রতি এমত দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন যে, উশৃঙ্খলহৃদয় মনোমোহনও তাঁহার ভয়ে অনেক সময় প্রশান্ত ভাবধারণ করিত। বলিতে গেলে, তাহার

ধর্ম্মমাতার ধর্ম্মানুরাগই তাহার সেই দুশ্চিকিৎসনীয় রোগ হইতে সহজে অব্যাহতি পাওয়ার মূল কারণ।

এবার উৎসবের আয়োজন বিশেষ ভাবে আরম্ভ হইল। উৎসবের পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইবার জন্য দিবারাত্রি উপাসনা, আরাধনা, সংগীত ও সংকীর্ত্তনে বাড়ী সর্ব্বদা ধর্ম্মভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শ্রদ্ধেয় বন্ধু ভুবনমোহন কর, প্যারীলাল ঘোষ, জালান উদ্দিন মিঞা আসিয়া উৎসবে যোগদান করতঃ উৎসবের প্রবল তরঙ্গ উত্থাপন করিলেন; এদিকে বাবু যাদবচন্দ্র ব্রহ্মসন্তান, বনমালী ব্রহ্মদাস, কেদারেশ্বর সেন, নবকান্ত রায়, জানকী নাথ পোদ্দার ও তাঁহার পরিবার, আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী বন্ধুগণ, বিশেষরূপে উৎসবে যোগ দান করাতে উৎসবের বিশেষ মত্ততায় সকলের হৃদয় তোলপাড় হইতে আরম্ভ হইল।

বহুদিন পূর্ব্ব হইতে জনৈক নিমাই নামক সন্যাসী বিশেষভাবে গৃহে বাস করিতেছিলেন। উৎসবের প্রারম্ভে একটী ভক্ত ফকির আসিয়া যোগ দান করিলেন, সুতরাং নানা প্রকারেই উৎসবের তরঙ্গ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। প্রাতঃকাল হইতে বাড়ী বাড়ী যাইয়া উন্মত্ততার সহিত কীর্ত্তন হইতে লাগিল। মধ্যাহ্নে ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে, বৈকাল হইতে উপাসনা, বক্তৃতা, সংগীত, ও সংকীর্ত্তনে বাড়ীতে যেন যন্ত্রের ন্যায় প্রতি নিয়ত ধর্ম্ম প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। অন্নপূর্ণা এই সময় কেবল ডাবের জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে নব গৈরিক বসনে সুসজ্জিত করিয়া দেওয়াতে তাঁহার যোগিনী মূর্ত্তি আশ্চর্য্য ধর্ম্মপ্রভার সহিত মিশ্রিত হইয়া সকলের বিশেষ ভক্তি

আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় অনুপূর্ণার আশ্চর্য্য ধীর ধর্ম্ম ভাব দেখিয়া দর্শকেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। এই সময় এক ফকির উপস্থিত হইয়া বস্ত্র প্রার্থনা করায় তিনি তাহার সেই গৈরিক বস্ত্র প্রদান করিলেন। এবং নিজে শুভ্র নূতন ধবল বস্ত্র পরিধান করিয়া, অন্তরে ও বাহিরে উজ্জল জ্যোতি ধারণ করিয়া, অতি প্রতিভায় প্রভান্বিত হইয়া, পরম দেবতার আরাধনায় ও ধ্যান ধারণায়, দিন কর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এই সময় তাঁহার উন্মনা ধর্ম্মপুত্র মনোমোহন, তাহার মাতার প্রশান্ত ধর্ম্মের ভাবে মোহিত হইয়া গৈরিক পরিধান করিয়া প্রশান্ত ভাব ধারণ করতঃ উদাসীন ও বৈরাগ্য ভাবে দীক্ষিত হইলেন। উপস্থিত ভক্ত ফকির তুলসীদাসের একজন প্রধান শিষ্য। তিনি অন্নপূর্ণাদত্ত দুই খানা নূতন গৈরিক বস্ত্রের একখানা ফেরত দিয়া অন্য খানা দ্বারা ভক্তিপূর্ণ ভাবে আপন শরীর আবৃত করিয়া আশ্চর্য্য বিনয়ের নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন।

অন্যদিকে অপর সন্যাসী হরি সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া এক একবার অচৈতন্য হইয়া ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। আবার চেতনা পাইয়া হুহুঙ্কারে ঘোরতর উন্মত্ত হইয়া সংকীর্ত্তনে বিশেষরূপে জমাট বাঁধিলেন। অপর দিকে, ভুবন বাবুর সুমধুর ভক্তিপূর্ণ উপাসনা প্রার্থনা এবং সংগীত সকলকে এক একবার প্রশান্ত ও গম্ভীর করিতে লাগিল। অন্য সময় প্যারীলাল বাবুর চিন্তাপূর্ণ ও সারবান বক্তৃতায় সকলকে প্রোৎসাহিত করিয়া তুলিল। কখন মনোমোহনের কখন বা যোগেন্দ্র মুন্সীর প্রমত্ত বাউল সংগীত ও সংকীর্ত্তনে উপস্থিত লোকগণের বিশেষ মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। কখন যাদব বাবু, নব রায় তীর্থ বাবু ও

নিমাই সন্ন্যাসী প্রভৃতির প্রমত্ত বক্তৃতা, উপাসনা, সংঙ্গীত, সংকীর্ত্তনে, বাড়ীর বালক বালিকা পর্য্যন্ত নাচিতে ও গাইতে লাগিল। উদ্যানে সুশীলার ও সুনীতির ভক্তিপূর্ণ উপাসনা সুললিত সংঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনে, মধ্য আঙ্গিনায় ও উদ্যানে অবিরত ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস ও তরঙ্গে, সমস্ত গৃহ তরঙ্গায়িত হইল। উপস্থিত বন্ধুমণ্ডলী পর্য্যন্ত ভাবে মত্ত হইয়া উঠিলেন। এইরূপ ভাবে ১লা বৈশাখ হইতে ১০ই বৈশাখ পর্য্যন্ত উৎসব চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে আমার প্রমত্ত ভাব দেখিয়া পোলিশ সাহেব এক দিন ধরিয়া আমাকে জেলে দিলেন। আমি ২।৩ দিন পর্য্যন্ত অবিরত ভূমিতে শয়ন করিয়া ভক্তি পূর্ণভাবে ভগবানের নিকট দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ধ্যানের সময় জিজ্ঞাসা করিতাম যে, হে ঠাকুর! অন্নপূর্ণার অন্তিম অবস্থায় আমাকে জেলে পাঠাইয়া কেন এদুঃখ দিতেছ। আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া শীঘ্র তাঁহার নিকট লইয়া যাও।

এদিকে সেই সময়েই অন্নপূর্ণার অন্তিম কাল বুঝিতে পারিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীনাথ বাবু ডাক্তার সাহেবকে অনুরোধ করাতে তিনি সদয় হওয়ায় সেই রাত্রিতে প্রার্থনার পরে দেখি, ডাক্তার সাহেবের আদেশ মত আমাকে একজন অন্নপূর্ণার নিকট লইয়া গেল। আমি প্রথম যাইয়া দেখি যেন অন্নপূর্ণার শেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে। একবার ভগ্ন কণ্ঠে ডাকিলাম। এইবার ক্ষীণস্বরে অস্পষ্ট উত্তর করিলেন। চক্ষু মেলিয়া আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন ভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ এক মাত্রা ঔষধ স্বহস্তে সেবন করানের পর আমার সঙ্গে সুমিষ্ট আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন কি হারানিধি লাভ করিয়া মৃতদেহে

অমিত বল সঞ্চার হইল। কিছু কাল তাঁহার প্রশান্ত প্রফুল্ল মুখ কমল প্রস্ফুটিত হওয়ায় আমার ভয়ানক অন্তর্দাহের কথঞ্চিৎ শান্তি হইল। ক্ষণকাল পরে বিষাদের সহিত অন্নপূর্ণার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পুনরায় জেলগৃহে ভূতলে শয়ন করিলাম ও অবিরাম ধারায় বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করতঃ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিলাম যে, "তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া অন্নপূর্ণার অন্তিম সময়ে তাহার পার্শ্বে আমাকে রাখ, এবং তাহার সমাধি ও শ্রাদ্ধাদির পরে আমার পাপের শাস্তি দিতে পুনরায় প্রবৃত্ত হইও।" পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই শ্রদ্ধেয় ডাক্তার সাহেব সুমধুর স্নেহময় বাক্যে আমাকে মুক্তির আশা দিয়া ভক্তিভাজন মাজিষ্ট্রেট লী সাহেবের নিকট নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন এবং আমার মুক্তির জন্য তাঁহাকে অশেষ প্রকার অনুরোধ করিলেন। তিনি সদয় হইয়া স্নেহময় বাক্যে আমাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। আমি তৎকালে ডাক্তার সাহেব ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে প্রতি দিবস অন্নপূর্ণাকে দেখিবার জন্য ও আমার বিশেষ সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করাতে, তাঁহারা উভয়ে আহ্লাদ সহকারে সম্মত হইলেন। আমি মুক্ত হইয়া অন্নপূর্ণার নিকট আসিলে, অন্নপূর্ণার সেই ক্ষীণ দেহে আনন্দ লহরী খেলাইতে লাগিল। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন রোগ যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইয়া পড়িল। তৎকালে তাহার নির্ব্বাণ প্রায় দীপ পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া দুঃখ ভারাক্রান্ত বন্ধুদিগের অন্তরের যাতনাভার কথঞ্চিৎ অপসারিত করিল। ডাক্তার সাহেব ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া ও কিছু আশ্বাস পাইতে লাগিলেন। এই সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীমন্ত কবিরাজ, রাজেন্দ্র কবিরাজ, হরচন্দ্র

মজুমদার কবিরাজ, নন্দকুমার কবিরাজ, শ্রীমান্ বনমালী প্রভৃতি কবিরাজগণ সহৃদয়তার সহিত একত্র শান্তভাবে পরামর্শ পূর্ব্বক চিকিৎসায় সাহায্য দান করিতে লাগিলেন ও দুই জন করিয়া পালাক্রমে রাত্রি দিন রোগীর পার্শ্বে বসিয়া অবস্থা দর্শন করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে ভয়ানক জ্বরের বেগ প্রকাশ হইয়া সকল আশা নির্ম্মূল করিল। এমত সময় ডাক্তার সাহেব ও মাজি-ষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় হইবার কালে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি আজ রোগীর অবস্থা কেমন বোধ করিতেছেন?' আমি বলিলাম আজকার অবস্থা দেখিয়া আর জীবনের আশা করিতে পারি না। তাঁহারাও বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে আমার বাক্যের সমর্থন করিয়াই একেবারে বিদায় হইলেন। এই অবস্থায় সত্বরপদে সূর্য্য অস্তমিত হইল। পূর্ণচন্দ্র তৎসঙ্গে সঙ্গে যেন ধবল অমৃতময় কিরণ বিস্তার করিয়া অন্নপূর্ণার পর-লোক গমনের সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে সহৃদয় ধর্ম্ম বন্ধুগণ আসিয়া ঘর পূর্ণ করিলেন। সকলেই গম্ভীর ও নিস্তব্ধ ভাবে অন্নপূর্ণার পরলোক যাত্রার প্রতিক্ষায় অন্তরে তৎকল্যাণের জন্য বারংবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই দিবস প্রাতঃকাল হইতে অন্নপূর্ণা সাতিশয় কাতর হৃদয়ে আমাকে জানাইলেন যে, এক্ষণ হইতে ক্ষণকালের জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। আমি তাঁহার শয্যা পার্শ্বে বরাবর বসিয়া কাতর হৃদয়ে ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিতেছিলাম। হঠাৎ কার্য্যান্তরে গৃহ মধ্যে ৫।৬ হাত অন্তর যাওয়া মাত্র যেন অন্নপূর্ণা আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন

যে, "আমি তোমার অন্তরে আসিয়াছি। বিভিন্ন দেহ এই ক্ষণেই আমি পরিত্যাগ করিলাম।"

আমি তাঁহার এই অন্তর্ব্বাণী শুনিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ চকিত ভাবে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া ধীর ভাবে হার্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম; দেহে প্রাণের কোন লক্ষণ মাত্র নাই। তৎক্ষণাৎ আমি সকল বন্ধুগণকে জানাইলাম যে, এই মাত্র অন্নপূর্ণা পর-লোক গমন করিলেন।

বন্ধুবর প্যারীশঙ্কর বাবু তখন আমার বাক্যে সন্দিহান হইয়া ব্যগ্রভাবে পরীক্ষা করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলে আমি তাঁহাকে ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া ভক্তি পূর্ণভাবে তাঁহার আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিলাম ও উপস্থিত বন্ধুগণকে এক এক করিয়া তাঁহার হার্ট স্পর্শ করত প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়া, কিছু অন্তরে ধীর ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

প্যারীশঙ্কর বাবু তৎপর বিশেষ পরীক্ষা করিয়া আমার বাক্যেরই সমর্থন করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন। ইহার পরে শ্রীনাথ বাবু, যাদব বাবু, রাম বাবু, কেদার বাবু, প্রভৃতি বন্ধুগণ ক্রমান্বয়ে প্রার্থনা করতঃ অন্তিম সুহৃদের কার্য্য শেষ করিলেন।

সুশীলা ও সুধীর প্রার্থনা করিতে কান্দিয়া উঠিল, উপস্থিত বন্ধু-গণ তাহাদিগকে অশেষ প্রকার সান্ত্বনা করিলেন, এবং শ্রীনাথ বাবু ও রাম বাবু পরামর্শ করিয়া আমাকে এক মাত্রা হাইড্রেট্ অব ক্লোরাল পান করিতে দিলেন, এবং আমাকে শয়ন করিতে অনুরোধ করাতে, আমি শয়ন করিলাম। শ্রীনাথ বাবু ও রাম

বাবুকে আহার করিয়া পুনরায় আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আমি শয়ন করি। আমাদের পার্শ্বে শান্তি মূর্ত্তি রূপে গৃহের রক্ষক স্বরূপ হইয়া, দুই বন্ধুতে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করেন। প্রভাত হইতে না হইতে যোগেন্দ্র বাবু, চণ্ডী বাবু, প্রভৃতি বন্ধুগণ আসিয়া সমাধির উৎযোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মিউনিসিপালিটীর সভাপতি বাবু রজনীকান্ত মজুমদার ও কমিশনর মহোদয়গণ, সহৃদয়তা গুণে অন্নপূর্ণার সুখের বিচরণ স্থান, ভালবাসার পুষ্পোদ্যানে তাঁহাকে সমাধি দিতে অনুমতি করিলেন। শ্রীনাথ বাবু স্বীয় ব্যয়ে সমাধি পাকা করিয়া গাঁথিয়া দিলেন। বাবু কেশব নাথ রায় একটী সুন্দর শাল কাষ্ঠের বাক্স দেওয়াতে সে সময়ের সমাধির কোন প্রকার অভাবই হইল না। রজনীতে শ্রীনাথ বাবু, যাদব বাবু, কেদার বাবু, চণ্ডী বাবু, ও মুন্সী বাহার উদ্দীন মিঞার যত্নে, সমাধি কার্য্য শেষ হইল। সন্তানগণ ও বন্ধুগণ উদ্যানস্থ নানাবিধ পুষ্প-গুচ্ছ অন্নপূর্ণার মৃতদেহোপরি ভক্তি পূর্ব্বক প্রদান করার পরে সমাধি ইট দ্বারা পাকা করিয়া গাঁথিয়া দেওয়া হইল।

এইরূপে তাঁহার জীবনে শেষ কার্য্য সমাধা করিয়া আমি একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলাম। সে সময়ে বগুড়াস্থ বন্ধুগণ বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক সন্তানগণের প্রতিপালনের ভার লইলেন। ইহার পরে কোন কোন বন্ধুদিগের শ্রদ্ধাপূর্ণ দানে, এবং গৃহের দুই একটি জিনিস বিক্রয় করিয়া, দশ বার দিন পরে চাউল, আলু, পটল, নূতন সরা, মসলা দিয়াসলাই ও নগদ পয়সা প্রভৃতি এক দিন বিতরণ করা হইল; এবং আর এক দিন লুচি ও নানা প্রকার মিষ্টান্ন দরিদ্র দিগকে বিতরণ করা হইল। এই

শ্রাদ্ধে উপাসনা কীর্ত্তনাদি কেবল আমার দ্বারাই সম্পন্ন হইল। দরিদ্রদিগের বিতরণ কার্য্যে সমস্ত বন্ধুবান্ধবগণই বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসন্ন বাবু আসিয়া শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে উন্মত্ততা হেতু আমাকে জেলে দেওয়া হয়। এবং সন্তানগণের প্রতিপালনের ভার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করত তাহাদিগকে কলিকাতায় লইয়া রাখেন। কিয়ৎ দিন বগুড়া জেলায় বাস করার পরে গবর্ণমেণ্টের আদেশে আমাকে বহরমপুর লিউনেটিক এসাইলামে পাঠান হয়। ক্রমাগত দুই বৎসর বহু কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করার পরে পরম দয়ালু পরমেশ্বরের কৃপায়, দুরন্ত উন্মাদরোগের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়া বগুড়ার বন্ধুবান্ধবদিগের বিশেষ সাহায্যে, কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় বগুড়ায় আসিলাম। এবং কলিকাতায় গমন করিয়া তথাকার বন্ধুদিগের সহিত দেখা করিয়া সন্তানাদিসহ বগুড়া আগমন করত পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম।

এই সময় বগুড়াস্থ বন্ধুগণের আশ্চর্য্য সহানুভূতিতে আমি সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া পুনরায় অন্নপূর্ণার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ এই অন্নপূর্ণাচরিত, এই দরিদ্র দুঃখীর হৃদয়ের উপহার স্বরূপ সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিলাম। এই সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত দেখিয়া যাঁহারা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ করিবেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, দরিদ্র সামান্য রত্ন পাইলেও অমূল্য নিধি বলিয়া জ্ঞান করে। আমার ন্যায় অজ্ঞানী ও মূর্খের পক্ষে অন্নপূর্ণা সেইরূপ অমূল্য বস্তু বলিয়া পূজিতা

হইয়াছিলেন। আমার দ্বারায়, তাঁহার জীবনের প্রকৃত ভাব প্রকাশ হওয়া অসম্ভব জ্ঞানে কেবল তদীয় জীবনের আভাস মাত্র গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করুন।

অপর যাঁহারা মনে করিবেন যে, অন্নপূর্ণার নির্ম্মল জীবনের ইতিবৃত্ত লিখিতে গিয়া, আমি কতক গুলি অসার বাক্যদ্বারা তাঁহার প্রকৃত জীবনালোক প্রকাশের অন্তরায় হইয়াছি, তাঁহাদের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, আমি তাঁহাদের ন্যায় ভাবগ্রাহী নহি। আমার লিখিবার কোন শক্তি নাই। এই জন্য আমি তাঁহাদিগের অভিপ্সিত অন্নপূর্ণার জীবন চরিত প্রকাশে অসমর্থ বলিয়া সামান্য ভাবে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ও তাঁহার সন্তানগণের ভবিষ্যৎ জীবনের অবগতির জন্য ইহা মুদ্রিত হইল মাত্র।

অন্নপূর্ণার বন্ধুগণ।

প্রথম বন্ধু শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ। ইনি বিশেষ সাহায্য না করিলে অন্নপূর্ণার শিক্ষার মূলবীজই স্থাপিত হইতে পারিত না; কারণ গোপনে শিক্ষা দেওয়া খুব ভালবাসা ব্যতীত সম্ভবে না, কারণ সে জন্ম সম্ভবতঃ কাব্যতীর্থকেও শৈশবে নানা প্রকার ভৎ‍র্সনা সহ্য করিতে হইয়াছে। তিনি বালক হইয়া অন্নপূর্ণার হৃদয়ে যে শিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন সেই বীজের পরিপক্কতা গুণে, কালে তাঁহার স্বকীয় জীবনের শক্তি বলে, ও ঘটনা পরম্পরাগত নানা প্রকার বন্ধুগণের সাহায্যক্রমে, সেই বীজ বিকশিত হইয়া তদীয় জীবনের মধ্যে শিক্ষারূপ বৃক্ষ বহু শাখা পল্লবে ও ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়াছিল। মহেন্দ্র বাবু শিশুকালে জানিতে পারেন নাই যে তিনি যৌবনে কাব্য-তীর্থরূপ ভূষণে অলঙ্কৃত হইতে পারিবেন। আবার তিনি যখন অন্নপূর্ণাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাতেও তখন জানিতে পারেন নাই যে, সেই শিক্ষার বীজে কালে তাহার হৃদয়-উদ্যানে এমত সুরঞ্জিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। কিন্তু যিনি নিষ্কাম ভালবাসার মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিবেন তিনি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবেন যে, তাহার অভ্যন্তরে ঐশী শক্তি কার্য্য করিতেছে। আর অন্নপূর্ণা শৈশবে যে নানা বিঘ্ন বাধার মধ্যেও হৃদয়ের অদম্য

পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া শিক্ষা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই কালে রস সংগ্রহ হইয়া তাঁহার জীবনে শিক্ষাবৃক্ষ এত বলবান্ হইয়া নানা শাখা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া গিয়াছে। ইহার মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেও আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাইব যে, আত্মার স্বাভাবিক স্ফূরণ ঈশ্বরের আনুগত্য দ্বারা সংঘটন হয়। সেই জন্য উত্তরোত্তর শিক্ষার অনুকূল ঘটনা সকল তাঁহার জীবনে সংঘটন হইয়াছিল। যে জীবনে যাহার আনুগত্যের অভাব যে পরিমাণে দেখা যাইবে, সেই জীবনে প্রতিকূল ঘটনা সকলও প্রবাহিত হইয়া তাহার জীবনের দ্বারে অর্গল দিয়া উন্নতি আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। অন্নপূর্ণার জ্ঞান বিকাশের পরে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে অন্নপূর্ণাঘটিত যে আলাপ হইয়াছে তাহাতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি তাহার এই রূপ উন্নতি দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মভাবই যে উন্নতির মূল কারণ, উপাসনাই যে জীবনের একমাত্র ব্রত নিষ্কামকর্ম্মই যে তাহার জীবনের আদর্শ, ইহা তাঁহার সাংসারিক কার্য্যে বীত স্নেহ, শারীরিক সুখাভিলাষে বিমুখতা, দীনতা, কৃতজ্ঞতা ও শুদ্ধচরিত্রের দ্বারায় প্রমাণিত হইতেছে। সম্ভবত তাঁহার উন্নতি এক অলৌকিক বৈদ্যুতিক জ্যোতির দ্বারা সংঘটন হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার এতাদৃশ উন্নতি দেখিয়া তিনি অবশ্য আশান্বিত হইয়াছিলেন যে অন্নপূর্ণার আদর্শ জীবন তাহাদের গ্রামে গৌরব স্বরূপ। কিন্তু তাঁহা অকালে বৃন্তচ্যুত হওয়াতে অবশ্য তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছেন এবং তাঁহার বিরহ জন্য তাঁহার হৃদয়ে অশেষ যন্ত্রণাও উপস্থিত হইয়া থাকিবেক কারণ স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ মহাঝড়ে উন্মূলিত

হইলেও রোপণ কর্ত্তার দুঃখের ইতর বিশেষ হয় না, কাব্যতীর্থ মহাশয়ের স্বহস্তে লিখিত মন্তব্যই অন্নপূর্ণার বাল্যকালের মূল শক্তির পরিচয় দান করিবে।

(অন্নপূর্ণার বাল্যকালের প্রিয়তমা সখী শ্রীযুক্তা অনন্তময়ী তাঁহাকে যে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাহা কেবল তাঁহার বাল্যকালের গুণের পরিচয় পাইয়াই বলিতে হইবে। অন্নপূর্ণা তাহাকে বুঝাইতেন যে, বিবাহ একটী ধর্ম্মবন্ধনের অকাট্য সূত্র। তাহা স্বামী, স্ত্রী, উভয়কে সমান রাখিবার পরিমাপক যন্ত্র। কেহ কাহাকে অতিক্রম না করিয়া চলিতে পারে, এজন্য উভয়ের মধ্যে ঈশ্বরকে মধ্যবিন্দু করিয়া সংসারে সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলাই জীবনের উদ্দেশ্য। অনন্তময়ী এজন্য অন্নপূর্ণাকে সংসারের অনুপ-যুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, কারণ তিনি স্বামীর নিকট কেবল বিদ্যা ও ধর্ম্মই প্রার্থনা করেন। অর্থ, সাংসারিক সুখ, কি শারীরিক সুখের বিষয়ে তিনি অন্ধ। অনন্তময়ীর পিতা শ্রদ্ধেয় হরিমোহন গোস্বামী মহাশয়, ভক্তিভাজন বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের একজন ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন। হরিমোহন বাবু কন্যাকে ধর্ম্ম ও বিদ্যায় উন্নত দেখিতে ইচ্ছা করিতেন, কিন্তু অনন্তময়ীর সেই বিষয়ের বড় অভাব ছিল। তিনি সাংসারিক সুখের ও সম্মানের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার পিতা যদিও ব্রাহ্মধর্ম্মবিশ্বাসী উচ্চকুলোদ্ভব ইংরাজী শিক্ষিত বরের নিকট তাহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি পতির উপযুক্ত সেবা করিতে না পারিয়া সকল প্রকার সম্মান হইতে বিতাড়িত হইয়া সকলের স্নেহ মমতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অতি ক্লেশকর জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহন করিয়া দুঃখে দিন যামিনী কাটাইতেছেন। তিনি পতি

কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার পরে বাল্যসখী অনুপূর্ণাকে বিনয় পূর্ব্বক যে আত্ম জীবনী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে অবশিষ্ট জীবন, ধর্ম্ম পথে কাটাইবেন বলিয়া তাঁহার নিকট থাকিবার জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে অনুপূর্ণা বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মের একান্ত পক্ষ পাতিনী ছিলেন। ধর্ম্মই মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। জীবন রক্ষার জন্য কেবল মাত্র যে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় ও সাংসারিক কার্য্য করিতে হয় তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। যাহারা কেবল সংসার লইয়া থাকে ও শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যাকুল, তাহারা জীবনদাতা ঈশ্বরকেই ভুলিয়া যায়; সুতরাং তাহাদের জীবন এ সংসারে বিড়ম্বনা মাত্র, এইজন্য অনন্তময়ীর সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বলিতেন যে তাহার পরিণাম অতি ক্লেশ জনক হইবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছে তিনি এখন পতি পুত্র ও আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বেনারসে ছদ্মবেশে অপরিণাম দর্শীর ন্যায় জীবনের ক্লেশ ভার বহন করিতেছেন। তিনি যখন নিরুপায় হইয়া অনুপূর্ণার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তখন অনুপূর্ণা তাহাকে কিছু অর্থ পাঠাইয়া দেন। এবং লেখেন যে “যদিও তোমাকে পতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি আমি তোমার পতির নিকট আমার স্বামীর দ্বারা জানাইব যে তিনি তোমাকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন কি না, অথবা আমার নিকট রাখিতে অনুমতি দেন কি না। তুমি এইক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ করিয়া মাতার নিকট থাকিবে। আমি অর্থ দ্বারাও সর্ব্বতো প্রকারে তোমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। যদিও অনন্তময়ী তাহার শেষ এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া বিপথগামিনী

হইয়াছিলেন, তথাপি অন্নপূর্ণা তাহার সমস্ত দোষ বিস্মৃত হইয়াও তাহার নানা প্রকার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাহাকে রাখিতে গেলে লোকের নিকট অশেষ প্রকার নিন্দাভাগিনী হইতে হইবে, তিনি জানিতেন; তথাপি বাল্য জীবনের অকাট্য বন্ধুতা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি বন্ধুতার যে সূত্র ধরিয়া তাহাকে আগ্রহের সহিত রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা বন্ধুতা পরীক্ষার উচ্চ আদর্শ। যেহেতু যে সময়ে তিনি, ধনে, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও ধর্ম্মজ্ঞানে সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বাল্যসখী অনন্তময়ী সংসারের পক্ষে ও ধর্ম্মের দৃষ্টিতে কাঙ্গালিনী ও ঘৃণার পাত্রী বলিয়া লোকের নিকট নিতান্ত হীনতার পরিচয় দিতেছিলেন; এমতাবস্থায়ও তিনি তাহাকে কোন প্রকার ঘৃণা করেন নাই ও তাহার জীবনের দুঃখের অবস্থার জন্য তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং তাহাকে নিকটে আনিয়া পবিত্র জীবনোপায়ের গতি করিবার জন্য আন্তরিক অশেষ প্রকার যত্ন করিয়াছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অনন্তময়ীর আর কোন উত্তরই তিনি পান নাই। এস্থানে পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন যে অন্নপূর্ণা সৌহার্দ্যসূত্রের একটী সূত্র ও বাল্যকালে ছেদন করেন নাই। সৌহার্দ্যের মূল সূত্র যে নিষ্কাম ভালবাসা, তাহার নিদর্শন তাঁহার জীবনের প্রতি পত্রাঙ্কে দেখিতে পাইবেন। ঈশ্বর এক মাত্র পরম সুহৃদ, তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে যাওয়াই মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। পরিচিত সকল বন্ধু বান্ধবকেই সেই পথে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করা মনুষ্যের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার একটী চিহ্ন। অবস্থার তারতম্য না করিয়া

তিনি প্রকৃত সখ্যতার মূলসূত্র বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করা যায়। অন্নপূর্ণার বাল্যকাল হইতে পরলোক গমনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যত লোকের সঙ্গে বন্ধুতা জন্মিয়াছে তাহাতে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে সংসারের চক্ষে যাঁহারা ধনে, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে বর্ত্তমান সময়ে উচ্চতম সোপানে উত্থিত হইয়াছেন তাঁহারা অন্নপূর্ণাকে ভক্তির সহিত বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আবার সংসারের চক্ষে যাহারা মূর্খ অজ্ঞানী দীনহীন কাঙ্গাল তাঁহারাও তাঁহাকে পরম সুহৃদ জ্ঞানে হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করিয়া অশেষ শান্তিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং অন্নপূর্ণার মত সাধারণ শিক্ষিতা নারীর সংসারে উচ্চ, মধ্যম ও অধঃশ্রেণীর লোকের সহিত সমান সখ্যতা রক্ষা করিয়া যাওয়া কেমন সুকঠিন। তিনি কেবল পরম আত্মাতে আত্মসমর্পণ করাতেই এরূপ অসাধ্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই স্থানে আমি অন্নপূর্ণার কোন উচ্চতম শিক্ষিত বন্ধুর কথা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।)

শ্রদ্ধাভাজন আনন্দমোহন বসু মহাশয় যখন বগুড়ায় কোন কার্য্যোপলক্ষে আইসেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমাদের একটী জটিল ধর্ম্ম মীমাংসার কথা উত্থাপিত হয়। প্রসঙ্গটী এই আমি বলি "শিক্ষার উচ্চতম আদর্শ ধর্ম্ম। যে কোন ভাষা শিক্ষার দ্বারায় সহজে সেই জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় তাহাই আমাদের অবলম্বনীয়। আমরা যখন উভয়েই ইংরাজী কি সংস্কৃত শিক্ষা লাভকরিতে পারি নাই তখন সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য বাঙ্গলাই যথেষ্ট মনে করি, যদি অবস্থায় ইংরাজী কিম্বা সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারে ক্ষতি নাই, কিন্তু কোনরূপ ভাষা শিক্ষার উচ্চতম

পথে তাহারা না যাইতে পারিলেও যদি তাহারা ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছে ইহা দেখিতে পাই অথচ তাহারা সাংসারিক জীবিকা নির্ব্বাহের জন্ত সামান্ত প্রকার কৃষি কি বাণিজ্য অথবা কোন প্রকার শ্রমজীবীর কার্য্য করিয়া দিন যাপন করে তাহাও প্রার্থনীয়"। অন্নপূর্ণা এই কথার নিম্নলিখিত মত প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন "উচ্চতম শিক্ষা (ইংরাজী ও সংস্কৃত) না হইলে প্রকৃত ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না ও জগতের উচ্চতম জ্ঞানীদিগের চিন্তার ও সাধনার ফল লাভকরা যায় না। সুতরাং সন্তানদিগকে যেমন বালক কাল হইতে উপাসনা শিক্ষা দেওয়া হইবে তেমন তাহাদিগের জীবন যেন উচ্চতম বিদ্যাশিক্ষায় উন্নত হইতে পারে তাহার জন্ত অশেষ রূপ যত্ন করা ও পিতা মাতার বিশেষ কর্ত্তব্য। দরিদ্র অবস্থায় বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ শিক্ষা হওয়া অসম্ভব। তুমি যেরূপ প্রবল বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া সন্তান গণের পক্ষেও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছ, আমার মতে সেটী কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে সদ্ভাবে অর্থোপার্জন করিয়া সন্তানগণের বর্ত্তমান সময়ের উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষাও হইতে পারে এইরূপ পথ আশ্রয় করাই উচিত"।

আমাদের উভয়ের কথা আনন্দমোহন বাবু শ্রবণ করিয়া আমাকে জানাইলেন যে আমি আপনার সহিত ঐক্য হইতে পারিলাম না। অন্নপূর্ণার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত হইলাম; অতএব আপনাদের বগুড়া পরিত্যাগের যে সংকল্প হইয়াছিল তাহা রহিত করুন। কলিকাতা না যাওয়াই কর্ত্তব্য।

অন্নপূর্ণা বগুড়ার বাসার আসিয়া যখন একাকী ক্ষুণ্ণ ও অবসন্ন মনে চিন্তাকুল ছিলেন সে সময়ে

মহোদয়া শ্রীমতী শরৎশশী গুপ্তা তাঁহাকে এমন সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রেমে আবদ্ধ করে যে, তিনি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকটে যাতায়াত করিতে থাকেন। এক দিবস তাঁহার স্বামী হঠাৎ জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তুমি গোপনে বাড়ী ঘর ফেলাইয়া যেরূপ যাইতেছ ইহা তোমার বিবেচনার কার্য্য হইতেছে না। তাহাতে তিনি উত্তর করেন যে সংসার মরুভূমির মধ্যে আমি শরৎশশীকে সুশীতল সরোবরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তথায় যাতায়াত করিয়া থাকি তুমি ইহাতে বাধা জন্মাইও না। তোমার ইচ্ছা থাকে, আমরা কি করি তাহার অনুসন্ধান করিতে পার। আমি বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারায় জানিলাম শরৎশশী সৎস্বভাবা ও সরলা, কৈলাসচন্দ্র বক্সী মহাশয়ের প্রথমা কন্যা। সকলের নিকটে সে শৈশব হইতে দয়াশীলা, বিনীতা, পর দুঃখ কাতরা বলিয়া বিশেষ আদৃতা ছিল। সমবয়সী স্ত্রীবন্ধুর মধ্যে অন্নপূর্ণার এইরূপ দ্বিতীয় বন্ধু আর ছিল না। প্রথম হইতে অন্নপূর্ণাকে এমন আশ্চর্য্য শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া হৃদয় মন্দিরে লইয়া প্রেমে এমন অভিষেক করিয়াছিল যে, প্রায় বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত এই বন্ধুতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে এমত একতা জন্মিয়াছিল যে, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে কিছুমাত্র বিস্মৃতির কারণ সংঘটন হয় নাই। শরৎশশী অন্নপূর্ণার সুখ দুঃখ উভয়ের অংশভাগিনী হইয়াছিল। শরৎশশীর পতি শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র সেন বি. এ, পাশ করিয়া ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটী লাইনে প্রবেশ করতঃ অতি সত্বরে উন্নত হইয়া অন্নপূর্ণার মৃত্যু সময়ে ৫০০ শত টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন।

শরৎশশী ধন মানে সংসারে উচ্চস্থান অধিকার করিলেও, অন্নপূর্ণার সহিত ব্যবহারে তাঁহার কোন অভিমানের চিহ্নই লক্ষিত হইত না। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সাংঘাতিক কাতর হইয়া পড়িলে এক মুহূর্ত্তকাল তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না; কিন্তু অন্নপূর্ণার ব্যারামের কথা শুনিয়া সে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে নাই। তাঁহার সহিত তিন চারি ঘণ্টাকাল সাক্ষাৎ করিয়া প্রাণের অনেক বেদনা উভয়ে খুলিয়া বিনিময় করিয়াছিল। অন্নপূর্ণার কথার ভাবে আমি অনুমান করিতে পারি যে, শরৎশশী ও সে বাল্যকাল হইতে প্রৌঢ়কাল পর্য্যন্ত জীবনের ইতিহাস পরস্পরের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। যখন দারজিলিং পাহাড়ে শরৎশশীর দ্বিতীয় সন্তানের মৃত্যু হয়, তখন শরৎশশী শোক বিহ্বল হইয়া পড়ে তখন অন্নপূর্ণার শান্তিময় লিপি প্রাপ্ত হইয়া এমনই ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল যে, আর কখন দুর্ব্বিষহ শোক সন্তাপ তাহাকে অধৈর্য্য করিতে পারে নাই। অল্প দিন পরে শরৎশশীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়। তাহাতেও সে বিলক্ষণ ধৈর্য্য অবলম্বন করতঃ ঈশ্বরে আত্মসমর্পন করিয়াছিল অন্নপূর্ণা তাহার হৃদয়ে নির্ভরের ভাব এমন করিয়া মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন যে সংসারের কোন সন্তাপ আর তাহাকে ঈশ্বর হইতে চ্যুত করিতে পারে নাই। তিনি শরৎশশীর হৃদয়ে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। কালের আঘাতেও তাহার অন্তর হইতে তাঁহাকে অন্তর করিতে পারে নাই। অন্নপূর্ণার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে শরৎশশী তাহারজন্য নানাপ্রকার সুস্বাদু দ্রব্য সামগ্রী পুঃন পুঃন প্রেরণ করিয়াছিল। অন্নপূর্ণার সন্তানদিগের মস্তকে যে শীঘ্র বজ্রাঘাত হইবে তাহা শরতশশী

প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিয়া নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা তাহাদিগকে পুঃন পুঃন সন্তুষ্ট করিয়াছিল। অন্নপূর্ণার মৃত্যুর পর শরৎশশী সেই অন্নপূর্ণার প্রণয় বিস্মৃত না হইয়া আরো বরং উজ্জ্বলতর রূপে হৃদয়ে দেদীপ্যমান দেখিত। অন্নপূর্ণার চিত্র তাঁহার হৃদয় মন্দিরে এমন মুদ্রিত হইয়াছিল যে কিছুতেই তাহার উজ্জ্বলতা হ্রাস হয় নাই। বরং তাঁহার মৃত্যুর পর দৈনন্দিন তাহা উজ্জ্বল প্রভা বিশিষ্ট হইতেছিল। যখন অন্নপূর্ণার মৃত্যুর পরে আমার উন্মাদ রোগ প্রবল হইয়া উঠিল, আমাকে বহরমপুর লিউন্যাটিক এসাইলমে প্রেরণ করিল, তখন যেন ঈশ্বরের বিশেষ করুণা জন্যেই যেন শরৎশশীর পতি মহেশ বাবু বহরমপুরে বদলী হইয়াছিলেন। শরৎশশী আমার তত্ত্ব জানিতে পারিয়া মহেশবাবুকে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া আমার অবস্থা সমস্ত অবগত হইল। এবং আমার যখন যাহা আবশ্যক, তৎক্ষণাৎ তাহা উচ্চভাবের সঙ্গে ভক্তিসহকারে পাঠাইয়া আমার সকল অভাব দূর করিয়াছিল। দুই বৎসর যাবৎ যখন যে উপাদেয় বস্তু সে লাভ করিত আমাকে,তাহার সকলের অংশভাগী করিয়াছিল। অন্নপূর্ণার জীবন চরিত লিখিবার জন্য আমি তাঁহার নিকট কাগজ কলম প্রার্থনা করিলে, সে ক্রমাগত দুই বৎসর যাবৎ অতি উৎকৃষ্ট কালী কলম কাগজ অনবরত যথেষ্ট পরিমাণ পাঠাইয়া অন্নপূর্ণার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়াছিল। সে আশ্চর্য্যরূপে সাক্ষাৎ ভক্তির ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। সে আমাকে জেলে যে পত্র লিখে তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে "অন্নপূর্ণা দেবী ধন্য, তিনি পরলোকে অমর ধামে গমন করিয়া ঈশ্বর কর্তৃক পুরস্কৃতা হইতে- ছেন। যে নারীর মৃত্যুর পরে তাঁহার স্বামী শোকচিহ্নস্বরূপ

তাঁহাকে অন্তরে সতত দর্শন করিয়া সকল প্রকার বিষয় বাসনা ত্যাগ করে, তাহার মত সৌভাগ্যশালিনী নারী কেহ জন্মিয়াছে কিনা আমি বলিতে পারি না।” অন্নপূর্ণার ও শরৎশশীর প্রণয় বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন করিলে একখানা বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে, সুতরাং আমি কেবল প্রণয়ের আভাস মাত্র দিলাম। এস্থলে পাঠক দিগকে জানাইতেছি যে, একটি সরোবরে কুমুদ ও কমলিনী প্রস্ফুটিত হইয়া যেমন সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে, সেইরূপ বগুড়ার মত ক্ষুদ্র স্থানে একজন হিন্দু ললনা শরৎ শশী, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনী অন্নপূর্ণার সহিত ২০ বৎসরকাল প্রণয়ের উচ্চতম অভিনয় করিয়া উভয়ে স্বর্গবাসিনী হইয়া বগুড়ার সৌভাগ্য বিস্তার করিয়াছেন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনীর পবিত্র সম্মিলন, (যাহার সঙ্গে কোন আর্থিক কি সংসারিক কোন প্রকার সম্বন্ধের লেশ মাত্র ছিলনা)। স্বভাবতঃ পুরুষ পুরুষের গুণগান করিতে প্রায়সই সঙ্কুচিত; স্ত্রীজন মধ্যেও স্ত্রীজনের গুণ গান করিতে অনেক স্থানে সঙ্কোচভাব দেখা যায় কিন্তু শরৎশশী অন্নপূর্ণার মধ্যে এমন আশ্চর্য্য আলোক দর্শন করিয়াছিল যে, দর্শন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার গুণ গানে রসনা কোন দিনের জন্ত বিশ্রাম লাভ করে নাই। শরৎশশী তাহাকে আপন অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠা মনে করিত। অন্নপূর্ণাও মৃত্যু পর্য্যন্ত শরৎশশীকে একমাত্র আরামের স্থান ও প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া আপনা হইতে শ্রেষ্ঠা মনে করিয়া অনেক বার আমার নিকট প্রকাশ করিতেন। ভগবান্ এই আশ্চর্য্য দুইটী কুসুম স্বর্গীয়তত্ত্ব প্রচারের জন্ত যেন মর্ত্ত্যভূমিতে প্রেরণ

করিয়াছিলেন। স্ত্রীজনের মধ্যে এরূপ সৌহার্দ্য আমি কখনও দর্শন করিনাই ও শ্রবণ করিনাই।

(বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী অন্নপূর্ণার সাহস ও বল বুদ্ধির প্রথম সোপান। যে দিন দেবী বাবু তাঁহার সুমার্জিত বুদ্ধির পরিচয় পাইলেন, অপরিস্ফুট ধীশক্তি লক্ষ্য করিলেন, পরমদেবতাতে ঐকান্তিক বিশ্বাস, আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রথম স্ফুরণ, ও অমায়িক বিনীত ব্যবহারে মোহিত হইলেন সেইদিন হইতে দেবী বাবুর হৃদয়ে প্রবলতর স্পৃহা, যাহাতে অন্নপূর্ণা শীঘ্র জনসমাজের নিকট আদৃতা হন, ও তাঁহার লেখনির পরিচয় সর্ব্বত্র বিস্তারিত হয়। এই জন্য তিনি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিয়া গেলেন যে আপনাকে আমার "শরৎচন্দ্রের" সমালোচনা শীঘ্র করিতে হইবে। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা অন্নপূর্ণা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, অল্পদিন মধ্যেই "শরৎচন্দ্রের" সমালোচনা সংক্ষেপে লিখিয়া প্রেরণ করিলেন ও বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয়ের 'অবলা বান্ধবে' তাহা প্রকাশিত হইল। অন্নপূর্ণা মনে ২ ভাবিতেছিলেন যে, তাঁহার প্রবন্ধ পাঠকরিয়া লোকে না জানি কতই ঠাট্টা বিদ্রুপ করিবে বস্তুতঃ যখন তাহার কিছুই হইল না, বরং ২।৪ জন সে সম্বন্ধে ভাল মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়ে কিছু বলের সঞ্চার হইল। তাহার পরে কোন উৎসবে তিনি 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা আমি দেবী বাবুকে দেওয়াতে, তিনি তাহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। তৎপর "সত্যমেব জয়তে" নামক প্রবন্ধ ও দেবী বাবু আমার ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। তৎপর দেবী

বাবুর প্রণীত সোপানর প্রথম স্তর প্রকাশিত হইলে দেখিলাম যে, তিনি তাহা অনুপূর্ণার নামে এরূপ ভাবে উৎসর্গ করিয়াছেন যে তাঁহার দ্রষ্টব্য মধ্যে অনুপূর্ণাকে সর্ব্বপ্রধানা নারী বলিয়া তিনি ভক্তি পূর্ব্বক উপরোক্ত পুস্তক উপহার দিয়াছেন। কোন দুর্ব্বল লতিকা কোন উচ্চ বৃক্ষের আশ্রয় পাইয়া যখন বহুদূর বিস্তৃত হওতঃ কুসুম দানে জনগণের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হয়, তখন সেই জাতীয় লতিকা বহু সমাদর পূর্ব্বক অমরবাঞ্ছিত পুষ্পোদ্যানেও স্থান পাইয়া আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। অনুপূর্ণা অতি দুর্ব্বল হৃদয়া নারী, আপনাকে অতি অকর্ম্মণ্য ও ক্ষুদ্র বলিয়া জানিতেন; কিন্তু দেবী বাবুর ন্যায় সুলেখকের উৎসাহ পাইয়া দিনে দিনে তাঁহার আশালতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং কালে তিনি সুলেখিকা বলিয়া পরিচিতা হইয়া গিয়াছেন। দেবী বাবুর মত বন্ধু না মিলিলে তাঁহার এই সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় হইত কিনা, পরম দেবতা পরমেশ্বরই জানেন। যদি দেবী বাবু পুরুষ না হইতেন অথবা অনুপূর্ণা নারী না হইতেন তাহা হইলে তাঁহাদের এই বন্ধুতার অশেষ প্রকার সুফল আমরা দেখিতে পাইতাম। অনুপূর্ণা অপরের বিবাহিতা রমণী বলিয়া দেবী বাবুর অন্তরের অদম্য ভক্তিভাব ক্রমে ইচ্ছাপূর্ব্বক নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া আসিছিল। অনুপূর্ণা ইতিপূর্ব্বে স্বামীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, 'মনুষ্য লোকে নারীর স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের সহিত অদ্বিতীয় বন্ধুতা সংস্থাপন হইতে পারে না, যদি হয় তবে সে নারীকে তিনি সতী বলিতে প্রস্তুত নন।' বোধহয় এই জন্যই দেবী বাবুর নিস্কাম বন্ধুতার উপযুক্ত ব্যবহার তাঁহার অন্তরে থাকিলেও বাহিরে তিনি তাহা কোন দিন প্রকাশ করেন নাই।

অন্নপূর্ণার ন্যায় এইরূপ অবস্থায় আত্মদমনে সক্ষমা দ্বিতীয়া নারী আমি দর্শন করি নাই। বাস্তবিক কেবল তিনি এই বিষয় বলিয়া নহে শত শত বিষয়ে তাঁহাক আশ্চর্য্য আত্মদমনে সক্ষমা দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। অন্নপূর্ণার সহিত দেবী বাবুর এরূপ বন্ধুতা সত্যতা মূলক, এই জন্য দেবী বাবু ভিন্নদেশীয় লোক হইয়াও আমার নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। বলিতে গেলে তিনি অন্নপূর্ণার বন্ধু বলিয়াই আমাকে ভাল বাসিতেন, এবং আমিও তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধাকরি।) পাঠকগণ! দেবী বাবু সোপানে কিরূপ উৎসর্গপত্র দিয়াছিলেন তাহা অন্য স্থানে দিতেছি দেখিলেই দেবী বাবুর মানসক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা কিরূপ পূজিতা হইয়াছেন দেখিতে পাইবেন, এবং অন্যত্র এই পুস্তকে দেবী বাবুর লিখিত মন্তব্যে সকল সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর আমার অধিক লিখিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া বিরত হইলাম। বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি অন্নপূর্ণার একটি বিশেষ বন্ধু; যে অবধি 'তিনি অবলা বান্ধবে' নারীদিগের উন্নতির জন্য স্বতঃ পরতঃ যত্ন করিতেছিলেন, সেই অবধি অন্ন-পূর্ণার হৃদয়ে তিনি মুদ্রিত হইয়াছিলেন। তাহার পরে যখন দ্বারি বাবু বগুড়ায় আসিলেন, এবং অন্নপূর্ণার সঙ্গে আলাপ করিলেন তখন দ্বারি বাবুর অন্তরে অন্নপূর্ণা চির-সুহৃদ রূপে স্থান পাইলেন। বোধ হয় শ্রদ্ধেয় বাবু দুর্গা মোহন দাস, শ্রদ্ধের বাবু রজনী নাথ রায়, শ্রদ্ধেয় বাবু আনন্দ মোহন বসু, শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতি মহোদয়গণ যে অন্নপূর্ণাকে না দেখিয়াও আদর্শনারী স্বরূপ ভক্তি করিতেন তাহার মূল কারণ দ্বারিবাবুর রসনা অন্নপূর্ণার

যথাযথ গুণ বর্ণনে অবিরত ব্যাপৃত থাকাতেই সংঘটন হইয়াছে। যদিও পরে প্রোক্ত মহোদয়গণের মধ্যে অনেকের সহিত অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ ও আলাপাদি হওয়াতে পূর্ব্ব বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, যদিও তাঁহাদের অন্যান্য বন্ধু দ্বারাও এই বিষয়ে তাঁহারা দ্বারি বাবুর বাক্য অপেক্ষা অধিক জানিতে পারিয়াছেন, তথাপি ইহা বলিতে হইবে যে, অন্নপূর্ণা দ্বারিবাবুর মত সুহৃদ পাওয়াতে উন্নত শিক্ষিত সমাজে আদৃতা ও বিশেষ সমাদর পাইয়াছিলেন। দ্বারি বাবুর প্রকৃতি এই যে, তিনি যদিও নারীজাতির একান্ত পক্ষপাতী, তাই বলিয়া তিনি অতিরঞ্জিত করিয়া বন্ধুদিগকে অন্যের নিকট পরিচিত করিতে প্রস্তুত নহেন।)

অন্নপূর্ণার প্রকৃতিও অবিকল দ্বারি বাবুর ন্যায় কঠিন ছিল। তিনি কোন ক্রমে তাঁহার বন্ধুর গুণ অতিরঞ্জিত করিয়া কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে শুনি নাই। তবে একস্থলে আমার সন্দেহ আছে, যে, তিনি তাঁহার পতি সম্বন্ধে কোন কোন নারীবন্ধুর নিকট বিশেষতঃ শরৎশশী গুপ্তার নিকট অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়া থাকিবেন।

বাবু কেশবনাথ রায় স্বকীয় মৃদু ব্যবহারে সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত নহেন। কিন্তু অন্নপূর্ণার সহিত তাঁহার যেরূপ বন্ধুতা ছিল তাহাতে আমি তাঁহাকে অতি উচ্চতর ভাবে দর্শন করিতাম; বোধ হয় কেশব বাবুর ন্যায় দৈনন্দিন তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না এবং প্রাণ খুলিয়া সকল বিষয়ে আলাপাদি করিতে পারেন নাই। কেশব বাবু তাঁহাকে রীতিমত কোন শিক্ষা না দিলেও তিনি তাঁহার সহিত আলাপে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। আপনার সহোদর কোন জ্যেষ্ঠ-

ভ্রাতার সহিত যেরূপ আলাপ করিয়া ও সৎব্যবহার করিয়া লোকে সুখী হইয়া থাকে, অন্নপূর্ণা কেশব বাবুর ন্যায় বন্ধু দ্বারায় সে সুখ লাভ করিয়াছেন। কেশব বাবুর স্বরচিত মন্তব্যে পাঠকগণ এবিষয় সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিবেন। বাবু রণজয় সেন এক সময়ে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষিত হইয়া অতি উচ্চ সাধু জীবনের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার তখনকার শিক্ষা যদিও বগুড়াস্থ বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই অবগত নহেন কিন্তু যখন অন্নপূর্ণা প্রকাশ্য ভাবে অপর যুবকগণের সহিত স্বাধীন ভাবে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখনকার প্রথম ও প্রধান আলাপী বন্ধু বাবু রণজয় সেন। অন্নপূর্ণা যখন ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, রণজয় বাবু তখন প্রায় প্রতি দিবস সন্ধ্যার সময় তাঁহার গৃহে আসিয়া প্রমত্তভাবে ব্রহ্মোপাসনা, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন করিতেন। বলিতে গেলে রণজয় বাবুর দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাসনা প্রণালী সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করেন। অন্নপূর্ণার এক আশ্চর্য্য শক্তি এই যে,যে সঙ্গীত একবার শ্রবণ করিয়া সুখী হইতেন,তার পরেই তিনি বিনা উপদেশে সেই সঙ্গীত অবিকল করিতে সক্ষম হইতেন। রণজয় বাবু যেমন নিত্য নূতন ব্রহ্মসঙ্গীতে ও উপাসনায় আমা-দিগকে উৎসাহিত করিতেন, তেমন অন্নপূর্ণার অন্তরে সেই সকল অবিকল মুদ্রিত হইয়া যাইতে লাগিল। এই সূত্রে রণজয় বাবুর সহধর্ম্মিণীর সহিত প্রণয় সংস্থাপন হইল। রণজয় বাবুর মাতা অন্নপূর্ণাকে আপন সন্তানের ন্যায় ভাল বাসিতে লাগিলেন। এই সময় রণজয় বাবু বন্ধুতার চিহ্ন স্বরূপ অন্নপূর্ণাকে বাঙ্গালা টেলিমেকস্ প্রদান করেন। তিনি সেই টেলিমেকস্ এমন যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন যে, উক্ত গ্রন্থের সদ্ভাব লহরী

তাঁহার অন্তরে চিরদিনের তরে তরঙ্গায়িত হইতে দেখিয়াছি।

বাবু কৃষ্ণ প্রসাদ রায় একজন শিক্ষিতসৎস্বভাবী যুবক অন্নপূর্ণার গৃহে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। তিনি অন্তরে সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ছিলেন এবং অন্নপূর্ণাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই সূত্রে তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুতা জন্মে। অনেক সময়ে তিনি অন্নপূর্ণার সহিত নানা প্রকার তর্ক করিতেন তাহাতে অন্নপূর্ণা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণপ্রসাদ বাবুও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সামান্য শিক্ষিতা নারীহৃদয়েও এত অমিত বল ও অমিত সদ্ভাব লহরী খেলাইতে পারে। ইহা তিনি অন্নপূর্ণার সহিত বন্ধুতা না জন্মিলে বুঝিতে পারিতেন না।

বাবু নৃত্যগোপাল সান্যাল প্রায় ১০। ১২ বৎসর অন্নপূর্ণার গৃহেবাস করিয়াছেন। এক দিনের তরেও নৃত্য বাবুর হৃদয়ে কোন অসুখের ভাব উদয় হইয়াছে বলিয়া আমার মনে পড়ে না, তবে আমার ব্যবহারে সময় সময় অসুখ উৎপাদন হইয়াছে। নৃত্য বাবু একজন সুশিক্ষিত সুমার্জ্জিত সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ; তিনি লোক চরিত্রের উপর প্রায় কঠিন সমালোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্নপূর্ণার চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন দিন কোন মন্দ সমালোচনা শুনিতে পাই নাই। প্রত্যুতঃ তাঁহার উচ্চ ধর্ম্মভাবের, সুমার্জ্জিত ধর্ম্মবুদ্ধির, ও সারগর্ভ প্রাঞ্জল গভীর প্রবন্ধ সকলের ভূয়সী প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। তিনি অন্নপূর্ণার একজন বিশেষ বন্ধু ; কিন্তু আমার নিকট অন্নপূর্ণার মনস্বিতা সম্বন্ধে এমন কোন তেজস্বিনী ভাষা ব্যবহার করেন নাই যাহাতে আমি তাঁহাকে অন্নপূর্ণার একান্ত পক্ষপাতী বলিয়া বুঝিতে পারি। বোধ হয় তিনি অন্নপূর্ণার মহীয়সী শক্তিতে এমত মুগ্ধ হইয়া-

ছিলেন যে, তাঁহার মত গুণশীলা নারীর আমার ন্যায় পতি হওয়া দুঃখের কারণ অন্তরে বিশ্বাস করিতেন। অন্নপূর্ণার হৃদয়ে তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল তাহা অন্তিম সময়ের কিছু পূর্ব্বে আমাকে সরল ভাবে বলিয়াছেন। যখন নৃত্য বাবু "সার ধর্ম্মের" সমালোচনা করিতেছিলেন, তখন বলিলেন, 'যদি "সার ধর্ম্মের" কোন প্রবন্ধ পড়িয়া সুখী হইতে চান, তবে, অন্নপূর্ণার সুগভীর চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়া দেখুন।' অপর এক সময়ে তিনি অন্নপূর্ণার ও আমার ঘোরতর যন্ত্রণার অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত বন্ধুগণকে এরূপ গভীর প্রার্থনা করিবার জন্য বিনয় সহকারে অনুরোধ করিয়া এরূপ আশ্চর্য্য ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনায় নিমগ্ন করিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারায় আমার প্রমত্তাবস্থা প্রশান্ত ভাবে পরিণত হইয়াছিল।

আমার প্রমত্ত ভাব দেখিয়া তিনি আশঙ্কিত হইয়াছিলেন যে আমার দ্বারায় বা অন্নপূর্ণার কোন রূপ অসুখের ব্যাপার উপস্থিত হইবে আমি বা উন্মত্ত হইয়া অন্নপূর্ণার কোমল হৃদয়ের কোন রূপ যন্ত্রণাদায়ক কার্য্য করিয়া ফেলিব। তাই এই উভয় শঙ্কটের একমাত্র ঔষধি তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা প্রচুর মনে করিয়া তৎকার্য্যে নিযুক্ত হওতঃ সে ফল লাভ করিয়াছিলেন। সে ভাব চিরকালের তরে তাঁহার অন্তরে অঙ্কিত থাকিবে। প্রার্থণার পরে আমার প্রশান্তভাব দেখিয়া তাঁহার প্রাণে এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে প্রার্থণা দ্বারা প্রমত্ত পাষণ্ডও ক্ষণকাল মধ্যে দীনভাব ধারণ করিতে পারে। এই সময়ে আমি তাঁহার জীবনে প্রার্থণার প্রত্যক্ষ আবশ্যকতা স্বীকার করিতে দেখিয়াছি। নৃত্যবাবুর সহিত প্রতিনিয়ত আলাপ ও তর্ক দ্বারাও নানারূপ ধর্ম্ম আলোচনা দ্বারা

অন্নপূর্ণা স্বকীয় জীবনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। আবার অন্নপূর্ণার মহৎ জীবনের প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিয়াও নৃত্য বাবুর হৃদয়ে নারী জাতির প্রতি অশেষ প্রকার শ্রদ্ধার বীজ উৎপাদিত হইয়াছিল। নৃত্যবাবুর ভাবে বুঝা যাইত যে এইরূপ নারী যাহার গৃহে বাস করেন তাঁহার নানাপ্রকার সাংসারিক দুর্ঘটনা হইলেও গৃহ আনন্দ কানন বলিয়া বোধ হয়। অন্নপূর্ণার আনন্দময় প্রকৃতি চিরদিনের তরে নৃত্যবাবুর হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া থাকিবেক। যদিও আমার সহিত বন্ধুতার জন্য অন্নপূর্ণার সহিত বন্ধুতার সূত্র পাত হয়; তাঁহাদের পরস্পরের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্ধুতা স্থাপন হইলে আমি, অন্নপূর্ণার বন্ধু বলিয়া তাঁহার মৃত্যুর পরেও তাঁহার বিশেষ প্রীতি- ভাজন হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, বি, এল, মুন-সেফী কার্য্যোপলক্ষে যখন বগুড়ায় আইসেন, তখন আমি অন্ন-পূর্ণা সহ তাঁহার বাটীতে যাই। তিনি অতি সমাদরের সহিত অন্নপূর্ণাকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত পরিচয় করিয়া দেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার সহধর্ম্মিনীর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে অন্নপূর্ণা সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন। এই হইতে যোগেন্দ্র বাবুর অন্তরে তাঁহার প্রতি ভক্তির সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়। ভক্তিভাজন যোগেন্দ্র বাবুর সহধর্ম্মিণীর নিকট অন্নপুর্ণার মহৎ জীবনের ভাব তিনি এরূপ মুদ্রিত করিয়াছেন যে, মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তিনি অন্নপুর্ণার জন্য অশেষ যত্ন করিয়া-ছিলেন, ও নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী দিয়া, ও অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, এবং নিজ সন্তানাদি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া, নানা সময়ে তাঁহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য অশেষ যত্ন করিয়াছেন।

যদিও যোগেন্দ্র বাবু অন্নপূর্ণার জীবনের শেষ অবস্থার বন্ধু কিন্তু তিনি ভাবে ভক্তিতে ও যত্নে এমন ভাব পুনঃ ২ প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহাকে তিনি বহু দিনের পরিচিত বন্ধু অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন মনে করিতেন না। যোগেন্দ্র বাবুর হৃদয়ে সহজে ভাবের তরঙ্গ খেলে। তিনি এইরূপ ক্ষুদ্র গৃহে এরূপ প্রতিভাশালিনী উচ্চ হৃদয়া নারীর শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার কিসে সম্মান বৃদ্ধি হইবে, অন্নপূর্ণা যে বঙ্গ সমাজের মধ্যে একটী উজ্জ্বল রত্ন তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডিঃ মাঃ মহাশয়ের হৃদয়ে ও ঐ রূপ উচ্চতম সুশিক্ষিত বন্ধুগণের হৃদয়ে অন্নপূর্ণাকে এই রূপ মুদ্রিত করিয়া ছিলেন যে, তাঁহার বন্ধুগণ অন্নপূর্ণার মহৎ-জীবনের পরিচয় পাইয়া বিনীত ভক্তি উপহার প্রদান করতঃ অন্নপূর্ণার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ঘোরতর অমাবস্যার রজনীতে গহন কাননে একটী উজ্জ্বল আলোক দেখিয়া পথিকের অন্তরে যে অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হয় এবং হঠাৎ সেই আলোক নির্ব্বাণ হইলে, পথিকের অন্তর যেরূপ বিষাদ পূর্ণ দুঃখের কালিমায় আবৃত করে ও যন্ত্রণায় অধীর করে অন্নপূর্ণার জীবনের প্রদীপ নির্ব্বাণ সময়ে, যোগেন্দ্র বাবুর অন্তরে সেইরূপ অসহনীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল। যোগেন্দ্র বাবুর সহিত অন্নপূর্ণা নানা প্রকার ধর্ম্মালোচনা করিয়া গভীর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্র বাবু অন্নপূর্ণার পবিত্র ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের তরঙ্গে এই রূপ ঈশ্বর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন যে, তাঁহার তৎকালিক জীবনের গভীর ভাব-তরঙ্গে আমি তাঁহাকে আশ্চর্য্য কঠিন বৈরাগ্য ব্রত পালনে

ও উচ্চ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুশরণে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম।

শ্রীযুক্ত বাবু বেণী মাধব চাকী

বিএ, বিএল, ইনি সুশিক্ষিত রহস্য পটু ব্যঙ্গোক্তি সুপটু সরল, অমায়িক, সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সম্পন্ন বগুড়ার মধ্যে সুকবি অন্নপূর্ণার এক জন বিশেষ সুহৃদ। ইঁহার নিকট হইতে অন্নপূর্ণা নানা প্রকার উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং অতি প্রাঞ্জল মনোরঞ্জন নূতন নূতন সঙ্গীতও শিক্ষা করিয়াছেন। ইনি নানা প্রকারে অন্নপূর্ণার ধর্ম্ম জীবনের পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি একটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান, কাহারও প্রশংসা তাঁহার কর্ণ গোচর হইলে কিছু না কিছু পরিমাণে ধর্ম্ম জীবনের ক্ষতি হয় বলিয়া, সহজে প্রকাশ্য ভাবে প্রশংসা করা উচিত বোধ করেন না। কিন্তু হৃদয়ের ভাব কেহই সম্পূর্ণ গোপন করিতে সক্ষম হন না। ইনি কঠিন হইলেও অন্নপূর্ণার প্রতি ভক্তি ভাব অলক্ষ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। অন্নপূর্ণাকে ইনি বিদূষী নারী বলিয়া স্বীকার করিতে বোধ হয় অসম্মত নন, প্রত্যুত তাঁহার কোমল বিনীত সরল প্রকৃতিতে ইনি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ হন। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি অন্নপূর্ণার অনুরোধ ইনি কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই রূপ যথার্থ পরীক্ষাতেই চরিত্র উন্নত হয়। অন্নপূর্ণার প্রতি বেণী বাবুর কিরূপ ভাব ছিল, তাঁহার স্বরচিত মন্তব্যে পাঠকগণ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

বাবু শশীকান্ত বসু ইনি এক জন সুশিক্ষিত রহস্য পটু ব্যঙ্গোক্তি ব্যঞ্জক ভাষায় সুদক্ষ। সহজে কাহারও গুণ স্বীকার

করিতে সম্মত নন। কষ্টি পাথরের দ্বারা, যেমন স্বর্ণের পরীক্ষা হয়, ইহার দ্বারায় সেই রূপ মানব জীবনের প্রকৃত গুণের পরীক্ষা হইয়া থাকে। ইনি অশেষ প্রকারে অন্নপূর্ণার জীবন পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু কখনও অন্নপূর্ণার জীবনের বিরুদ্ধে কোন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ আমি কখন শুনি নাই। ইনি অন্নপূর্ণাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। অন্নপূর্ণাকে বন্ধু স্বীকার করিতে গৌরব বোধ করিতেন। আমি তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া সহজে অনুমান করিতে পারি, অন্নপূর্ণা ইহার নিকট হইতে নানা প্রকার সুশিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন। বিশেষতঃ নূতন নূতন ব্রহ্ম সঙ্গীতের সুর শিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইয়া ছিলেন ইহার স্বরচিত প্রবন্ধে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ইনি অন্নপূর্ণার কেমন বন্ধু।

বাবু প্যারি শঙ্কর দাস গুপ্ত (এল, এম, এস,) ইনি এক জন সুশিক্ষিত সুচিকিৎসক এবং নব বিধান বিশ্বাসী ব্রাহ্ম। অন্নপূর্ণা ইহার নিকট হইতে ধর্ম্ম, নীতি ও ব্যবহার শিক্ষা করিয়া ছিলেন। অন্নপূর্ণা যে সুলেখিকা ছিলেন, তাহা ইঁহার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কোন সময়ে তিনি তাঁহার স্বরচিত হস্ত-লিপি পুস্তিকা অন্নপূর্ণাকে দেখিতে ও সে সম্বন্ধে মত প্রকাশের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, অন্নপূর্ণা উক্ত পুস্তিকা পাঠ করিয়া তাহা ফেরত দেওয়ার সময়, মুখে তাঁহাকে তাঁহার মন্তব্য বলিয়া দিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার হৃদয় এরূপ বিনীত যে, সহজে কাহার দোষ গুণ, সমালোচনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ইহার প্রদত্ত মন্তব্যে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, অন্নপূর্ণার চরিত্র তাঁহার অন্তরে কিরূপ দেদীপ্যমান আছে।

বাবু রাম চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইনি অন্নপূর্ণার বিশেষ বন্ধু, অন্নপূর্ণার ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিষয়ে বিশেষ তত্ত্ব ইনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। পর দুঃখে কাতরতা ও সত্য নিষ্ঠার প্রতি ইহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। অন্নপূর্ণার পরিচয় দৈনন্দিন লাভ করিয়া ইনি এরূপ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন যে, দময়ন্তী ও সাবিত্রীর অনুরূপা বলিয়া ইহাকে বিশ্বাস করিতেন। যখন প্রত্যাহিক উপাসনা বিশেষ জমাট হইতে লাগিল তখন ইনি বিশেষ অনুরাগ পরতন্ত্র হইয়া, তথায় প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। যে সময় অন্নপূর্ণার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ইনি সর্ব্বদা ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন এবং কখন কি হয় এই আশঙ্কায় নিতান্ত ব্যাকুল হইতেন। অনেক দিন অন্নপুর্ণার ভাবী ফল, অশুভ হইবে মনে করিয়া, বিষাদে অশ্রুপাত করিতেন। অন্নপূর্ণার কিরূপ শক্তি দেখিয়া ইনি এরূপ একান্ত পক্ষপাতি হইলেন, তাহা ভাবিতে গেলে, আমাকে বলিতে হয়, অন্নপূর্ণার আধ্যাত্মিক জীবন, তাহার মূল কারণ। তিনি সর্ব্বদা অনুসন্ধান রাখিতেন যে, অন্নপূর্ণার শরীর কখন কি অবস্থায় দাঁড়ায়। যখন হঠাৎ শুনিলেন যে, অন্নপূর্ণা কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তখন অন্নপূর্ণার প্রথম দিনের অন্ন পথ্যের আয়োজন বিশেষ যত্ন সহকারে প্রস্তুত করিয়া, নিজে সঙ্গে লইয়া আমাদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা তাঁহার যত্ন প্রস্তুত শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্ন আহার করিয়া এত পরিতুষ্ট হইয়া ছিলেন যে, অমৃতের ন্যায় অতিরিক্ত আহারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। রাম বাবুও তাহা দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি অন্নপূর্ণার অপকার হইবে আশঙ্কায়,

কোন ক্রমে সম্মত হইলাম না। রাম বাবু পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও, আমি উপেক্ষা করিয়া ছিলাম। অন্নপূর্ণার বলবতী ইচ্ছা থাকিলেও আমার বাধা জন্য প্রোক্ত আহার হইতে বিরত হইয়াছিলেন। পর দিন তিনি শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত অন্ন আহার করিয়াছিলেন। আর জীবনে অন্ন আহার ঘটিয়া উঠে নাই। রাম বাবু আমার এই সময়ের কঠিন ব্যবহারের জন্য যৎপরোনাস্তি দুঃখ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন প্রকার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। তিনি যখন যে খানে ভক্তিরস পূর্ণ সঙ্গীত কি মনোহর শ্লোক পাইয়াছেন তৎক্ষণাৎ অন্নপূর্ণাকে না বলিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। যখন যে গ্রন্থ কি যে কোন রূপে নূতন নূতন ভাবের তরঙ্গ লাভ করিয়াছেন, কি সুল-লিত ভক্তি রসাত্মক কবিত্ব পূর্ণ ভক্তি ব্যঞ্জক পদাবলী জানিতে পারিয়াছেন তাহা অন্নপূর্ণাকে তৎক্ষণাৎ না বলিয়া সুখী হইতে পারেন নাই, যদিও তিনি আমার সঙ্গে বন্ধুতার জন্য অন্নপূর্ণার সহিত বন্ধুতার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু পরে আমা অপেক্ষাও অন্নপূর্ণা তাঁহার হৃদয়ের অকৃতিম বন্ধু হইয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার পরলোক গমনে, তিনি অন্নপূর্ণার সন্তান দিগকে অশেষ প্রকারে যত্ন করিয়াছিলেন, ও তাহাদিগকে আপন সন্তানের ন্যায় উৎকৃষ্টতর উপাদেয় সামগ্রী প্রদান করতঃ সুখী করিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার মৃত্যুতে এই গৃহ তাঁহার পক্ষে শ্মশান হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য এ গৃহে যাতায়াত প্রায় ছাড়িয়া দিয়া-ছেন বলিলেই হয়। ইহার অকৃত্রিম ভাল বাসায় অন্নপূর্ণা এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, আপন সহোদর ভ্রাতার ন্যায় নির্ভয়ে সকল সময়ে আলাপ করিতেন। এবং প্রতি দিবসের ধর্ম্ম

জীবনের ভাব সকল বিনিময় করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিতেন। ইহার স্বরচিত মন্তব্য পাঠে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, অন্নপূর্ণার সহিত রাম বাবুর বন্ধুতার কত গভীরতা ছিল।

বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ খাঁ। ইনি আমাদের বাটীর সহিত সংলগ্ন বাটীতে বাস করেন। ইনি এক জন বুদ্ধিমান সুচতুর কার্য্যদক্ষ তত্বানুদর্শী ও সত্যপ্রিয় লোক। ইঁহার ব্যবহারে অন্নপূর্ণা সুখী ছিলেন। ইঁহার সহিত নানা প্রকার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তর্ক জালে জড়িত হইয়া, অন্নপূর্ণা দৃঢ় ভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য সকল রক্ষা করিয়া সুতর্ক দ্বারায় ইহাকে পরিতুষ্ট করিতেন। ইঁহার সহিত আলাপে অন্নপূর্ণা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ইঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত অন্নপূর্ণার অকাট্য বন্ধুতা ছিল। অন্নপূর্ণার বিরহে তিনি যারপর নাই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। অন্নপূর্ণা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপা ছিলেন। অন্নপূর্ণার মনোবেদনা জানাইবার তিনি এক মাত্র স্থল ছিলেন। তাঁহার অভাবে খাঁ মহাশয় ও তাঁহার পরিবার, একটী অমূল্য দ্রব্য হারাইয়াছেন মনে করেন ও সেই ক্ষতি অদ্যাপি কাহারও দ্বারা পূরণ হয় নাই।

খাঁ মহাশয়ের ছোট বড় বহু সন্তান, অন্নপূর্ণারও বহু সন্তান, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত অবধি, অন্নপূর্ণার মৃত্যু পর্য্যন্ত এমন কোন ঘটনা সংঘটন হয় নাই যে, উভয়ের বালক বালিকার মধ্যে বিভিন্ন ভাব লক্ষিত হইয়াছে।

খাঁ মহাশয়ের বাটীতে সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়া কলাপে অন্নপূর্ণাকে সুখের অংশ ভাগিনী করিতেন, খাঁ মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে, পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, অন্নপূর্ণাকে তিনি কিরূপ জানিতেন।

বাবু কৃষ্ণ গোপাল সাণ্যাল। ইনি অন্নপূর্ণার মহৎ জীবনের গভীরত্ব আলোচনা করিয়া, এমন ভক্তি রস পূর্ণ সদাশয় ভাব দেখাইয়াছেন যে, অন্নপূর্ণার হৃদয়ে, লেশ মাত্র দুঃখ সংঘটন হয় নাই। ইঁহার সহধর্ম্মিণীও অন্নপূর্ণাকে আপন সহোদরার ন্যায় দেখিতেন এবং কোন দুঃখ বা কষ্ট উপস্থিত হইলে, অন্নপূর্ণার নিকটে আসিয়া সেই জ্বালা জুড়াইতেন। নিজের আলয়ে যত-বার কোন নিমন্ত্রণীয় কি আনন্দ জনক ব্যাপারের আয়োজন হইয়াছে, অন্নপূর্ণাকে ও তাঁহার সন্তানগণকে পরিতুষ্ট না করিয়া কি আনন্দের অংশ ভাগিনী না করিয়া, কোন রূপে সুখী হইতে পারেন নাই। এক বার কৃষ্ণ গোপাল বাবু তাঁহার পিতৃ শ্রাদ্ধে আমাদিগের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আমি কোন কারণে, অস্বীকার করাতে অন্নপূর্ণা ঘোরতর রূপে আমার সঙ্গে সমস্ত দিন তর্ক করিয়া ছিলেন। তিনি সমস্ত খাদ্য বস্তু পাঠা-ইয়া দিলে, যখন আমি অন্নপূর্ণার অনুরোধে কেবল মাত্র সন্তান দিগকে আহার করাইতে সম্মত হইয়া নিজে অস্বীকার করিলাম, তখন অন্নপূর্ণা নিজের মত সত্বেও কেবল পতি অপমান জন্য, নিজে আহার করিতে বিরত ছিলেন এবং যত দিন জীবিত ছিলেন, সেই প্রসঙ্গ উঠিলে, আমার অন্যায় ক্রোধ জন্য তাহা-দিগকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, ইহাই প্রতি নিয়ত বলিতেন। কৃষ্ণ গোপাল বাবু কালেক্টারির খাজাঞ্জি ও এখানকার মধ্যে সম্ভ্রান্ত উচ্চ কুলোদ্ভব কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। তাঁহার সুললিত সঙ্গীতে অন্নপূর্ণা বিশেষ সুখী হইতেন, এবং তাঁহাদিগকে ব্রহ্মোৎ-সবে সঙ্গীত সংকীর্ত্তন করিতে কোন দিন না দেখিলে দুঃখিত হইতেন। কৃষ্ণ গোপাল বাবুর ভ্রাতাগণ সকলেই যদিও হিন্দু

ধর্ম্মাবলম্বী, কৃষ্ণ গোপাল বাবু নিজেও হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্, তথাপি ব্রাহ্মণের এক মাত্র আরাধ্য ব্রহ্ম নামের প্রতি, বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকাতে ব্রহ্ম আরাধনায় উপস্থিত থাকা কখন অবৈধ মনে করেন নাই। প্রায় এমন উৎসব যায় নাই যে, তাঁহার ভ্রাতাগণ সহ তিনি, সঙ্গীত ও খোল করতাল প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সহ, মহোৎসাহে যোগ দান না করিয়াছেন। তাঁহার স্বরচিত মন্তব্যে অন্নপূর্ণার প্রতি কিরূপ ভাব ছিল তাহা পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন।

বাবু আনন্দ চন্দ্র চৌধুরী হেড পণ্ডিত ইংরাজী স্কুল। ইনি অতি গম্ভীর লোক, প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগী। অন্নপূর্ণার সহিত আলাপ করিয়া ইনি সর্ব্বদা সুখী হইতেন। ইনি ধর্ম্মালাপ ভিন্ন অন্য আলাপে সুখ লাভ করেন না। অন্নপূর্ণার সহিত ধর্ম্ম প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া সহজে চলিয়া যাইতে পারিতেন না। অন্নপূর্ণার গম্ভীর তত্ত্বালোচনায় তাঁহাকে স্তম্ভিত হইতে হইত। অন্নপূর্ণাকে নারী জাতীর মধ্যে অন্তরে উচ্চ আসন প্রদান করিতেন। নিজের অনুসন্ধানে ও আলোচনায় যে সকল নূতন ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন সে সকল প্রসঙ্গ ইহার নিকটে উপস্থিত করিয়া সুখী হইয়াছেন। অন্নপূর্ণা ইহার নিকটে নানা প্রকার সুশিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন। ইঁহার স্বরচিত মন্তব্যে পাঠকগণ প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিবেন।

বাবু শ্রীমন্ত কবিরাজ

ইনি এক জন সুশিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক। বিশেষ যশস্বী, ধর্ম্মানুরাগী, অমায়িক, বিনয়ী ও ক্ষমাশীল লোক। ইহঁার এখানে আগমন অবধি অন্নপূর্ণার সহিত সাক্ষাৎ হয় ও ধর্ম্মা-

লাপাদি হইতে থাকে। যখন অন্নপূর্ণা পীড়িতা হইতেন; তখন ইনি চিকিৎসা না করিলেও নিস্বার্থ ভাবে তাঁহার ব্যারাম পরীক্ষা করিতেন। এবং সময় সময় ঘোরতর যাতনার সময় ঈশ্বর বিষয়ক সঙ্গীত দ্বারায় সকল জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইতেন। অন্নপূর্ণার স্বভাব ও শক্তি, বিদ্যা ও ধর্ম্মপরায়ণতা, উপাসনা ও প্রবন্ধাদি শ্রবণে ইনি অন্নপূর্ণাকে নারীকুলের গৌরব স্বরূপ মনে করিতেন সুতরাং ইহার প্রতি শ্রদ্ধা করা ইহঁার স্বাভাবিক হইয়াছিল। ইহঁার স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠে পাঠকগণ সমস্ত অবগত হইবেন।

বাবু রাজেন্দ্র নাথ কবিরাজ—

ইনি এক জন সুশিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ও কর্ম্মনিষ্ঠ লোক। এখানে আসিয়া অবধি অন্নপূর্ণার সহিত পরিচিত হন। অন্নপূর্ণার তেজস্বীনি মহতী প্রতিভা ইনি সুন্দররূপ বুঝিতে পারিতেন। যখন যে সময় অন্নপূর্ণা কি তাঁহার সন্তানগণ পীড়িত হইত ইনি আপন জ্ঞানে তাহাদিগকে দেখিতেন এবং সঙ্কট রোগ হইলে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিতে ক্রটী করেন নাই। অন্নপূর্ণার প্রতি ইঁহার সাতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। অন্নপূর্ণাও ইঁহার নিকটে নানা প্রকারে ঋণী ছিলেন, ও অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি অন্নপূর্ণাকে শিক্ষিতা নারী মণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকেন। ইঁহার স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠে পাঠকগণ প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

বাবু মহিম চন্দ্র দাস—

ইনি এক জন পণ্ডিত ও মোক্তার। ইহার সহিত পণ্ডিতি অবস্থাতেই অন্নপূর্ণার আলাপ পরিচয়াদি হয়। পরিশেষে তাঁহার

আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের কার্য্য ও ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য ও প্রবন্ধাদি দেখিয়া এবং অন্নপূর্ণার বিনম্র ভাব দেখিয়া ইনি তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। অন্নপূর্ণা ইঁহার নিকট অশেষ প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। পাঠকগণ ইঁহার স্বরচিত মন্তব্য পাঠে সকল জানিতে পারিবেন।

বাবু কেদার নাথ সাহা—

ইনি পূর্ব্বে পণ্ডিত ছিলেন। এখন মোক্তারি করিতেছেন। ইনি অন্নপূর্ণাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার স্মরণ শক্তি ও তেজস্বিণী বুদ্ধি ও সদাশয়তায়, তিনি মোহিত হইয়া ছিলেন। ইহার বন্ধুগণের নিকট তাঁহার যশ কাহিনী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রত্যুত ইনি অন্নপূর্ণার একান্ত পক্ষপাতী, তিনিও ইহার নিকটে নানা প্রকারে সুশিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন। পাঠকগণ ইঁহার স্বরচিত মন্তব্যে স্বকীয় ভাব জানিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কেদারেশ্বর সেন—

ইনি অন্নপূর্ণার অতি দুরবস্থার সময় ঢাকায় তাঁহার সহিত আলাপ করেন। তাঁহার মহিয়সী শক্তি বুঝিতে পারিয়া ইনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বগুড়ায় আসেন, এবং বহু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বাসায় অবস্থিতি করেন। এক দিনের জন্যও অন্নপূর্ণার প্রকৃতিতে ভিন্ন ভাব দর্শন করেন নাই এবং তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অশেষ প্রকার ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। ইহার প্রবন্ধ পাঠে পাঠকগণ সমস্ত বুঝিবেন।

বাবু গিরি গোপাল রায় অন্নপূর্ণার একটী বিশেষ বন্ধু। তিনি অন্নপূর্ণার ব্যবহারে কোন সময় বিরক্ত ভাব প্রকাশ করেন নাই

প্রত্যুত ইনি অনেক সময় তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। অনুপূর্ণা ইহার নিকট হইতে লোক ব্যাবহার সুন্দর রূপ শিক্ষা করিয়াছেন। ইনি পরীক্ষা না করিয়া সহজে কাহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। গিরি বাবু তাঁহাকে অন্তরে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেন, ইহা আমি তাঁহার ব্যবহারে অনেক সময় বুঝিতে পারিয়াছি। ইহার স্বরচিত মন্তব্যে পাঠকগণ জানিবেন যে, গিরি বাবু তাঁহার কেমন বন্ধু ছিলেন।

বাবু রাজকুমার দে ইনি অনুপূর্ণাকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন, তিনি রাজকুমার বাবু দ্বারা নানা প্রকার সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করাতে রাজকুমার বাবু স্বয়ং গৌরবান্বিত মনে করেন। ইহার মন্তব্যে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন রাজকুমার বাবু তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ মহতী শক্তি দেখিতে পাইয়া ছিলেন।

বগুড়া জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু মোহিনী মোহন বসু ইনি এক জন সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক। সহজে ইঁহার অন্তরের ভাব কেহ উন্নয়ন করিতে পারেন না। কিন্তু ইনি গুণের একান্ত পক্ষপাতি, তাঁহার চরিত্রে ও শক্তিতে ইনি তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়াও সুখী হইতেন। তাঁহার উন্নতি পক্ষে মোহিনী বাবুর আন্তরিক যত্ন ও ইচ্ছা ছিল। আমি দেখিয়াছি তিনি ইঁহার নিকট নানা প্রকার উন্নত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। অনুপূর্ণা ইঁহাকে পরম আত্মীয় জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পন করিয়া ছিলেন। ইহঁার স্বরচিত মন্তব্যে অনুপূর্ণার কিরূপ শক্তি ইনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পাঠকগণ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

বাবু মহেশ চন্দ্র সেন ডিপুটী মাজীষ্ট্রেট বহরমপুর। ইনি এক জন উদারচেতা, সুশিক্ষিত, মর্ম্ম গ্রাহী, অমায়িক, মিষ্টভাষী ও গম্ভীর লোক। অন্নপূর্ণার সহিত ইহার আলাপ হওয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ শ্রদ্ধেয়া স্বর্গীয়া শরৎশশী গুপ্তার সহিত তাঁহার সখ্যতা। মহেশ বাবু নিজে অনেক সময় অন্নপূর্ণার হৃদয়-গ্রাহী উপাসনা, বক্তৃতা ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া ছিলেন এবং তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ছিলেন। তাঁহার সুমিষ্ট সারগর্ভ প্রবন্ধ শুনিয়া মহেশ বাবুর প্রাণের মধ্যে অমিত ভক্তির আকর হইয়াছিল, তাহাতেই মহেশ বাবু তাঁহার প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধা-যুক্ত ও বিনীত ব্যবহার করিয়া সুখী হইয়া ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার প্রাণের মধ্যে পবিত্র স্থান পাইয়া ছিলেন। অন্নপূর্ণার মধ্যে এমত মহতী শক্তি কার্য্য করিয়া ছিল যে, কি বিদ্বান, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি সুখী, কি দুঃখী, সকলেই তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হইতেন। মহেশ বাবুর দ্বারায় তাঁহার অশেষ বিধ উপকার সাধিত হইয়া ছিল। অন্নপূর্ণার অভাব হইলেও সেই শ্রদ্ধেয় মহেশ বাবু তাঁহার পতির প্রতি যথেষ্ট সমাদর ও তাঁহার কঠিন দুঃখের সময় শান্তির আকর স্বরূপ হইয়া ছিলেন। তিনি যদি বহরমপুরে লিউনাটিক এসাইলমে ক্রমাগত দুই বৎসর কাল আমায়, বিশেষ সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিতে পারিনা যে, সেই কুম্ভীপাক নরক তুল্য স্থান হইতে, আরোগ্য লাভ করিয়া, মুক্ত হইয়া, এই জীবন চরিত লিখিতে সমর্থ হইতাম। আমার এই প্রতি রক্ত বিন্দু, তাঁহার কৃপা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শরৎশশী গুপ্তার দয়ার চিহ্ন

স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। মহেশ বাবুর স্বরচিত মন্তব্যে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, মহেশ বাবু তাঁহাকে কিরূপ বুঝিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন।

বাবু যাদব চন্দ্র ব্রহ্ম সন্তান,—ইনি সত্য প্রিয় প্রেমিক বিনীত উপাসনাশীল ব্রাহ্ম। ইঁহার প্রাণের মধ্যে যখন ধর্ম্ম পিপাসা উপস্থিত হইল, তখন অন্নপূর্ণার আলয় সেই পিপাসা নিবৃত্তির স্থান মনে করিয়া প্রায়শঃ সেই খানে যাতায়াত করিতে থাকেন। তথায় দেখিতে পাইলেন, অন্নপূর্ণার নিকট পরিচিত কি অপরিচিত উভয়ই সমান। যতই অন্নপূর্ণার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইতে লাগিল, ততই অন্নপূর্ণার খাঁটি ধর্ম্ম ভাব সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার গৃহ এক দিনের তরেও ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। যখন অন্নপূর্ণার স্বভাবে, ইঁহার চিত্তবৃত্তি সংযমিত হইল, তখন একান্ত প্রাণে উপাসনার উচ্ছ্বাসে উচ্ছলিত হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের উভয়ের ভক্তি গদ গদ ভাব অতি আশ্চর্য্য জনক পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইনি সম্পূর্ণ নিসম্পর্কীয় লোক হইয়াও, অন্নপূর্ণার অকৃত্রিম স্নেহে কনিষ্ঠভ্রাতার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যাদব বাবু অন্নপূর্ণার ভক্তি উচ্ছাসে এমনই ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, আপন পিতা মাতা অপেক্ষা অন্নপূর্ণার নিকটে থাকিতে অধিক প্রীতি পাইতেন। তিনি জ্যেষ্ঠা ভগিনীরন্থায় অন্নপূর্ণাকে বরাবরই ভক্তি করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া, উভয়ের মধ্যে নানা সময়ে আলোচনা হইত কিন্তু কেহ একটু সময়ের জন্তও ধৈর্য্যচ্যুত কি বিচলিত হন নাই। তৎ সময়ে যাদব বাবুর ধর্ম্ম ভাব, ব্যাকুলতা, বৈরাগ্য, অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার ও আত্মীয় বন্ধু বর্গের নিকট নানা প্রকার ভঁৎসনা সহ

করা ইত্যাদি মহতী শক্তি নিচয় যেন, অন্নপূর্ণার অনুরূপ হইয়া উঠিয়া ছিল। আর একটি কথা বলিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে তৎকালে অন্নপূর্ণার মধ্যে যে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল, তাহা যাদব বাবুর মধ্যে ব্রহ্মরূপা রূপে প্রবেশ করিয়াই যেন, তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বাভ্যাস দূর করিয়া, যাদব বাবুকে এক অভিনব নূতন কলেবর প্রদান করিল। বসন্ত মারুত প্রবাহিত হইলে যেমন, বৃক্ষ শ্রেণীর পুরাতন পত্রাদি ঝরিয়া পড়িয়া যায় এবং তৎস্থানে নবকিশলয় দলে, দলে, উদ্গত হইয়া বৃক্ষকে নূতন সাজে সাজাইয়া এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মাধুরীমায় ঢাকিয়া ফেলে, পথিকগণ সহসা তাহাকে পুরাতন বৃক্ষ বলিয়া আর সহজে বুঝিতে সক্ষম হয় না, যাদব বাবুর পক্ষে ও প্রায় তদ্রুপ ঘটিয়াছিল। ভগবান অন্নপূর্ণার পবিত্র জীবন প্রবাহে যাদব বাবুর অন্তর ধৌত করিয়া এমন নূতন নূতন ভাব আনিয়া দিয়া ছিলেন যে, এইক্ষণকার যাদব বাবুকে দেখিয়া আর পূর্ব্বের যাদব বাবু বলিয়া বোধ হয় না। অন্নপূর্ণার স্নেহে যাদব বাবুর জন্মদায়িনী মাতার গৃহ তাঁহার পর গৃহ হইয়া পড়িল। আর নিতান্ত পর অন্নপূর্ণার গৃহ তাঁহার মাতার গৃহের স্থান অধিকার করিল। জন প্রবাদ আছে যে ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ হইলে "আপন পর হয়, পর আপন হয়" যাদব বাবুর জীবনে ইহা সপ্রমানিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। অনুপূর্ণার বিনীত ও সাধু ব্যবহার যাদব বাবু গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তৎকালে বহু যুবক ধর্ম্ম পিপাসু হইয়া অনুপূর্ণার গৃহে যাতায়াত করিলেও কেবল মাত্র যাদব চন্দ্রেই সেই জ্যোতি সম্যক প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ভগবানের

এই আশ্চর্য্য লীলা বগুড়ার আপামর সাধারণের হৃদয় আলোড়িত করিয়াছিল। এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রের নিকটে উভয়েই ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। এই প্রকার সুন্দর দৃশ্য অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। গোলাপ, পদ্ম, বেলী, চামেলী, যুঁই, মালতী প্রভৃতি পুষ্প নিচয় অনেকে আদর করে এবং উদ্যানে রোপণ করিয়া সেই সৌন্দর্য্য চিরকাল ভোগ করিতে চায়, কিন্তু ধর্ম্মোন্মত্ত-জীবনালোক দেখিয়া ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তির অন্তর যেমন, সত্যের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভক্তি কুসুম পবিত্র স্বর্গীয় সুগন্ধে মান অপমান সংসার তৃষ্ণা বিদায় করে এবং তৎ পরিবর্ত্তে বিবেক, সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা, ভক্তি, বিনয়, নিষ্ঠা প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি নিচয় উজ্জ্বল হইয়া অভিনব নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হয়। অন্নপূর্ণার সত্যসূর্য্যের আলোকে যাদবের অন্তর সেই রূপ আলোকময় হইয়াছিল। পাঠকগণ! যাদব বাবু অন্নপূর্ণার অন্তরে ব্রহ্ম জ্যোতি কিরূপ দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মন্তব্যে সুন্দর রূপ বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত। ইনি যখন বগুড়া বাঙ্গলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন সেই সময় এক দিন অন্নপূর্ণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। অন্নপূর্ণার সহিত আলাপে শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে অন্নপূর্ণা আরও কিছু শিক্ষার উন্নতি করিতে পারিলে ভবিষ্যতে এক জন বিদুষী, প্রতিভাশালিনীনারী হইবেন। এই জন্য তিনি অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার অধ্যক্ষ হওয়ার সময়ে অন্নপূর্ণা যাহাতে শিক্ষায় মনযোগিণী হন, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহারই যত্নে মাননীয়া মিসেস্ বিগ্‌নোল্ড্ বগুড়া অন্তঃপুর-স্ত্রী-শিক্ষা মিসন, চালাইতে সক্ষমা হইয়া ছিলেন।

এক বৎসর শিক্ষার পরে অন্নপূর্ণা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পুরস্কারাদি প্রাপ্ত হন। পরবৎসর প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া যুবতী স্কুলে প্রবেশ করেন। সেই সময় গোবিন্দবাবু ইঁহার শিক্ষার প্রভাব সম্যকরূপ বুঝিতে সক্ষম হন। শিক্ষকগণ যে সকল লেক্‌চার দিয়া যাইতেন, অন্নপূর্ণা সুপরিষ্কৃত ভাষায় তৎসমস্ত লিখিয়া রাখিতেন। লেক্‌চারের শেষে যখন শিক্ষক ছাত্রীদের লিখা দর্শন করিতেন, তখন অন্নপূর্ণার লেখনী-প্রসূতলেক্‌চার এমন সুন্দর ও শুদ্ধ হইত যে, তাহার মধ্যে একটী বর্ণ বিন্যাস ও ভুল নাই, কি কোন স্থানে কোন পদের অসামঞ্জস্য হয় নাই। ইহা দেখিয়া শিক্ষকগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অন্নপূর্ণা অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্না বলিয়া এত অল্পবয়সে এইরূপ শিক্ষিতা হইয়াছেন, ক্রমে অন্নপূর্ণার ধর্ম্ম ভাবের সম্যক্ পরিপুষ্টি ও প্রত্যুৎপন্নমতির প্রভাব বগুড়ার শিক্ষিত সমাজে সুপ্রকাশিত হইল, দেখিয়া গোবিন্দ বাবুর হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। তিনি নারী চরিত্রের উৎকর্ষতার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাহাতে অন্নপূর্ণার এতাদৃশী মহীয়সী শক্তি দেখিয়া দেশবিদেশে অন্নপূর্ণার গুণ প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট হইতে কলিকাতার ভক্তিভাজন মহোদয়গণ অন্নপূর্ণার শক্তির পরিচয় পাইয়া ছিলেন। লেখক যখন কলিকাতার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রদ্ধাস্পদ বাবু দুর্গা মোহন দাস মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলেন, তখন দুর্গা মোহন বাবু তাঁহার সুশিক্ষিতা কন্যাগণের নিকট লেখককে এই বলিয়া পরিচয় করাইয়া ছিলেন যে, "ইনি অন্নপূর্ণার স্বামী"। তৎশ্রবণে লেখক প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ কাল ক্ষুন্ন হইয়া ছিল; ইঁহারা সেই বহুদূরস্থিত অল্প-

পূর্ণার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, এতাদৃশী ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহাদের প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া অন্তরে অন্তরে ধন্যবাদ করিতে ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ গোবিন্দ বাবুর স্বরচিত মন্তব্যে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে তিনি অন্নপূর্ণাকে কি ভাবে দর্শন করিয়া ছিলেন।

পরলোক গত বাবু দ্বারকা নাথ রায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট:— ইনি যখন বগুড়ায় বাস করিতে ছিলেন, তখন অন্নপূর্ণা ইঁহার সহধর্ম্মিনীর সঙ্গে মধ্যে ২ সাক্ষাৎ করিতেন। তাহাতে অন্নপূর্ণার বিষয় তিনি প্রথম জানিতে পারেন। তৎপর তিনি যুবতী স্কুলের মাষ্টার হইলেন ও অন্নপূর্ণার প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার গুণের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া ছিলেন। তৎপর অন্নপূর্ণা পারিবারিক ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতেছেন দেখিয়া, ইনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তার পর যখন অন্নপূর্ণা বগুড়া ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের ও সম্পাদকের কার্য্য, আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের সংশোধিকার কার্য্য, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও Sermon প্রভৃতি দ্বারায় সকলের বিশেষ ভক্তি ভাজন হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দ আর হৃদয়ে ধরিতনা। তিনি তখন দূরদেশে গেলেও অন্নপূর্ণার স্বহস্ত নির্ম্মিত ভক্তিপূর্ণ আহার ও বিনীত সদ্ব্যবহার ও তেজস্বিনী ধর্ম্মের প্রভাব কখনই ভুলিতে পারেন নাই। যখনই আমার সঙ্গে দেখা হইত, তখনই ভক্তিসহকারে অন্নপূর্ণার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহার অনেক প্রশংসা করিতেন। তিনি অন্নপূর্ণাকে ব্রাহ্ম সমাজের গৌরব স্বরূপ মনে করিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ দ্বারিক বাবু পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিতে না পারিয়া আমরা সাতিশয় ক্ষুন্ন হইলাম।

বগুড়ার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রট বাবু দ্বারিকা নাথ বসু--ইনি অতীব সরল হৃদয়, দয়ালু, বিনীত স্বভাব সাধু বলিয়া সকলের প্রিয় ছিলেন। ইনি যখন বগুড়ায় বাস করেন তখন অন্নপূর্ণার সহিত নানা প্রকার ধর্ম্মালাপ ও অন্নপূর্ণার উপাসনাশীলতা এবং আত্মত্যাগ ও নারী হৃদয়ে এই রূপ উচ্চতম বৈরাগ্য দেখিয়া ইনি অন্নপূর্ণাকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। পাঠকগণ ইঁহার স্বরচিত মন্তব্যে জানিতে পারিবেন যে দ্বারিক বাবুর হৃদয়ে অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি কি রূপ মুদ্রিত হইয়াছিল।

মৌলবী আব্দুল রহিম--ইনি এক জন সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য অমায়িক লোক। যদিও ইঁহার নিবাস নাটোর কিন্তু সব-ডিপুটী কার্য্য উপলক্ষে ইনি বগুড়ায় আসিয়া আমার বাটীর পাশে বাসা করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার সহধর্ম্মিনীর সহিত অল্প কালের মধ্যে অন্নপূর্ণার সৌহাদ্য জন্মিল। তিনি অতি সরল স্বভাবা পবিত্র হৃদয়া নিরভি-মানিনী অমায়িক-স্বভাবা। আব্দুল রহিম অন্নপূর্ণার গুণে এমনই মোহিত হইলেন যে, যখন অন্নপূর্ণার উপাসনা, Sermon সংগীত সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা ও ব্যাখ্যার কথা শ্রবণ করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহা মনোযোগের সঙ্গে নিস্পন্দ ভাবে গ্রহণ করিতেন। অন্ন-পূর্ণাকে ইনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা নারী বলিয়া সন্মান করিতেন। এবং আপনার বন্ধুগণের মধ্যে পরোক্ষে সদগুণাবলী প্রকাশ করি-তেন, অন্নপূর্ণার সমক্ষে কখন কোন প্রশংসা সূচক বাক্য বলেন নাই। যেপর্য্যন্ত ইনি বগুড়ার অন্তর্গত জয়পুরের ম্যানেজারছিলেন সেই সময় যখন বগুড়ায় আসিতেন প্রায় প্রতি দিবস অন্নপূর্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ করিতেন। ইনি নানা কৌশলে বিভিন্ন

প্রকার তর্কজাল বিস্তার করিয়া অন্নপূর্ণার প্রত্যুৎপন্নমতির পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং তাঁহার মহীয়সী শক্তির উপর তাঁহার বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়তর হইয়াছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী অন্নপূর্ণাকে সহোদরার ন্যায় চিরকাল ভাল বাসিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে থাকিবার সময় আপনার প্রাণের কথা লিখিয়া জানাইয়াছেন। ইনি অভাব সময়ে অর্থ দ্বারায় ও ভাল বাসার চিহ্ন স্বরূপ, সময়, সময়, নানা প্রকার উপাদেয় সামগ্রীর দ্বারা অন্নপূর্ণার সন্তান গণকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। অসময়ে উপস্থিত হইয়া নানা আশ্বাস ও সাহস দিয়াছেন এবং অন্নপূর্ণার নিকট অবনত মস্তকে ধর্ম্মজ্ঞানের মূল তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছেন। ইঁহাদ্বারা অন্নপূর্ণা নাটোরের সম্ভ্রান্ত মুসলমান জনগণের নিকট এবং কলিকাতার বিশেষ বিশেষ সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার বর্গের নিকট সুপরিচিতা হন। ইঁহার স্বরচিত মন্তব্যে বন্ধুগণ ও পাঠকগণ প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত রায় গোসাই,—ইনি একটী বৃদ্ধ তাপস ইঁহার সুললিত সংগীত শ্রবণে অন্নপূর্ণা মোহিত হইতেন। আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ে ও দৈনিক উপাসনায়, মাসিক সমাজে ও সাম্বৎসরিক উৎসবে ইনি অন্নপূর্ণার ভক্তি তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছেন। অন্নপূর্ণাকে তিনি সাতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইঁহাদ্বারা অন্নপূর্ণা পরিচিতা হন। অন্নপূর্ণার মৃত্যুর পর কথায়, কথায়, অন্নপূর্ণার ভক্তি তরঙ্গের কথা মনে করিয়া ইনি বাষ্পাকুল নয়নে রুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া গদ গদ ভাবে অন্নপূর্ণার অভাব জন্য এমত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইঁহার ন্যায় অন্নপূর্ণার এরূপ ভাল বাসার দ্বিতীয় কোন বন্ধু আমি

দেখিতে পাই নাই। ইঁহার নিকট অন্নপূর্ণা অনেক সংগীত ও অনেক সদ্ভাব শিক্ষা করিয়াছেন। ইঁহার স্বরচিত মন্তব্যে পাঠকগণ মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন।

বাবু জানকী নাথ পোদ্দার–ইনি এক জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জন্য ইনি যথা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছেন। ইনি সহধর্ম্মিনীসহ অন্নপূর্ণার সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা করিতেন। এবং বিপদ আপদে প্রাণ পণে খাটিয়া উভয়ে সাহায্য করিতেন। অন্নপূর্ণার মহীয়সী শক্তিতে ইনি মুগ্ধ ছিলেন। অন্নপূর্ণাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। অন্নপূর্ণার নিকট ধর্ম্মজ্ঞান ও নানা প্রকার চরিত্রের উন্নতি শিক্ষা করিয়াছেন। অন্নপূর্ণা ইঁহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় আপনার এক জন বলিয়া ভাল বাসিতেন। ইঁহার স্বরচিত মন্তব্যে পাঠকগণ স্বকীয় ভাব বুঝিতে পারিবেন।

মাননীয় মৌলবী আব্দুল হক—ইনি এক জন সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত এবং স্বাধীনচেতা গুণগ্রাহী বুদ্ধিমান লোক। ইনি সবডিপুটী কালেক্টর হইয়া আমাদের অতি নিকট প্রতিবাসী ছিলেন। প্রতি দিবস তিনি অন্নপূর্ণার দৈনিক উপাসনায় বিমোহিত হইতেন। অন্নপূর্ণার প্রতি ইঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। যতবার ইনি আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের অধিবেশনে কি উৎসবে উপস্থিত হইতেন, যতক্ষণ অন্নপূর্ণার প্রবন্ধ কি উপদেশ কি ব্যাখ্যা কি উপাসনা শেষ না হইত ততক্ষণ অতি ধীর ও গম্ভীর ভাবে অবস্থিতি করিতেন। অন্নপূর্ণার কার্য্য আরম্ভ হইলে ইনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রবাহে উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেন। অনেক সময় কার্য্যে ক্লান্ত হইয়া, অন্নপূর্ণার গৃহে শান্তির জন্য আগমন করিতেন। এক সময় জ্বর রোগে আক্রান্ত

হইয়া জীবনের আশায় হতাশ হইয়া আমার নিকট বলিয়া ছিলেন যে, আমি কি এসময়ে অন্নপূর্ণা দেবীর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না? বস্তুতঃ অন্নপূর্ণা ইঁহার হৃদয় রাজ্যে দেবী রূপে চিরদিন অবস্থিতি করিয়াছেন। অন্নপূর্ণা ইঁহাদ্বারায় অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ইহার স্বরচিত মন্তব্যে পাঠক-গণ মর্ম্ম কথা জানিতে পারিবেন।

বাবু কালী কিশোর মুন্সীসম্ভ্রান্ত জমিদার সেরপুর—ইনি এক জন সুশিক্ষিত ধর্ম্মপরায়ণ লোক। অন্নপূর্ণার শক্তির পরিচয় পাইয়া যার পর নাই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া অন্নপূর্ণা বিনয় ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিয়া ছেন। বলিতে গেলে ইনি বগুড়ার মধ্যে ত্যাগ স্বীকারে ও ধৈর্য্য সহিষ্ণুতায় অদ্বিতীয়। চিরকাল স্বপরিচিত বন্ধু বান্ধবের নিকট অন্নপূর্ণার ভূয়ষী প্রশংসা করিয়াছেন। ইঁহার স্বরচিত মন্তব্যে পাঠকগণ সকলই অবগত হইতে পারিবেন।

বাবু কৃষ্ণেন্দ্র নাথ সরকার মাদলার জমিদার—ইনি এক জন সুশিক্ষিত হৃদয় গ্রাহী লোক। অন্নপূর্ণার সহিত ইঁহার অনেক বার দেখা সাক্ষাত ও আলাপ পরিচয়াদি হইয়াছে। ইঁহারা অন্নপূর্ণাকে ভগ্নী স্বরূপ জ্ঞান করিতেন এজন্য সময় সময় ভাল প্রকার উপঢৌকন পাঠাইতেন। এক বার ১৪।১৫ টাকার পায়নাপলের এক খানা শাড়ি বিশেষ আদরের সহিত পাঠাইয়া ছিলেন। অন্নপূর্ণা আমাদ্বারা কৃষ্ণেন্দ্র বাবুকে জানাই-লেন এরূপ ধুম ধামের কোন বস্ত্র ব্যবহার করেন না। কিন্তু ভক্তিপূর্ণ আদরের দান আমি গ্রহণ করিয়া আমার শিশু সন্তান দিগের কোট তৈয়ার করিয়া ছিলাম।

ইহার কিছু দিনের পর অন্নপূর্ণার নিজের দোকান হইতে বিলাতী সামান্য রকম দুই জোড়া সাদা ধুতি ও উড়ানি উক্ত ভ্রাতাকে স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ পাঠাইলে তিনি উহা বহু দিন পর্য্যন্ত সাদরে ব্যবহার করিয়াছেন। ইনি অন্নপূর্ণার বিপদ আপদে প্রচুর অর্থ ও সাহস বল দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ইঁহার সুশিক্ষিতা ভগ্নীর সঙ্গে অন্নপূর্ণার পরিচয় করিয়া দিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন। ইঁহার ভগ্নীও বিদুষী ধর্ম্মপরায়ণা সরলা নারী অন্নপূর্ণার ধর্ম্মভাবে মোহিত হইয়া যথেষ্ট সম্মান করিয়াছেন ও অন্নপূর্ণার সন্তানাদি সহ নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তে প্রচুর মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া পরিতুষ্ট করিয়াছেন। এবং দীন ভাবে অন্নপূর্ণার সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছেন। কৃষ্ণেন্দ্র বাবুর অন্তরে অন্নপূর্ণার আনন্দ মূর্ত্তি সর্ব্বদার জন্য চিত্রিত থাকিত। তিনি আপনার স্ত্রী ও কন্যাদের সুশিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। নারী কুলে তাঁহার আলাপী বন্ধুদের মধ্যে অন্নপূর্ণাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি নারী শিক্ষার উৎকর্ষতা দেখিবার স্থান অন্নপূর্ণার জীবন আদর্শ বলিয়া উল্লেখ করিতেন। কেবল তিনি কেন অন্নপূর্ণা তাঁহার ভ্রাতাগণের হৃদয়ে ও আদর্শ নারী রূপে পূজিতা হইয়া ছিলেন তাঁহার স্বরচিত মন্তব্যে পাঠকগণ সবিশেষ বুঝিতে পারিবেন।

বাবু যাদব চন্দ্র রায়——

ইনি একজন সুশিক্ষিত ব্রাহ্ম ও বিজ্ঞান প্রিয় লোক। তিনি অন্নপূর্ণাকে বর্ণ বিন্যাস সম্বন্ধে অতিশয় কঠিন পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্নপূর্ণা স্বকীয় প্রতিভা বলে তাহাতে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হন। সময়ে যাদব বাবু আমাকে অনুরোধ

করিয়াছিলেন যে যাহাতে অন্নপূর্ণা বিশেষ দুঃখে পতিত না হয়, আপনি তাঁহার সহিত সেই রূপ ব্যবহার করিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব। আমি প্রথমতঃ তাঁহার কথা মত কার্য্য করিতে পারি নাই বটে, পরিশেষে অতিশয় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা বলে তাঁহার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কষ্টের লাঘব করিতে পারি নাই; কারণ তাঁহার কথিত মত প্রথম হইতে সাবধান হইলে সুফল প্রসবের আশা ছিল বিলম্ব হওয়াতে তাহা ঘটে নাই। বিলম্ব হওয়ার কারণ আমার দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছু নহে। তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিলে অন্নপূর্ণার জীবন এত অল্প কালে করাল কালকবলিত হইত না বলিয়া আমার মনে হয়, আমি সেই জন্য সাতিশয় অনুতাপ ভোগ করিয়াছি। যাদব বাবুর সহিত আলাপে অন্নপূর্ণা বহু শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। যাদব বাবু সম্ভবতঃ তাঁহার জীবনালোকে আলোকিত হইয়াছেন। উভয়ের ধর্ম্ম ও যুক্তিতে উভয়ের উন্নতি হইয়াছে, যাদব বাবুর স্বরচিত মন্তব্যে পাঠকগণ তাঁহার নিজের মনের কথা বুঝিতে পারিবেন।

মুনসী বাহার উদ্দিন—ইনি এক জন সুশিক্ষিত তেজস্বী মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী যুবক। অন্নপূর্ণার গৃহে প্রাত্যহিক উপাসনায় ও আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ে আসিয়া উভয়ে উভয়কে জানিতে পারিয়াছেন। Pilgrim progress বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া শুনাইতে ছিলেন এবং মিলটনের Paradise Lost অনুবাদ করিয়া শুনাইতে আরম্ভ করেন। এবং সময় সময় নানাবিধ ধর্ম্মালোচনা করিয়া উভয়ে উভয়ের শিক্ষার কারণ হইয়া ছিলেন। এক সময়ে আমরা যখন কৌতুহল পরতন্ত্র হইয়া কে কত ক্ষুদ্র

সুস্পষ্ট বাঙ্গলা অক্ষর লিখিতে পারে তাহার পরীক্ষা করিতে ছিলাম। তখন মুনসী বাহার উদ্দিনের লেখা যদিও সর্ব্ব প্রধান হইয়াছিল তথাপি অন্নপূর্ণার এক ছত্র লেখা তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সুস্পষ্ট হওয়াতে অন্নপূর্ণাকে প্রথম স্থলে দেওয়া হয়। বাহার উদ্দিন মুনসী সাহেব বাঙ্গলা ভাষায় এক জন সুলেখক। তিনি অন্নপূর্ণার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে এরূপ লেখা নারী-কুল মধ্যে কেন, অনেক পুরুষের পক্ষেও গৌরবের বিষয়। আমাদের আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের ইনি এক জন যে সর্ব্ব প্রধান লেখিকা ও সংশোধিকা ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়। বন্ধু বর বাহার উদ্দিনের স্বরচিত মন্তব্যে পাঠকগণ অন্নপূর্ণার ভাব বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত সৈয়দ অলি উল্লা মিঞা দেড়আনির জমিদার বগুড়া— ইনি অন্নপূর্ণার সহিত সঙ্কোচ ভাবে আলাপ করিতেন কি জানি কোন প্রকারে বা তাঁহার সম্মানের ত্রুটি হইয়া পড়ে। ইনি জমিদার হইলেও দরিদ্রা অন্নপূর্ণার গৃহে সুখ দুঃখের সংবাদ শুনিবা মাত্র ব্যাকুল ভাবে আসিয়া তত্ত্ব লইতেন। ও নিজের সাধ্যমত সাহায্য করিতে কখন ত্রুটি করেন নাই। অন্নপূর্ণা নারী কুলের মণি স্বরূপা বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাঁহার পবিত্র সরল জীবন, জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ, ভক্তি পূর্ণ উপাসনা ও যুক্তিপূর্ণ উপদেশে তিনি সময় সময় এমন মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন যে অন্নপূর্ণার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। তিনি আপন পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব দিগের নিকট অনবরত অন্নপুর্ণার যশোগান করিয়াছেন। মুসলমান সমাজে ইঁহার দ্বারাই অন্নপুর্ণা সুপরিচিতা হইয়াছিলেন। ইহার দয়ালু বিনয়ী

স্বভাব ও পিতৃ মাতৃ ভক্তি মুসলমান সমাজের আদর্শ স্বরূপ। অন্নপূর্ণা ইঁহার নিকট পিতৃ মাতৃ ভক্তি শিক্ষা করিয়া ছিলেন। ইঁহাদের সহিত অন্নপূর্ণার সদ্ভাব এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তাঁহারা যে ভিন্ন পরিবারের লোক ইহা তাঁহাদের ব্যবহারে কেহ বুঝিতে পারিত না। যখন অন্নপূর্ণা ক্রমেই শীর্ণ হইতে লাগিলেন তখন ইঁহার অন্তরে আতঙ্ক উপস্থিত হইতে লাগিল যে বুঝি বা এই রমণী রত্ন ইহ-লোকে অধিক দিন না থাকেন। আমার সঙ্গে অন্নপূর্ণার সম্বন্ধে আলাপ করিয়া অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। যখন ইনি অন্নপূর্ণার শেষ গুরুতর ব্যারামের কথা শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া দেখিতে আসিলেন তখন ফিরিয়া যাইবার সময় বিষাদ-পূর্ণ হৃদয়ে গম্ভীর ভাবে আমাকে জানাইলেন যে আপনি ইঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে জীবনের অন্তিম অবস্থায় সমাধির সুব্যবস্থা ও সুবন্দোবস্ত হয় তাহার চেষ্টা করুন। ইঁহার নিকট হইতে আমি প্রথম অন্নপূর্ণার পরলোক গমনের সংবাদ পাইলাম। ইনি কোন কার্য্যের ব্যপদেশে শীঘ্র ভিন্ন স্থানে যাইবেন বলিয়া, বলিলেন—যদি মিউনীসিপালিটী ইঁহার সমাধি আপনার পুষ্পোদ্যানে না দিতে দেন তাহা হইলে আমার কোন বিশেষ বন্ধু জমিদারের কাছে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিয়া গেলাম। তিনিও সম্মত হইয়াছেন, আপনি আবশ্যক হইলে তথায় যাইবা মাত্র সকল সুবন্দোবস্ত হইবে। ইঁহার ভক্তিপূর্ণ সমাদরে অন্নপূর্ণা অনেক বার ইঁহার পরিবার দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের যখন যে সুখের সামগ্রী হইত ও যখন যে সুখের ব্যাপার উপস্থিত হইত অন্নপূর্ণাকে তাহার অংশ ভাগিণী না

করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই। ইঁহারা উভয়ে পরস্পর উভয়ের গুণের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার স্বরচিত মন্তব্যে অবশিষ্ট বিষয় পাঠকগণ জানিতে পারিবেন।

বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস—ইনি এক জন সুশিক্ষিত ধর্ম্মভীরু সত্যপ্রিয়, প্রচারক, প্রচার উপলক্ষে, বগুড়া অন্নপূর্ণার বাটীতে আসিয়া বাস করেন। অন্নপূর্ণার এই গৃহকে আপনার গৃহ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। অন্নপূর্ণাকে আপন ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতেন, অন্নপূর্ণা যে নারীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহাতে ইনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। অন্নপূর্ণাকে কলিকাতা নারী সমাজে ও ভক্তিভাজন, ধর্ম্ম পরায়ণ ও স্বদেশ হিতৈষী, মহাত্মা গণের অন্তরে, তিনি প্রবেশ করিয়া দেন। পাঠকগণ, ইঁহার স্বরচিত মন্তব্যে, অন্নপূর্ণার ধর্ম্মজীবনের বিশেষ পরিচয় পাইবেন।

বাবু শরচ্চন্দ্র চোধুরী—ইনি ফরিদপুরের অন্তর্গত ভাঙ্গা মহকুমার মুনসেফী কোর্টের উকিল, সুশিক্ষিত, সরল ও সৎ স্বভাবের জন্য ইনি প্রসিদ্ধ। যখন ইনি বগুড়ায় বাস করিতেন তখন ব্রাহ্মধর্ম্মআলোচনা, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার ও ব্রহ্মসঙ্গীতে ইনি, সকলকেই মোহিত করিয়াছিলেন। এই সময় ইনি অন্নপূর্ণার গৃহে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন ও সংগীত শিক্ষা দিতেন, অন্নপূর্ণার ধর্ম্ম জীবন ইনি প্রথম হইতে এমন অভি-নিবেশ পূর্ব্বক, নিরীক্ষণ করিয়াছেন যে, আর কেহ সেরূপ দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ, অন্নপূর্ণার সরল, বিনীত, স্বভাব, উপাসনাশীলতা, বিনয়, ভক্তি, সত্যপ্রিয়তা, ও তেজস্বিনী বক্তৃতা, গম্ভীর উপাসনা, ও সংগীত সংকীর্ত্তনে, ধর্ম্মালোচনায়

ইনি এমত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এত সন্তান সন্ততি লইয়া, অন্নপূর্ণা, এরূপ উন্নতি কিরূপে করিলেন, ভাবিয়া অবাক হইতেন। ঈশ্বরের বিশেষ করুণায়েই ইঁহাকে উন্নত করিয়াছে, বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন পাঠকগণ, ইঁহার স্বরচিত মন্তব্যেই জানিতে পারিবেন, অন্নপূর্ণাকে ইনি কি ভাবে দর্শন করিতেন।

বাবু কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য— ইনি পণ্ডিত ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধীন চেতা, অমায়িক স্বভাবের জন্য প্রসিদ্ধ। ইনি যখন বগুড়ায় বাস করিতেন, তখন অন্নপূর্ণাকে বিশেষ রূপে জানি-তেন, অন্নপূর্ণার গৃহে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন, অন্নপূর্ণার মহৎ জীবনের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। অন্নপূর্ণার সহিত তর্ক ও আলোচনা করিয়া, ইনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অন্নপূর্ণার হৃদয়ে যেরূপ মহতী শক্তি রহিয়াছে, তাহাতে কেবল নারী হৃদয় কেন, মহোচ্চ পুরুষ হৃদয়ের সহিত তুলনা করিলেও, অন্নপূর্ণা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন। পাঠকগণ, ইঁহার স্বরচিত মন্তব্যেই অন্তরের ভাব বিশেষ রূপে জানিতে পারিবেন।

বাবু পূর্ণ চন্দ্র গুহ,—ইনি আমার এক জন সহধ্যায়ী বন্ধু, অন্নপূর্ণাকে ইনি বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিশেষ রূপ জানিতে পারেন। ঢাকায় যখন আমি অবস্থিতি করি, তখন অন্নপূর্ণার সহিত ইঁহার সাক্ষাৎকার আলাপ হয়। তখন অন্নপূর্ণার ধর্ম্ম-প্রবলতা, তেজস্বিনী৷ সম্মার্জ্জিত বুদ্ধি, ও স্মরণ শক্তির পরিচয় পাইয়া, অন্নপূর্ণাকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপাসনা প্রণালী শিক্ষা দান করেন। সেই ধর্ম্ম-বীজ, অঙ্কুরিত হইয়া, কালে বটবৃক্ষের ন্যায় সুবিস্তৃত হওতঃ, যখন অন্নপূর্ণার হৃদয় সত্যের আবাসস্থল হইয়াছিল তখন পূর্ণ বাবু সংসারের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হইয়া,

ঈশ্বরের প্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতে ছিলেন, তখন কলিকাতা নগরে অন্নপূর্ণার সহিত সাক্ষাৎ হয়, অন্নপূর্ণা তাঁহার হৃদয়ের এতাদৃশ দুরাবস্থা দর্শনে, সাতিশয় করুণার্দ্র হন, এবং নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে, বগুড়ার বাসস্থলে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। তিনিও তাঁহার অনুরোধ ত্যাগ করিতে না পারিয়া যাইতে স্বীকৃত হন। এবং কিছুকাল পরে বগুড়ায় উপস্থিত হইয়া, দীর্ঘকাল একত্র বাস করেন। অন্নপূর্ণার উন্নত হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া ইনি, তাঁহার গুণের একান্ত পক্ষপাতী হন। আমার সঙ্গে প্রথম বন্ধুতা জন্মিলেও, অন্নপূর্ণাই বন্ধুতার শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করেন। পূর্ণ বাবু অন্নপূর্ণার অত্যাশ্চর্য্য মহীয়সী শক্তিতে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অন্নপূর্ণাকে তিনি বঙ্গ নারী সমাজে উচ্চতম স্থানে, স্থান দান করিয়া, একান্ত সুখী হইতেন। পাঠকগণ, ইঁহার স্বরচিত মন্তব্যে, অন্তরের গুঢ়তম ভাব জানিতে পারিবেন।

বাবু বরদা নাথ হালদার,—ইনি এক জন সুশিক্ষিত স্বদেশ-হিতৈষী ধর্ম্ম পরায়ণ, স্বাধীন চেতা লোক, বগুড়া বাস করিবার সময়, অন্নপূর্ণার সহিত প্রায় প্রতি দিনই, তর্ক ও ধর্ম্মালোচনা ও উপদেশাদি করিতেন। অন্নপূর্ণার জীবনের গতি ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চতম সীমায় অবাধে উঠিতে পারিবে, এরূপ বল তাঁহার অন্তরে দেখিয়া, তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। এবং তাহার স্বগণ, ও স্বদেশী ও বিদেশী বন্ধুগণের নিকট অন্ন-পূর্ণাকে বিশেষ রূপে পরিচয় করিয়া দিয়াছেন, এই জন্য বগুড়াব ন্যায় ক্ষুদ্র স্থানে বাস করিয়াও, বঙ্গ দেশের প্রধান প্রধান ব্রাহ্ম ও সুশিক্ষিত নর নারী দিগের নিকট সুপরিচিতা হইয়াছিলেন।

পাঠকগণ ইঁহার স্বরচিত মন্তব্যেই ইঁহার মনের ভাব বিশেষ রূপে জানিতে পারিবেন।

৮ শ্রীনাথ দে হেডপণ্ডিত বগুড়া মডেলস্কুল—ইনি এক জন চরিত্রবান বুদ্ধিমান সংসারাভিজ্ঞ বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ইঁহার সদয় ব্যবহারে অন্নপূর্ণা বিশেষ বাধ্য ছিলেন। অন্নপূর্ণার তেজস্বিনী বুদ্ধি ও মেধা শক্তি ও বিচক্ষণতা দেখিয়া ইনি স্বইচ্ছায় অন্নপূর্ণাকে পড়াইতে প্রবৃত্ত হন এবং যত দিন নিজের সাংসারিক কার্য্যের ব্যাঘাত উপস্থিত না হইয়াছিল ততদিন নিস্বার্থ ভাবে বিনা বেতনে আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে পড়াইয়া ছিলেন। অন্নপূর্ণার উপাসনা প্রবন্ধ ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা শুনিয়া ইনি বিশেষ সুখী হইতেন এবং ক্রমশঃ অন্নপূর্ণার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিতে আরম্ভ হয়। তিনি প্রায় প্রতি রোজ অন্নপূর্ণার সহিত আলাপ করিতে আসিতেন। এবং আলাপ করিয়া হৃদয়ে কিছু অমূল্য তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া অনুভব করিতেন।

যখন সংসার উত্তাপে উত্তপ্ত হইতেন তখন শান্তি লাভার্থে অন্নপূর্ণার কুটীরে আসিতেন এবং তাঁহার সহিত ক্ষণকাল আলাপ করিয়া সমস্ত ভুলিয়া যাইতেন। তিনি অনেক সময় অন্নপূর্ণাকে সীতা, সাবিত্রী, ও দময়ন্তীর ন্যায় ধার্ম্মিকা মনে করিতেন ও সময় সময় আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিতেন। অন্নপূর্ণার মৃত্যু সময়ে শ্রীনাথ বাবু ও রাম বাবু এই নিঃসহায় পরিবারের প্রকৃত অভিভাবক হইয়া সমস্ত রজনী যাপন করিয়াছিলেন এবং শ্রীনাথ বাবু মৃত দেহ ধারণ করিয়া সমাধি ক্ষেত্রে শবদেহ পহুছিলে দুঃখের সহিত চলিয়া যান। এবং বিশৃঙ্খলা-

ম্বিত এই দুস্থ পরিবারের সতত তত্ত্বাবধান ও সন্তান দিগকে নানা প্রকার সুখাদ্য ফল ও সুখদ বস্তু নিচয় সময় সময় পাঠাইয়া পরম প্রীতি সম্পাদন করিয়াছেন যখন অন্নপূর্ণার স্বামী উন্মাদ রোগ গ্রস্থ হইল তখনি এই পরিবারের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান ও মঙ্গল কামনা ও হিত সাধন করিয়া বাধিত করিয়াছেন এবং অন্নপূর্ণার পতিকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া ষোড়শোপচারে আহারাদি প্রদান ও সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন ফল কথা মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই পরিবারের হিত কামনা ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হন নাই। ইহাই তাঁহার মহৎ জীবনের প্রকৃত দৃষ্টান্ত আমরা দুঃখের সহিত পাঠকগণকে জানাইতেছি যে অন্নপূর্ণার স্বামী আরোগ্য হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই অন্নপূর্ণা চরিত লিখিবার সময়ে যদিও শ্রীনাথ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু রাজ কুমার দে দ্বারায় বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিল তথাপি শ্রীনাথ বাবুর অভাব ভুলিতে পারে নাই।

বাবু আদি নাথ চট্টোপাধ্যায়—ইনি পণ্ডিত ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক। চরিত্রবান ধর্ম্ম ভীরু লোক। ইনি প্রচারোপলক্ষে বগুড়ায় অন্নপূর্ণার গৃহে আসিয়া বাস করেন। ইনি অন্নপূর্ণার অমায়িক সরল স্বভাব দেখিয়া বলিয়া ছিলেন, যে এই গৃহ আপনার গৃহের ন্যায় বোধ হইতেছে। অন্নপূর্ণার নানা প্রকার শক্তি থাকিলেও তিনি অতিথি সেবা ও বন্ধুগণের সেবায় এমন নিবিষ্ট থাকিতেন যে চাকর চাকরানীর বিন্দু মাত্র সাহায্য লইতে ইচ্ছা করিতেন না। অথচ তাঁহার সকলই ছিল। কোন বন্ধু গৃহে আসিলে অন্নপূর্ণার অন্তরে অতীব আনন্দের খেলা খেলিত। তিনি মনে করিতেন যেন তাঁহার সহোদর ভ্রাতা

বহু দিবস পরে বিদেশ হইতে বাটীতে আগত হইয়াছেন। ঈদৃশ ভাব তিনি এক জন কিম্বা দুই জনের প্রতি দেখান নাই মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতি নিয়ত এই রূপ ভাব লক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার অকৃত্রিম প্রেমে আদি নাথ বাবু তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা অসম্ভব কি? তৎপর নানা দুর্ঘটনার সময়েও আদি নাথ বাবু আপনার ভগিনীর দুঃখের ন্যায় তাহা অপনোদনের জন্য প্রাণ পণে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। অন্নপূর্ণার মৃত্যুর পরে তাঁহার সন্তান দিগকে লইয়া কলিকাতা গিয়া দুই বৎসর কাল অতীব যত্নের সহিত প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষন এবং সুশিক্ষা দান করিয়াছেন। এই রূপ অভিন্ন ভাব আদি নাথ বাবুর যদিও স্বভাবসিদ্ধ তথাপি অন্নপূর্ণার শ্রদ্ধাতে যে আরও আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই, পাঠক গণ তাঁহার স্বরচিত মন্তব্যে বিশেষ জানিতে পারিবেন।

বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়—ইনি এক জন সুশিক্ষিত ধর্ম্ম পরায়ণ, উদারচেতা প্রচারক ইনি অন্নপূর্ণার গৃহে, প্রচার উপলক্ষে আসিয়া কিছু কাল বাস করেন। অন্নপূর্ণার অকৃত্রিম প্রেম, ও মহোচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে থাকেন। অন্নপূর্ণার অকৃত্রিম অতিথি সেবায় ইনি এমন মুগ্ধ হন যে, অন্নপূর্ণা নারী কুলে ধন্য বলিয়া, তিনি অনেকের নিকট পরিচয় দান করিয়াছেন। পাঠকগণ তাঁহার স্বরচিত মন্তব্যেই তাহা জানিতে পারিবেন।

অন্নপূর্ণার বন্ধুগণের স্ব স্ব মন্তব্য।

পাঠকগণ! এই অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন যে, অন্নপূর্ণা জনসমাজের সহিত মিশ্রিত হইয়া কিরূপ সদ্ব্যবহার দ্বারা, সকলের ভক্তির পাত্রী হইয়াছিলেন এবং জনসমাজ তাঁহার প্রতি কিরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণের মন্তব্য প্রকাশ হইতে চলিল। যাঁহারা এই সময় মন্তব্য না দিবেন তাঁহাদের মন্তব্য যদি পুস্তক সমাপ্তির পূর্ব্বে দেন তবে পরিশিষ্টে দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক মন্তব্যের নিম্নে মন্তব্য কারীর নাম দেখিয়াই চিনিতে পারিবেন।

২০ শ্রাবণ। ১২৯৮

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

যে দিন অন্নপূর্ণা দেবীর পার্থিব দেহ হইতে স্বর্গীয় আত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, সে দিন হৃদয়ে যে ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলাম তাহা কি বলিব। তাঁহার শেষ জীবনের ৮।৯ বৎসর আমার সহিত পরিচয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে সমস্ত গুন থাকিলে মানব মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শে উপনীত হইতে পারে, অন্নপূর্ণা দেবী পূর্ন ভাবে সেই সমস্ত গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি বর্ত্তমান হিন্দু মহিলাগণের আদর্শ। আমি তাঁহাকে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতেই দেখিয়াছি। যখন বিপদ রাশি ঘনীভূত হইয়া জীবনাকাশ অন্ধকার করিয়াছিল, তখনও তাঁহার বিশ্বাস বিচলিত হয় নাই, অথবা নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরে নির্ভর হইতে স্খলিত করিতে পারে নাই। স্বামীর প্রতি তাঁহার যতদূর ভক্তি ও আস্থা দেখিয়াছি, তদ্রূপ অন্য কোথাও

দেখিয়াছি, এমন স্মরণ হয় না। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ন্যায় বিদুষী ও মার্জ্জিত বুদ্ধি রমণী সচরাচর এদেশে দৃষ্ট হয় না। যখন তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছি, তখন কোন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষের সহিত আলাপে যত আনন্দ পাওয়া যায়, সেই রূপ আনন্দ পাইয়াছি। তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা, বিশ্বাসের তেজ, ভক্তির উচ্ছাস, ও আধ্যাত্মিকতা দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়াছি। আমি এ কথা অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি যে তাঁহারই বুদ্ধিমত্তা ও চরিত্র প্রভাবে আপনার এবং আপনার পুত্র কন্যা ও পরিজন বর্গের অনেক উন্নতি হইয়াছে, যাহা এ বঙ্গ সংসারে সচরাচর দেখিতে পাই না। সচরাচর উচ্চ বংশীয় হিন্দু রমণীগণ নীচ জাতি কি অপর ধর্ম্মাবলম্বী দেখিলে যেমন ঘৃণা করিয়া থাকেন, এবং তাহাদিগের স্পর্শে যেরূপ শরীর অশুচি মনে করেন, অন্নপূর্ণা দেবীর সেরূপ ভাব আমি কখনও দেখি নাই। সাম্য তাঁহার নিকট কেবল পুস্তকের শিক্ষা বা বক্তৃতার উচ্ছাস ছিল না। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অতি হীন ব্যক্তিকেও নিজের পুত্র কন্যার ন্যায় মনে করিতেন। বরং এজন্য তাঁহার বন্ধুরা অনেক সময়ে বিরক্ত হইয়াছেন।

এত অল্প বয়সে তাঁহাকে হারাইয়া বগুড়ার ব্রাহ্ম সমাজ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা যে কত দিনে পূর্ণ হইবে, কে বলিতে পারে? জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা, যেন তিনি তাঁহার স্বর্গীয় আত্মাকে সেই শান্তি নিকেতনে অপার সুখ সম্ভোগে অধিকারিণী করেন।

বিনয়াবনত

শ্রীপ্যারি শঙ্কর দাস গুপ্ত।

ওঁ তৎসৎ

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্

পূজ্যপাদা শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ার সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

তিনি স্বয়ং * আমাদের নিকট এই গল্পটী বলিয়াছিলেন। প্রথম যখন তাঁহার হিন্দু পৌত্তলিকতাতে অবিশ্বাস জন্মে, তখন তাঁহার বয়স খুব অল্পই ছিল। সে সময় এক দিন তাঁহাদের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা ও হরির লুট হয়, তিনি তাঁহার সমবয়স্কা একটী মেয়েকে বলিলেন, দেখ, এসব কিছু নয়, সব মিথ্যা, বৃথা উহাদের পূজা করা হয়, উহাদের কোন ক্ষমতা নাই। অবশ্য অন্য মেয়েটী সহজে সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য তিনি আবার বলিলেন। দেখ, এই মতে পূজার আয়োজন রয়েছে পূজার পূর্ব্বে এসকল ধরিতে অথবা খাইতে নিষেধ আছে, তাহাতে অনিষ্ট হবে বলে কিন্তু এসব মিথ্যা, এখনই এস, আমরা উহা হইতে উঠাইয়া লইয়া কিছু খাই দেখিতে পাইবে কিছু হবে না।

---

* অন্নপূর্ণার বাল্য কালের জীবনী আমাকে তিনি নিজে অনেক সময় অনেক প্রকার বলিয়াছেন কিন্তু এই গল্প কখন আমার নিকট বলেন নাই। অন্নপূর্ণার বলিবার ভাষার সঙ্গে ঐ গল্পের ভাষার সাদৃশ্য নাই সুতরাং বরদা বাবুর লিখিত গল্পের দায়ীত্ব তাঁহার উপর রহিল। আমি উহার কিছু মাত্র অনুমোদন করি না।

গ্রন্থকার।

ক্ষমতা থাকিলে দেবতারা আমাদের অবশ্যই শাস্তি দিবেন। অবশেষে এই ভাবে দেবতার পরীক্ষা করাই স্থির হইল। উভয়েই দেবতার ভোগ হইতে অগ্রভাগ গ্রহণ করিলেন। পরদিন যখন দেখা গেল কাহারই কিছু হয় নাই তখন পূর্ব্ব বিশ্বাস খুবই দৃঢ় হইল। এই গল্পটী বলিবার সময় তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, এই ভাবে পরীক্ষা করা ভাল হয় নাই। যদি ঘটনাক্রমে কোন রূপ ব্যারাম হইত, তবে উচ্চ বিশ্বাসটী একেবারেই বিলোপ হইত ওরূপ পরীক্ষা করাতে মহা বিপদ ছিল।

তাঁহার চরিত্র ও জীবন সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব। যিনিই তাঁহার সঙ্গে মিশেছেন তিনি তাঁহার বিশেষ পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। আমি যখন তাঁহাকে প্রথম দেখি তখন তিনি উন্মাদ রোগ গ্রস্থ স্বামীর পার্শ্বে শুশ্রূষাতে নিরতা। তখন তিনি ঘোর বিপদে পতিতা, ঘোর দারিদ্রে নিমগ্না তখন তাঁহাকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সমস্ত পরিবার সহিত অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এই অবস্থাতে একটী নারী, যে, অত্যন্ত শোকাভিভূতা হইবেন, তাঁহার প্রাণে যে ভয়ানক অশান্তির আগুণ জ্বলিবে সহজেই অনুমিত হয়। কিন্তু এখানে কি তাহাই দেখিলাম? না, প্রথমেই তাঁহার শান্ত স্থির মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তাঁহাকে দেখিয়া বুঝা যায় না যে, তিনি এত বিপদে পতিতা, বরং ইহাই বোধ হয় যে তিনি যেন পূর্ব্ব অবস্থাতেই আছেন। তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হয় এ জগতের কিছু যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

এ অবস্থাতে পড়েও কোনও কোনও স্ত্রী আত্মীয়ার নিকট তাঁহাকে খারাপ ব্যবহার পাইতে হইয়াছে। তাঁহাদের বাড়ীর কেহ কেহ আমাকে একথা বলিয়াছিলেন, তিনি নিজেও এক দিন স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এসকল বিষয় তাঁহার প্রাণকে এক দিনের তরেও বিচলিত করিতে পারে নাই। স্বামী এই ব্যারামের অবস্থাতেও যখন যে রূপ বলিতেন, তিনি তাহা সমস্তই করিতেন কখনও তাঁহাকে কষ্ট দেন নাই। স্বামীর সন্তোষের জন্য তিনি সকল প্রকার কষ্টই সহ্য করিতেন পঞ্চসার হইতে ঢাকা যাওয়ার সময় চাটুয্যা মহাশয়ের ঝোঁক উঠিল যে তিনি কোন মতেই যাইবেন না। তাঁহাকে না জানাইয়া সব বন্দোবস্ত করাতে তিনি অত্যন্ত চটে গিয়াছিলেন। আমাদিগকে গোপনে বন্দোবস্ত করিতে দেখে আরও চটে গেলেন। কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন যে বেঁধে নৌকাতে উঠান হউক। কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবী তাহাতে কোন মতেই স্বীকৃতা হলেন না। ইহার পূর্ব্বে নিজ বাটীতে এক দিন এবং পঞ্চসার এক দিন এই দুই দিন বেঁধে রাখাতে স্বামী যে কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাহা স্মরণ করে তিনি কোন মতেই এবিষয়ে মত দিলেন না। ইহার পূর্ব্বে চাটুয্যা মহাশয় খুব বেশী খেপিয়া ছিলেন। এক দিন তিনি স্বয়ং ও ছোট ছেলে সুহৃদ গুরুতর রূপে আঘাত প্রাপ্ত হন। চাটুয্যা মহাশয় পূর্ব্বে আর মারেন নাই। সে দিন প্রাতে যাওয়া স্থগিত রাখিতে হইল। বৈকালে একটী বন্ধু চাটুয্যা মহাশয়কে ভুলাইয়া নদীর পাড়ে লয়ে যাইতে সক্ষম হন, কিন্তু সকলে উপস্থিত হইলে বলেন যে তিনি নৌকাতে যাবেন না। কাপড়াদি সমস্ত

নৌকাতে রয়েছে; নৌকা একটু দূরে নৌকার জন্য অপেক্ষা করিলে জাহাজের সময় যায় মহাশঙ্কট। কিন্তু পতির সন্তোষের জন্য তিনি সবই করিতে পারেন, তাই সেই ভাবে যাইতেই স্বীকৃতা হলেন সেই ভাবেই যেয়ে ঢাকাতে পৌঁছছা হইল। ঢাকা থাকিতে এক দিন অন্ধকার রাত্রিতে সকলকে বাসা হইতে এক নৌকাতে লয়ে যাইতে চাটুয্যা মহাশয় জেদ করিতে লাগিলেন। সেখানে নানা প্রকার ভয়ের কারণ ছিল, কিন্তু তথাপি পতির সন্তোষের জন্য তাহাতেই সম্মতা হলেন এবং সেখানে অনেক কষ্ট ও পাইতে হয়। আমি বাড়ী থাকিতে অন্নপূর্ণা দেবীর এক পত্র পাই তাহাতে জানিলাম চাটুয্যা মহাশয় হঠাৎ বাসা হইতে কোন দিকে চলে গিয়াছেন কোনই খবর পাওয়া যায় না। সেই ভয়ানক বিপদের সময় ও তাঁহার যেরূপ ধৈর্য্য ও নির্ভরের ভাব লক্ষ্য করিলাম তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া যাই। সে সময় ও মঙ্গলময়ে সম্পূর্ণ নির্ভর এবং সে জন্য নিশ্চিন্ত। কিছু দিন পর পুলিষ লুনাটিক এসাইলামে দেওয়ার জন্য চাটুয্যা মহাশয়কে ধরে লয়। এই রূপ ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাঁহার প্রাণে যে কি কষ্ট হয় তাহা ব্যক্ত করা যায় না কিন্তু মঙ্গলময়ে জীবন্ত নির্ভর গতিকে, সে সকলই তিনি সহ্য করিলেন। সে কষ্ট তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিল না। ইহার কিছু দিন পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রবল জ্বর রোগাক্রান্তা হয়, সে সময় বাড়ীতে একটী মাত্র পুরুষ ছিল না, বিশেষ পরিচিত আত্মীয় কেহ ছিল না। অবশ্য ব্রাহ্ম বন্ধুগণ সর্ব্বদা খবর লইতেন ও সাহায্য করিতেন। আমি বাড়ী হইতে যেয়ে এই অবস্থা দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাঁহাতে

কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে দেখিতে পাইলাম না। তিনি সেইরূপ নির্ভরের সহিত স্থির প্রাণে সমস্ত কাজ করিয়া যাইতেছেন। আবার অন্যান্য ছেলে পেলেদের ও অনেকের ফোঁট ইত্যাদি হইতে থাকে ছোট ছেলেটী আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়। কন্যার ও তিন সপ্তাহ যাবৎ প্রবল জর। জরের বিরাম নাই, মাথার প্রবল যাতনা ভয়ানক অবস্থা। আবার ও দিকে স্বামী জেল হাঁসপাতালে থাকিয়া জজ সাহেবের নিকট এরূপ ভাবে সব কথা বলেছেন যে জজ সাহেবের বিশ্বাস জন্মেছে, তিনি পাগল নন, স্ত্রী ও অন্যান্য লোক ষড় যন্ত্র করে তাঁহাকে জেলে দিয়াছে। জজ সাহেব ছেড়ে দেওয়ার হুকুম দিলেন। কিন্তু তথনও প্রকৃত রূপ আরোগ্য লাভ করেন নাই ব্যারাম সম্পূর্ণ রয়েছে। এদিকে যেরূপ বিপদ তাহাতে স্বামীকে কাছে পাইলে কত উপকার হয় কিন্তু তবুও আরও কিছু দিন হাঁস-পাতালে রাখিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করিতে স্থির করেন। ইহার উপর আরও কষ্ট রয়েছে, এসময় পতি হইতে যে সকল পত্র পাইতে লাগিলেন, তাহা অতীব কষ্ট-দায়ক, তাহাতে স্থির থাকা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তবুও এক দিনের জন্য কোন রূপ বিচলিত ভাব তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয় নাই। এ সময় যে তাঁহাকে আবার গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত তাহা বলিতে হবে না। এসময় তিনি নিয়মিত স্নান আহার করিতে পারিতেন না তাহাতে শরীর ও খুব খারাপ হইয়াছিল। কিন্তু বিষাদের চিহ্ন তাঁহাতে এক দিনের তরেও দেখা যায় নাই। এসময় আমি ৩ টার সময় কলেজ ছুটি হইলে তাঁহাদের ওথানে যাইতাম এবং রাত্রি এগারটা, বারটার

সময় বাসাতে ফিরিতাম। প্রত্যহই তাঁহাকে এ সময়টা ঘুমাইয়া লইতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি কোন মতেই স্বীকৃতা হন নাই। মেয়ের পীড়া অবধি তিনি প্রত্যহ সমস্ত রাত্রি জেগে মেয়ের শুশ্রূষা করিতেন। এক দিন হঠাৎ তিনি বলিলেন যে বড় শীত হইতেছে, জর জর বোধ হইতেছে। আমি লেপ দিতেই ভয়ানক কম্প হয়ে জর হইল, এক খানা লেপেও শীত নিবারিত না হওয়াতে, আর এক খানা লেপ দিয়ে জড়াইয়া জোরে ধরে রাখি। কিন্তু তবুও কম্প নিবারিত হয় না, আমার ভারী চিন্তা হইল, প্রায় ১॥ ঘণ্টা পর তিনি উঠিয়া আমাকে বাসায় যাইতে বলিলেন এবং তিনি মেয়ের বিছানার পাশে যেয়ে বসিলেন আমি ঘুমাইতে কত অনুরোধ করিলাম কিন্তু কোন মতেই তাহাতে স্বীকৃতা হলেন না। সে দিন আমি রাত্রি প্রায় ২ টা পর্য্যন্ত থাকি, যখন দেখিলাম তাঁহাকে কোন মতেই মত লওয়াইতে পারিলাম না তখন অগত্যা ভার হৃদয়ে বাসায় ফিরিলাম। সে দিন ও তাঁহার বদন মণ্ডলে সেই রূপ শান্তি ও নির্ভরের চিহ্ন দেখিলাম। এরূপ জীবন্ত নির্ভর ও বিশ্বাস আর কাহারও জীবনে দেখি নাই। তাঁহার সহিষ্ণুতার তুলনা দেখি না। কার্য্যে কখনও অবসন্নতা পরিলক্ষিত হয় নাই। এ জীবনের সংস্পর্শে আসিলে হৃদয় প্রাণ উন্নত না হয়ে পারে না। আবার তাঁহার সরলতা, বিনয় এবং আড়ম্বর ও বিলাসিতা-শূন্যতা দেখিলে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। তাঁহার ধর্ম্ম জীবন দেখিলে মোহিত না হয়ে থাকা যায় না। তাঁহার নিকটে গেলেই সে জীবনের শক্তি অনুভব করা যাইত। এরূপ উদারতা ও অমায়িকতা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। যে আসিত তাহার

সঙ্গেই তিনি সরল মধুর ভাবে সুন্দর আলাপ করিতেন। ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে, জটিল বিষয় সকল তিনি এমন সুন্দর ভাবে মীমাংসা করিতেন যে তাহা দেখে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার বুদ্ধি শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, তর্কের শক্তি অতীব সুন্দর ছিল ভাষার উপরও অধিকার ছিল। সর্ব্বোপরি তাঁহার জীবন্ত বিশ্বাস ও নির্ভরের তুলনা হয় না।

শ্রীবরদা কান্ত বসু—

(ক) বাড়ীতে থাকিতে তিনি স্বামীর সঙ্গে, সঙ্গে, অনেক স্থলে যাইতেন, যথন যেখানে যাইতে বলিতেন, তথন সেই থানেই গিয়াছেন এজন্ত বাড়ীতে অনেকে মন্দ ও বলিয়াছে। অনেকে বলেছেন যে এরূপ যাতায়াতেই চাটুয্যা মহাশয় বাড়ী হইতে চলে যান, তিনি না গেলে আপনা হইতেই ফিরে আসিবেন।

বরদা—

ওঁ তৎসৎ

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্

আরাধ্যতমা স্বর্গীয়া স্নেহময়ী মাতৃদেবী।

মার কথা কি লিখিব? লিখিয়া মার জীবনের মহত্ব এবং সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করা অসম্ভব। তাঁহার জীবন কিরূপ মধুরতা পবিত্রতা, দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য্য এবং তেজ পরিপূর্ণ ছিল, তাহা আমি কিছুতেই ব্যক্ত করিতে পারি না। জীবন্ত মঙ্গলময়, প্রেমময়-দেবতার জীবন্ত আবির্ভাবে, তাঁহার মধুর সম্মিলনে, তাঁহার জীবন, চরিত্র, বাক্য, কার্য্য, ব্যবহার, এমনই এক অপূর্ব্ব জ্যোতি-পূর্ণ ছিল ; যে তাহা কেবল প্রাণে অনুভব করিতে পারা যায় অন্য কিছুতে ব্যক্ত করা যায় না। পরমেশ্বরে তাঁহার যোগ

এত গভীর ছিল, তাঁহার মধ্যে সেই প্রিয়তম পরমেশ্বরের প্রেম-ভাড়িত এতই পূর্ণ ছিল যে, যখনই তাঁহার নিকট যাওয়া যাইত, তখনই হৃদয়ে সেই পরমেশ্বরের, মার সেই পরমারাধ্য প্রিয়তম দেবতার, আকর্ষণ অনুভব করা যাইত, এবং এখনও যখন মার কথা মনে হয়, অমনি সেই সঙ্গে, সঙ্গে, তাঁহার প্রিয়তম পরমেশ্বর প্রাণে আসিয়া উপস্থিত হন। মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে ভাল বাসিলে তাঁহার একান্ত অনুগত হইলে প্রাণ যেরূপ হয়, যাহা আমরা বিশ্বাসী ভক্ত জীবনে দেখিতে পাই, তাঁহার প্রাণ ঠিক সেই রূপ ছিল। ইহা ভিন্ন মার জীবন আর কিছুতে ব্যক্ত করিতে পারি না। আমরা অনেক সময় তাঁহার কাজ বা ব্যবহারের উচ্চ ভাব নিজেদের হীনতার জন্য বুঝিতে পারিতাম না।

দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগের মধ্যে তিনি যেরূপ স্থির, শান্ত ও বিশ্বাসীর মত রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন তাহা অতি আশ্চর্য্য। অনেক সময় নিজের রোগ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া অন্যান্য সকলের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ও যে পর্য্যন্ত কথা বলিবার শক্তি ছিল, অন্যের কষ্টের জন্যই ব্যাকুল থাকিতেন, সকলের সংবাদ রাখিতেন। তাঁহার জন্য খাটিয়া যে আমাদের কষ্ট হইত তাহাতেই বেশী কষ্ট বোধ করিতেন। রোগ যন্ত্রণা নীরবেই সহ্য করিতেন দেখিয়া কেহ যন্ত্রণা আছে এরূপ বুঝিতে পারিত না। ব্যারাম যতই বেশী দিনের হইতে চলিল কথা ততই কম বলিতে লাগিলেন। নীরব এবং স্থির, গম্ভীর, প্রশান্ত ভাবে যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন এই রূপ বোধ হইত। কেবল নিজের

ব্যারাম নয়, সেই সময়ে আবার বাবার উন্মাদ রোগ জানিতে পারিলেন। তখন কি ভয়ানক অবস্থা! সেই অবস্থাতেও সম্পূর্ণ স্থির ভাবে সব সহ্য করিয়াছেন। ৪ ঠা বৈশাখ হইতে আমাদের উৎসব আরম্ভ হয় সেই সময়ে খুব খারাপ অবস্থা, উত্থান শক্তি রহিত প্রায়, ধরিয়া লইতে হয়। সেই অবস্থাতেও উৎসবে যোগ দিয়াছেন। ক্রমে অবস্থা আরও খারাপ হইতে লাগিল। আবার বাবার উন্মাদ রোগও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বুঝিতে পারিলেন কিরূপ অবস্থায় আমাদিগকে ফেলিয়া তাঁহার যাইতে হইবে। সবই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু সেই স্থির প্রশান্ত মূর্ত্তি কিছুই পরিবর্ত্তিত হইল না। আমাদের প্রাণ ও তাঁহার জীবনের আশঙ্কায় খুব ব্যাকুল হইল। এক দিন মার পায়ে তেল দিতে, দিতে, অতি কষ্টে হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিয়া মাকে বলিলাম, "মা, আপনিত যাইবেন, আমাদের কি বলিয়া যাইবেন, আমরা কি ভাবে চলিব"। বলিয়া আর কান্না রাখিতে পারিলাম না। মা বলিলেন কাঁদিতেছ কেন কাঁদিও না। মার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি সেই স্থির গম্ভীর প্রশান্ত ভাব, সেইরূপ প্রশান্ত জ্যোতিপূর্ণ মুখ আর দেখি নাই, দেখিব না। তার পর মা তাঁহার সেই ক্ষীণ স্বরে ধীরে ধীরে এই তাঁহার শেষ উপদেশ ও আদেশ দিলেন যে,—"তোমাদের শরীরের রক্ত যেমন তেজ বিশিষ্ট, ঈশ্বর কৃপায় তোমরা যে উৎসাহ তেজ ও কার্য্যের জীবন পাইয়াছ এই তেজ, এই উৎ-সাহ, এই বল, সংসারের সহস্র বাধা বিঘ্ন শোক এবং দুঃখ কষ্টে যেন বিন্দু মাত্র হ্রাস না হয়, সর্ব্বদা প্রফুল্ল অন্তরে আনন্দের সহিত বিশ্বাসী, নির্ভরশীল ও সহিষ্ণুর ন্যায় প্রাণারামের

আদেশ পালন করিয়া যাও। আর কিছু দেখিওনা, তাঁহাকে জীবন মন প্রাণ অর্পন করিয়া, তাঁহার বলে জীবন পথ অতিক্রম কর, সংসারের ছার সুখ, দুঃখ, শোক ও তাপের অতীত পথ আশ্রয় কর, তাঁহার হও"। মার এই অন্তিম আদেশ, ও উপদেশেই মার জীবনের জ্যোতি সকলে বুঝিতে পারিবেন। মার জীবন আমি ধারণা করিতেও অক্ষম, এবং যাহা ধারণা করিতে পারি, তাহা ব্যক্ত করিবার শক্তি নাই। আর কি বলিব। তাহার পরে কিম্বা পূর্ব্বে, মা আমাকে আর কোন কথা বলিয়া যান নাই। এই তাঁহার অন্তিম আদেশ। মার এই আদেশই আমার জীবনের অবলম্বন হইয়াছে, এই আদেশ যে পর্য্যন্ত পূর্ণ ভাবে প্রতিপালন করিতে না পারি; সেই পর্য্যন্তই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে। আদেশ পূর্ণ হইলেই পৃথিবী হইতে যাইব। এই আদেশ ভিন্ন আমি তাঁহার যাওয়ার পরে কখনই এত দিন থাকিতে পারিতাম না। যখনই দুঃখ, শোকে, প্রাণ অধীর হইয়াছে, অমনি তখনই মার আদেশ সাক্ষাৎ জীবন্ত মাতৃরূপে তাঁহার প্রিয়তম প্রাণারামকে সঙ্গে লইয়া আমার প্রাণে উপস্থিত হইয়া, দুঃখ, শোক, দূর করিয়া বল দিয়াছে। এই মাতৃরূপী আদেশই তাঁহার বিচ্ছেদে এই পৃথিবীতে থাকিবার, এক মাত্র অবলম্বন, প্রাণের নিত্য সঙ্গী, বলিব কি এই আদেশই আমার কায়মনপ্রাণের রক্ষক। এই আদেশ কিরূপ তাহা আমি ব্যক্ত করিতে পারি না। কেবল নিজ প্রাণেই বুঝিতে পারি ইহা কিরূপ ভাবে আমার জীবন, মন, প্রাণে কার্য্য করিতেছে, বল বিধান করিতেছে; এবং আমাকে ঈশ্বরবিচ্যুতি, পাপ, ও মলিনতা হইতে কিরূপ জীবন্ত ভাবে রক্ষা করিতে নিযুক্ত

রহিয়াছে। মা, গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার জীবন এবং অন্তিম আদেশ সর্ব্বদাই প্রাণে রহিয়াছে। তিনি গিয়াছেন কোথায়? দূরে গিয়াছেন? না তাহাত বোধ হয় না, সর্ব্বদাই নিকটে আছেন তিনি তাঁহার আদেশ এবং তাঁহার প্রিয়তম প্রাণারাম আমার জীবনের অবলম্বন শান্তি ও আরামের স্থান।

সুশীলা।

নারী হৃদয় পবিত্র ধর্ম্মানুরাগিনী হইলে যে কি আশ্চর্য্য শান্তির আলয় হইয়া থাকে তাহা অন্নপূর্ণার চরিত্রের দ্বারায় সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এ চরিত্র খানি যে কয়েকটী উজ্জল ধর্ম্মভাব দ্বারা বিশেষ রূপে বিকসিত হইয়াছে, তাহা অতীব মনোহর এবং অনুকরণীয়।

বৈরাগ্য প্রেমও নিস্পৃহ ভাব এবং প্রতিভা নারী হৃদয়ে একত্র সমাবেশ হইলে স্বর্গের কি মনোহর চিত্র প্রকাশিত হয়, তাহা তাঁহার জীবনে বেশ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার জীবন-কুসুমের সৌন্দর্য্যে অনেকে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার প্রেমময় জীবনের এবং বিনয় পূর্ণ চরিত্রের মধুরতা অনেককে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। আমিও তাহার মধ্যে এক জন। এই হেতু এ চরিত্র আমার বড় শ্রদ্ধার ও ভক্তির আস্পদ ইঁহার সহিত আলাপ হওয়াবধি তাঁহার স্নেহ ও সরল প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছি। ইঁহাদের পবিত্র সহবাস ও মধুর ব্যবহারে প্রাণে অনমুভূত রূপে ধর্ম্মের উচ্চ ভাব ও পিপাসা প্রাণে সঞ্চারিত হইয়াছে। এ জীবন বড় পবিত্র উচ্চ জীবন, এমন স্বার্থ শূন্য নারী হৃদয় বড় দুর্ল্লভ। পরসেবা ইঁহার জীবনের এক প্রধান ব্রত। এ জীবন আড়ম্বর হীন, জাঁক জমক শূন্য। নীরবে

ধীরে, ধীরে, জীবন দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছেন। এই প্রকার নীরবে প্রচার অতি মনোহর।

ইঁহার দীনতার ছবি বড় চমৎকার, অনেক জীবনের দীনতা দেখিয়াছি কিন্তু এমন তর বিনয় আর কোথায় দেখি নাই। কি জানি কি এক প্রকার বিশেষত্ব পূর্ণ ভাব ইঁহার চরিত্রের সর্ব্বাংশে প্রতি ফলিত হইয়া রহিয়াছে।

এ জীবনের বৈরাগ্য ও অতি বিচিত্র। তাঁহার ব্যবহার আচরণ আলাপ ও প্রত্যেক ব্যাপার বিচিত্র বৈরাগ্যের আভায় আলোকিত হইত। এমন অনাসক্ত বৈরাগ্য বঙ্গরমণীর হৃদয়ে এক নূতন ব্যাপার বলিয়া মনে হয়, কি আহার, কি পরিধান সর্ব্ব বিষয়ে আশ্চর্য্য নিস্পৃহ ভাব দেখিয়া সকলে অবাক হইত।

আর একটি পদার্থ এ জীবনে আছে সেটী নির্ভরশীলতা প্রকৃত বিশ্বাসীদের যে প্রকার নির্ভরের ভাব দেখা যায়, এ জীবনে তাহা প্রচুর রূপে দেখা গিয়াছে। এ পরিবারের ভৃত্য ও সন্তান গণের প্রতি সমভাব দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার উপাসনা ও সারমন উপাসকের প্রাণে গম্ভীর, সরল ধর্ম্মের উচ্চভাব অঙ্কুরিত করিয়া দিত। এ জন্য কেহ কেহ তাঁহার নিজের উপাসনা নয়, বলিয়া সন্দেহ করিত। গল্পচ্ছলে তিনি এক দিন বলিয়াছেন যে, "সংসারে কেবল দুইটী ঘটনা আমাকে দুঃখ দিতে পারে। এক স্বামীর বিষন্ন মুখছবি ও আর অমূলক নিন্দা, ইহা ব্যতীত জগতে আমাকে কোন ঘটনায় ম্লান করিতে পারে না।" পতি ভক্তির কি আশ্চর্য্য

দৃষ্টান্ত! স্বামীর দুঃখ দেখিলে তাঁহার প্রাণে বাস্তবিক শেল-সম বিদ্ধ হইত। বাস্তবিক ইনি একটী আদর্শ সতী নারী।

শ্রীযাদব চন্দ্র ব্রহ্ম সন্তান

বগুড়া।

অন্নপূর্ণা দেবীর স্মৃতি।

দেবী অন্নপূর্ণা আর ইহ জগতে নাই। কিন্তু তিনি সদা আমার হৃদয়ে জাগরিতা। তাঁহার বিলাসিতা হীন সৌম্য মূর্ত্তি, প্রখর বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ প্রতিভা সদা আমার প্রাণে জাগিতেছে। বলিতে কি, আমার ভাগ্যে যদি তাঁহার দর্শন না ঘটিত, এবং তিনি যদি এহৃদয়কে প্রীতি মুগ্ধ না করিতেন, আমার হৃদয়ে স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে, উচ্চ ধারণা কখনও স্থান পাইত না। আমার বিশ্বাস, তাঁহার জন্মে বঙ্গ ভূমির অবলাবৃন্দের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে অন্ততঃ আমার নিকট অবলাকুল চির কালের জন্য গভীর ভক্তির পাত্রী হইয়াছেন।

দেবী অন্নপূর্ণা প্রকৃতই দেবী ছিলেন। কি চরিত্রের সৌন্দর্য্য কি অমানুষী জ্ঞানস্পৃহা, কি ধর্ম্ম বিশ্বাস, তিনি এসকল গুণে বঙ্গ ভূমি উজ্জ্বল করিয়াছেন। কঠোর সংসারপরীক্ষার তীব্র কষাঘাতে অনেক সময় তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাকে কখনও অপ্রসন্ন দেখি নাই। যখন তাঁহার স্বামী কঠিন মস্তিষ্ক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আনীত হন। অন্নপূর্ণা বহু পুত্র কন্যা সহ তখন অকূল পাথারে ভাসিতে ছিলেন। আমিও তখন দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত। যে দিন তাঁহারা কলিকাতায় পৌছিলেন। সেই দিনই আমি বায়ু

পরিবর্ত্তনের জন্য বৈদ্যনাথ যাইব। অপরাহ্ণে আহারে বসিয়াছি, অন্নপূর্ণা তখন আমার সম্মুখে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বিপদে পড়িয়াছেন মায়ের উপর নির্ভর করুন, আর উপায় নাই, কিছু চিন্তা করিবেন না"। দেবীর প্রসন্ন মুখ আরো প্রসন্ন হইল, সে প্রসন্ন নয়ন দুটীর উজ্জ্বল ভাব দেখিয়া আমি আত্মহারা হইলাম, মোহিত হইলাম, তিনি বলিলেন "আমি এক দিনও চিন্তা করি না—ভাবিব কেন? যাঁহার পরিবার তিনিই রক্ষা করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা হয়, নয় ভাসিয়াই যাইব, চিন্তা বা দুঃখ কি"। এই রূপ ঘোর বিপদে এই রূপ কথা শুনিয়া আমি মোহিত হইলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি কি ভাবিবেন, ভাবিয়া অতি কষ্টে ভাব সংবরণ করিলাম। আরও অনেক কথা হইল, সে সকলি উজ্জ্বল বিশ্বাসের পরিচায়ক আমি এমন বিশ্বাসী ব্রহ্ম কন্যা জীবনে আর দেখি নাই।

আমার "সোপান" নামক পুস্তক দেবী অন্নপূর্ণার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। তাহাতে অনেক কথা অনেক পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম। সে সকল কথা পাঠ করিয়া বঙ্গ প্রদেশের কতিপয় শিক্ষিতা মহিলা উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি অত্যুক্তি দোষে দূষিত। আমি তদুত্তরে কোন কোন স্থানে বলিয়াছিলাম, তাঁহারা ত দেবী অন্নপূর্ণাকে জানেন না। বাস্তবিক অন্নপূর্ণা দেবীকে যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা আমার সকল উক্তিতে প্রায়ই উপহাস বর্ষণ করিবেন। সে জন্য আমার কিছু করিবার বা বলিবার নাই। আমি কেবল এই কথা বলিতেছি, আমি "সোপান" প্রকাশের সময় যে সকল কথা লিখিয়াছিলাম, এখন লিখিলে তাহাপেক্ষা অনেক বেশী লিখিতাম।

যাহা লিখিয়াছি, তাহা দেবী অন্নপূর্ণার যোগ্য হয় নাই। তাঁহার তর্ক করিবার অদ্ভুত-শক্তি, তাঁহার কঠিন বিষয়ে অনুপ্রবেশের আশ্চর্য্য ক্ষমতা, তাঁহার সহৃদয়তা, তাঁহার সদাশয়তা এ সকলই ভুলিলে ভুলিতে পারিব; কিন্তু তাঁহার ভগবদ্ভক্তি কখন ভুলিতে পারিব না। বগুড়ায় যে বাটীতে তিনি থাকিতেন, সে বাড়ী দিবসের সর্ব্ব সময়ে প্রায় লোকে পূর্ণ থাকিত। কোন লোকের প্রতি তাঁহার ব্যবহারের ত্রুটী দেখা যাইত না, ইহার এক মাত্র কারণ তিনি বিধাতার কৃত কন্যা। তাঁহাকে দেখিলেই সকলে কৃতার্থ হইত। আমি নিজে তাঁহাকে দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। তিনি এবং তাঁহার স্বামী আমাকে বন্ধু মনে করেন, বলিয়া ধন্য হইয়াছি। অন্নপূর্ণা দেবী, আমি তাঁহার পতিত ভাই বলিয়া, আমাকে ঘৃণা না করিয়া আদর করিতেন, ইহা আমার পক্ষে অল্প গৌরবের কথা নয়। অন্নপূর্ণা এখন স্বর্গে; বগুড়া এখন অন্ধকার, আমরা তাঁহার ভালবাসার পাত্র সকল শোকাচ্ছন্ন; দেবী আমাদের জন্য কি মায়ের চরণে কিছু বলিতেছেন না; আমি আশা করি, তিনি আমাদের জন্য সেখানে কিছু করিতে-ছেন; তাঁহাকে দেখিলে শান্তি ও আরাম পাইতাম, আজ স্মরণে আনন্দ পাইতেছি। সুতরাং অন্নপূর্ণা মানবী নহেন, তিনি দেবী ছিলেন।

শ্রীদেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী।
২১০।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা
আনন্দ আশ্রম।

কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিষ ষ্ট্রীট।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতঃ—

আপনার পত্র কয়েক দিন হইল পাইয়াছি। কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এত দিন উত্তর দিতে পারি নাই। অন্নপূর্ণা দেবীর জীবন চরিত যে মুদ্রিত হইতেছে ইহাতে অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। আমি তাঁহার বিষয়ে যাহা জানি, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিতেছি।—

"আমি অন্নপূর্ণা দেবীর বিশেষ বিষাদের সময়ে দেখিয়াছিলাম। যে বিষাদে মানুষ হতবুদ্ধি হইয়া যায়, তাহাদের চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, সেরূপ বিপদেও আমি তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম। তাঁহার সহিষ্ণুতা-শক্তির যেন পার ছিল না। আর একটী বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ছিলাম, তাঁহার পতির যখন গুরুতর পীড়া, চতুর্দ্দিকে অকূল বিপদ সাগর, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর কি ১টার সময়ে দেখি সন্তানগণকে ঘুম পাড়াইয়া সেই রাত্রে অন্নপূর্ণা পাঠ করিতেছেন। "এত রাত্রে পড়িতেছেন" বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হওয়াতে বলিলেন, "পতির পীড়ার শুশ্রূষা কিরূপে করিতে হইবে, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পড়িয়া তাহা জানিতে চেষ্টা করিতেছি।" সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তার পর শরীর ও মন দুই যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, এরূপ সময়ে এই অধ্যবসায় দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম।

অনুগত ভ্রাতা

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

জেলা বগুড়া

শ্রদ্ধেয় বরেষু।

যুগ যুগান্তর পরে আপনার ২৫ শে ভাদ্র তারিখের লিখিত অনুগ্রহ পত্রী অদ্য এই মাত্র প্রাপ্ত হইয়া পরম আপ্যায়িত হইলাম। আপনার পত্রের লিখিত ঘটনাবলী অনেক দিন হইতে আমি শুনিয়া আসিতেছি। আপনার সহধর্ম্মিনী স্বর্গীয়া অন্নপূর্ণা দেবীর সম্বন্ধে আমার মত জানিতে চাহিয়াছেন। বড় শোকাকুলিত চিত্তে তাহা নিম্নে লিখিলাম পাঠ করিয়া অবগত হউন ইতি।

আমি আপনার এই অন্নপূর্ণাকে চিনিতাম ও জানিতাম। যদিও ইহাঁর বাল্যজীবন তাঁহার জনকজননীর ক্রোড়েই ক্রীড়া করিয়াছিল কিন্তু ইহাঁর কুমারী জীবনের মধ্যভাগ হইতে প্রৌঢ়াবস্থায় দেহান্তর সময় পর্য্যন্ত আমাদের জাগ্রতচক্ষের উপর দিয়াই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাই মুক্তকণ্ঠে আমি পুনরায় বলিতেছি যে স্বর্গীয়া অন্নপূর্ণা দেবীকে আমি চিনিতাম ও জানিতাম।

ইনি আপন দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে, বাধা বিপত্তির সঙ্গে যে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছেন তাহাতেই আমি ইহার শক্তি সামর্থ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি।

আপন হৃদয়দেবতার অর্চ্চনার জন্য সংসারের বৈকারিক লগামতাকে যে তিনি পদে পদে পদদলিত করিয়াছেন তাহা আমি বেশ প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং সেই সকল ঘটনা সংঘর্ষনেই তাঁহার সার বস্তুর প্রচুর পরিমাণে পরিচয়ও পাইয়াছি।

আজিকার দিনের ভোগ-বিলাসিনী পোষাকপরায়নাদের ন্যায় ইনি বিচলিত ছিলেন না। আপ্রাণচেষ্টায় সত্যের মর্য্যাদা মস্তকে ধারণ করিয়া জাগতীক জ্বালাযন্ত্রণাকে তুচ্ছ বোধ করিয়াছেন।

দারুণ ধর্ম্ম পিপাসায় প্রাণের আশা মিটে নাই তাই সময় সময় নানা কথার ছলে সেই প্রাণ ভোলা একটানা কথা নিয়া নিয়ত তোল পাড় করিয়াছেন। এই জ্বলন্ত অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি তাঁহার জ্ঞান ভাণ্ডার পরিপূরণের প্রধান পরিচায়ক ছিল সন্দেহ নাই।

মত বৈষম্য বা পার্থক্য বশতঃ তিনি আত্মীয় স্বজনের উপর খড়্গাহস্তা ছিলেন না।

বাণ-বিদ্ধ মৃগ শাবকের অসীম যন্ত্রণা সদৃশ বাক্য-বাণে বিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের যন্ত্রণাকে ইনি হৃদয়ের সহিত ভয় করিতেন। ইনি বাক্ যোদ্ধা ছিলেন না কার্য্য পরায়ণা ছিলেন।

বিপক্ষ দমনের জন্য কেবল আড়ম্বরময় ও তামস প্রকৃতিরই উদ্দীপক মাত্র কতক গুলি শব্দ সম্পত্তি লইয়া ইনি ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন না। বিন্দু বিন্দু করিয়া কার্য্য করাই তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল।

আমার সহিত ইহাঁর মতভেদ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমি ইহাঁর গুণরাশিরই পক্ষপাতি ছিলাম।

ইনি যে সত্য-সিন্ধুর আরাধনায় জীবনপাত করিয়াছেন সেই পুণ্যের পুরস্কার এজগতে নাই তাহার প্রকৃত পুরস্কার ভগবান বৈকুণ্ঠবিহারীর শান্তি-নিকেতনে অনন্ত কালের জন্ম সঞ্চিত রহিয়াছে।

দিনাজপুর পত্রিকা কার্য্যালয়
দিনাজপুর
২৭ শে ভাদ্র ১২৯৮ সাল।

শ্রীবিষ্ণু চরণ দেবশর্ম্মা
ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক।

মাননীয়া অন্নপূর্ণা দেবী একটী স্ত্রীরত্ন ও নারী জাতির গৌর-বের সামগ্রী ছিলেন। তাঁহার জীবন অহঙ্কার শূন্য বাৎসল্য-পূর্ণ ও সরলতাময় ছিল। আমি বাল্যকালে লেখা পড়া শিখি-বার জন্য তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম; তখন তিনি অতিশয় যত্ন ও স্নেহের সহিত আমাকে পড়াইতেন ও কত আদর করিয়া নীতি-পূর্ণ উপদেশ দিতেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের খুব আত্মীয়তা ছিল। আমাদের বাটীর সকলের সঙ্গেই তিনি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সৌজন্যে সকলেই পরম প্রীতি লাভ করি-তেন। আমার ভগ্নি শরৎশশীর সঙ্গে অন্নপূর্ণা দেবীর অত্যন্ত প্রণয় ছিল; এমন কি উভয়ে অভিন্নহৃদয় ছিলেন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। শরৎশশীর একটী পুত্রের মৃত্যু হওয়ার পর অন্নপূর্ণা দেবী তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠে সত্যই শরৎশশীর মনে অনেক শান্তির উদয় হইয়াছিল। তিনি আমার নিকট বলিয়া ছিলেন যে এই সন্তানের মৃত্যু সময় এক মাত্র অন্নপূর্ণার চিঠিতেই আমি সান্তনা পাইয়া ছিলাম। যথার্থই অন্নপূর্ণা একটী শান্তির আকর ছিলেন।

অন্নপূর্ণা দেবী বাস্তবিকই দেবী স্বরূপা ছিলেন। আমাদের পরিচিতা অনেক মহিলা তাঁহার চরিত্র অনুকরণ করিতে যত্নবতী ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কেহই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

অন্নপূর্ণা দেবী লেখা পড়া, শিল্পকর্ম্ম, গৃহকার্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সুনিপুণা ছিলেন। পার্থিব বিলাস সামগ্রীর প্রতি তাঁহার কিছু মাত্র স্পৃহা ছিল না। তিনি নিরাভরণা থাকিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম-ভাব পূর্ণ প্রফুল্ল মুখে তাঁহাকে অপার্থিব সৌন্দর্য্য অলঙ্কৃত করিত। শারীরিক বেশভূষা অপেক্ষা গুণেরই অধিক আদর করিতেন। তাঁহার চরিত্র বর্ণন করিতে আমার এ সামান্য লেখনির পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং তাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার চিহ্ন স্বরূপ কেবল এই কতিপয় পংক্তি লিখিয়াই আমাকে বিরত হইতে হইল।

শ্রীমতী বিধুমুখী গুপ্তা
বগুড়া।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

মনু ৩ অঃ ৫৬ শ্লোঃ॥

স্নেহময়ী অন্নপূর্ণা দেবী আর ইহ জগতে নাই, পত্নী বিয়োগ-বিধুর শ্রীমন্ত বাবুকে ও প্রাণোপম পুত্র কন্যাগণকে বিষাদ সাগরে ভাসাইয়া আজ প্রায় তিন চারি বৎসর হইল সতী রোগশোকপূর্ণ

ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের শান্তিপূর্ণ অনন্ত ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আজ শ্রীমন্ত বাবুর গৃহ অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে হারাইয়া বিষাদময় ও শ্মশান সম প্রতীয়মান। এই লেখক বাল্যাবধি পরলোকগতা বিদূষীর স্নেহের অপার্থিব সুখ ভোগে অধিকারী ও বাল্যে তাঁহারই স্নেহপূর্ণ উপদেশে, বালোচিত অনেক চাপল্য পরিহার করিয়া ছিল।

আজ প্রায় ১৭ বৎসরের কথা লেখক যখন অধ্যয়নার্থে বগুড়ায় আগমন করে তখন গৃহস্থিতা জননীর ও আত্মীয় বর্গের অদর্শনে বড়ই অধীর থাকিত ও সময় পাইলে হৃদয়ের গভীর আবেগ নির্জ্জনে রোদন করিয়া প্রশমিত করিত। এই কালে লিখকের বগুড়াস্থ অভিভাবক কার্য্য স্থল হইতে আসিতে বিলম্ব করিলে কি বৈকালে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত সাক্ষাতার্থ বহির্গমন করিলে প্রায়ই লিখককে পরলোক গতা বিদূষীর সহিত কথা বার্ত্তায় সায়ংকাল অতিবাহিত করিতে হইত।

সে অন্নপূর্ণা দেবীর তৎকালে স্নেহে ও উপদেশ পূর্ণ নীতি শিক্ষায় বড়ই সুখে সায়ং কাল অতিবাহিত করিত ও তৎসহবাসে মাতৃ বিরহ দুঃখ ভুলিয়া যাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিত। এই সময় হইতে লিখক তাঁহার গুণে ও সহৃদয়তায় আকৃষ্ট হইতে থাকে ও কাল ক্রমে সেই ভাব বয়ঃপরিনতির সহিত প্রগাঢ় ভক্তিতে পরিনত হইয়া যায়। কালে লিখকের অভিভাবক অভিভাবিকার সহিত মৃত দেবীর ও তৎস্বামীর বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়া উঠায় লিখক দিবসের অধিকাংশ সময়ই তৎসহবাসে অতিবাহিত করিত এবং প্রতিনিয়ত অবস্থান দ্বারা তাঁহার গুণা-বলীর বিশেষ বিকাশ অনুভব করিয়াছিল। তিনি সুলেখিকা,

সত্য বাদিনী ও সর্ব্ব জন প্রিয়া ; তাঁহার সহিত যিনি এক বার মাত্র আলাপ করিতেন তিনি তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে, ধর্ম্ম নিষ্ঠায় ও সন্নীতি দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত।

তাঁহার হৃদয়ের বল ও ঈশ্বর ভক্তি দেখিলে একেবারে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এপ্রকার হৃদয় বল, রমণী হৃদয়ে আমি কুত্রাপিও দর্শন করিনাই। এ বল, বলিয়ান্ পুরুষ সমাজে ও আদরের সামগ্রী।

যখন দৈব বিড়ম্বনায় প্রথমবার তৎপতি উন্মাদরোগগ্রস্থ হইয়া ঢাকায় প্রেরিত হন সেই সময় নিরাশ্রয়া অন্নপূর্ণা পুত্র কন্যাগণ সহ ব্রাহ্ম বন্ধুগণের অনুগ্রহে ঢাকাতে বাস করিতে ছিলেন। তাঁহার তৎ কালিক অবস্থা দর্শনে পাষাণও বিগলিত হইয়া যাইত। যে রমনী কিছু দিন পূর্ব্বে, স্বামী ও পুত্র কন্যা-গণ ও দাস দাসী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বগুড়ার নিজ বাসায় তারকা জড়িত নীল নভস্থলে শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেন; আজ কিনা অবস্থার বিপর্য্যয়ে রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় স্বামীধন হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পূতিগন্ধময় দরিদ্রকুটীরে কায়ক্লেশে পুত্র কন্যাগণের ভরণ পোষণ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে ছিলেন। এ কষ্ট রমণীর বিশেষতঃ সতীর পক্ষে দুর্ব্বিসহ। সাধ্বী নীরবে এ সমস্ত সহ্য করিয়াছেন: এক দিনের তরেও তিনি হৃদয়ের গভীর আঘাত অপর কাহাকেই দেখাইয়া ব্যথিত করেন নাই।

বিপদে পড়িলে প্রায়শই লোকের ঈশ্বরে বিশ্বাস ধ্বংস হইয়া যায় অনেকে বিপদের যাতনায় অধীর হইয়া মঙ্গলময়কে,

অমঙ্গল দায়ক, দয়াময়কে নিষ্ঠুর ও সমদর্শীকে পক্ষপাতী মনে করেন ও অবিশ্বাস দ্বারা প্রেরিত হইয়া মহানিষ্টকর কার্য্য, এমন কি অনেকে স্বহস্তে নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। কিন্তু অন্নপূর্ণা সে ধাতুর রমণী ছিলেন না। সেই বিপদের কালে সেই ঘোর পরীক্ষার সময় অন্নপূর্ণা পূর্ব্ব বৎ দৃঢ় বিশ্বাসিনী ও নির্ব্বাত নিষ্কম্প সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও প্রশান্ত ভাবাপন্ন। আমি তৎকালে তাঁহার মুখে এক মুহূর্ত্তের তরেও সাধারণ রমণীর ন্যায় বিষাদের কি অধীরতার ভাব প্রত্যক্ষ করি নাই! বরং যখনই দেখিয়াছি তখনই তিনি স্থিরা, ধীরা, গম্ভীরা।

তিনি ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসের বলে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া সাবিত্রীর ন্যায় পতি সহ বগুড়ায় উপস্থিত হইলেন ও পরিশোধিত সুবর্ণের ন্যায় গুণ প্রভায় বগুড়া উজ্জ্বল করিলেন।

এ রত্ন সংসারের উপযুক্ত নয়; কাচ প্রভায় প্রতারিত সংসার এ বহু মূল্য মহারত্নের মূল্য বুঝিতে পারিল না। প্রাণারাম সংসার দগ্ধ রত্নকে মর জগতে অধিক দিন রাখিলেন না; নিজে পবিত্র ক্রোড়ে আশ্রয় দিলেন। আজ অন্নপূর্ণা হারাইয়া আমরা ক্ষুধার্ত্ত-কেহ জ্ঞানের, কেহ হৃদয় বলের, কেহ প্রতিভার, কেহ উৎভাবিণী শক্তির, কেহ স্নেহের, কেহ বা প্রেমের, কেহ বা দমের, কেহ বা ভক্তির, জগদীশ! আর কি আমরা এমন অন্নপূর্ণা পাইব? আর কি এ, মা বিহীন পতিত জাতির এমন মা জুটিবে?

যে দেশে এমন রমণী-রত্ন আছেন ও জন্ম গ্রহণ করেন সে দেশ ধন্য। যে কুলে জন্ম গ্রহণ করেন সে কুল পবিত্র;

আর যেস্বামী এ হেন রত্নের স্বামী তিনি দরিদ্র হইলেও রাজ-চক্রবর্ত্তী।

শ্রীবৈদ্য নাথ সান্যাল
বগুড়া।

শ্রদ্ধেয়া অন্নপূর্ণা দেবী সম্বন্ধে মন্তব্য।

শ্রদ্ধেয়া অন্নপূর্ণা দেবী আমাদের নিকটতমা প্রতিবেশিনী ছিলেন। অতি বাল্যকাল হইতে আমি তাঁহাকে চিনিতাম। তিনি আমাদের বাসায় সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। আমার জননীর সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। তিনি আমাদের পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন পরিবারের লোক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসায় মিষ্ট ফল নূতন তরকারী অথবা অন্য কোন প্রকার তাঁহার প্রিয় দ্রব্য উপহার স্বরূপে পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহারই অনুরোধ ক্রমে, আমি ও আমার ভ্রাতা, ভগিনীগণ তাঁহাকে "মাসী মা" বলিয়া ডাকিতাম এবং তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ, আমার মাতাকে "মাসী মা" বলিয়া সম্বোধন করিত, এবং এখন ও করিতেছে। সচরাচর চক্ষে না পড়িলেও, এই সকল সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়া, তাঁহার চরিত্রগত স্বভাবসিদ্ধ প্রেম ও সহৃদয়তা স্পষ্ট প্রকাশিত হইত।

আমি বাল্যকালে শ্রদ্ধেয়া অন্নপূর্ণা দেবীর নিকট "শিশুশিক্ষা-প্রথম ভাগ" সম্পূর্ণ ও শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগের কতকাংশ পাঠ করিয়া ছিলাম। তাঁহর আশ্চর্য্য শিক্ষা-কৌশলে আমি অতি অল্প কালের মধ্যে প্রথম ভাগ শেষ করিয়া দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করি। সুতরাং তিনি আমার শৈশব কালে শিক্ষায়িত্রী স্থানীয়া

ছিলেন, এবং আমাকে সন্তান নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। এই সকল কারণে তিনি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্রী সন্দেহ নাই।

আমি অন্নপূর্ণা দেবীকে কখন রাগ করিতে দেখিয়াছি কিনা, স্মরণ হয় না। পাপের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা থাকিলেও, তাঁহার হৃদয় মানব-প্রেম বিহীন হইয়া শুষ্ক ও কঠোর ভাব ধারণ করে নাই। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার নিকট গুরুতর দোষে দোষী হইলেও তিনি অনিষ্ট চিন্তা দূরে থাকুক, বরং দোষী ব্যক্তির সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। বৈর-নির্যাতনস্পৃহা তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হইত না, প্রবল রিপুতন্ত্রতা তাঁহাকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করিয়া তাঁহার চিত্তের প্রশান্ত ভাব নষ্ট করিতে পারিত না; প্রলোভন তাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে পরাজিত হইয়াছিল। তদীয় স্বভাবসিদ্ধ চরিত্রের তেজে অনেকের অন্তরনিহিত কুবাসনা চির কালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা দেবী সন্তান সন্ততি দিগকে শিক্ষা দিবার পক্ষে প্রহার নীতি অনাবশ্যকীয় ও অত্যন্ত দুষনীয় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি কখন নিজে সে দূষিত নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, বোধ হয় না। সন্তান দিগের প্রতি তাঁহার শাসন প্রধানতঃ প্রেম মূলক ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিচারালয়ে প্রচলিত বেত্রাঘাতের অনুরূপ দণ্ড বালকদের চরিত্র সংশোধনের পক্ষে যত ফল দায়ক না হইবে, তাঁহার মিষ্ট ভর্ৎসনা তাহা হইতে শত গুণে কার্য্য করী হইত। দাস দাসী দের প্রতিও তাঁহার শাসন কঠোর ছিল না। কর্ত্তৃত্বের ভাবের অভাব না থাকিলেও তাঁহার আদেশ প্রেম ও বাৎসল্যের ছায়ায়

কেবল বন্ধুর প্রতি অনুরোধ বলিয়াই তাহাদের নিকট প্রতীয়মান হইত।

ঘোর কুসংস্কারাপন্ন সমাজের মধ্যে প্রতিপালিত, এবং বাঙ্গালীর ঘরে নারীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াও, অন্নপূর্ণা স্বকীয় অদম্য অধ্যবসায় ও প্রবল জ্ঞান-পিপাসা গুণে মাতৃ ভাষা যেমন আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। তিনি যে অসাধারণ প্রতিভা শালিনী ছিলেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কতকগুলি অনুকূল অবস্থা তাঁহার প্রতিভা বিকাশের পক্ষে সাহায্য করিয়া ছিল বটে, কিন্তু সম্পুর্ণ বিকাশিত হইতে পারিলে যে তাঁহার প্রতিভা সমাজে বিশেষ ভাবে কার্য্য না করিত, এমন বলা যায় না। তিনি আপনার চরিত্রের সৌন্দর্য্য গুণে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। তাঁহাতে এমন কিছু ছিল যাহা অদৃশ্য হইলেও চুম্বকের ন্যায় লোকের মনের উপর কার্য্য করিত। ধর্ম্ম মতের পার্থক্য থাকিলেও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া কেহই তাঁহাকে অন্ততঃ মনে মনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। তাঁহার গাম্ভীর্য্যময়ী প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করিলে চিন্তা বিহীন লোকের অন্তঃকরণেও ভক্তি ভাবের আবির্ভাব হইত; তাঁহার জলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস ঘোরতর নাস্তিকের মনেও পরোলোকের প্রতি বিশ্বাস উদ্রেক করিয়া দিত; তাঁহার উজ্জল ধর্ম্মভাবে অবিশ্বাসীর নীরস অন্তরেতেও প্রেমের তরঙ্গ উপস্থিত হইত। বিনয় ও সৌজন্য তাঁহার চরিত্রের আভরণ ছিল।

অমায়িকতা, সরলতা ও গাম্ভীর্য্যের সংমিশ্রণে অন্নপূর্ণা-চরিত্র আশ্চর্য্য মধুরতায় পরিপূর্ণ ছিল। তেজস্বিনী বুদ্ধি, নির্ম্মল জ্ঞান, অবিচলিত ধর্ম্মভাব, গাঢ় কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, অপরিসীম সন্তান বাৎসল্য, অসাধারণ ধৈর্য্য, অদম্য অধ্যবসায়, অলৌকিক সহিষ্ণুতা, প্রগাঢ় পতিভক্তি ও অকপট পতি-প্রেম, তাঁহার চরিত্র আরও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়া ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার জ্ঞানে অহঙ্কার ছিল না, ধর্ম্মভাবে অন্ধতা ছিল না, বাৎসল্যে ও মোহ ছিল না, প্রেমে কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাব ছিল না, সরলতায় বুদ্ধির স্বল্পতা ছিল না। বা বিনয়ে তোষামোদ ছিল না। বুদ্ধি তাঁহাকে কদাপি পরের অনিষ্ট সাধনে নিয়োজিত করে নাই, গাম্ভীর্য্য তাঁহাকে লোকসমাজ হইতে দূরে রাখে নাই, সৌজন্য তাঁহার আত্ম সম্মান বোধ-শক্তি নষ্ট করে নাই। বা সহিষ্ণুতা তাঁহাকে উদ্যম হীন করে নাই।

অন্নপূর্ণা দেবী পার্থিব অলঙ্কারাদি বেশভূষার নিতান্ত স্পৃহাহীন হইলেও সাংসারিক কার্য্য অতিশয় মনোযোগ ও দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। প্রত্যেক কার্য্যের অন্তরালে তাঁহার প্রতিভা ও সৌন্দর্য্য বোধ-শক্তির স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইত। বিদ্যা ও বুদ্ধি, গৃহের পরিপাট্য সাধনে ও রন্ধন কার্য্যের উৎকর্ষতা সম্পাদনে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। তিনি এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত গৃহ কার্য্য করিতেন যে, পারিবারিক হিসাব পত্র রাখিবার জন্যেও তাঁহার স্বামীকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত না। ফলতঃ তাঁহার গৃহে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শোকসন্তপ্ত ব্যক্তি অন্নপূর্ণার সান্ত্বনা বাক্যে শোকের জ্বালা অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইত। তাহার সাহায্য প্রাপ্তিতে অনেক দুঃখী লোক দারিদ্রতার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিত, তাঁহার ধর্ম্ম কথা শ্রবণে অনেক পাপাসক্ত নর নারীও অন্ততঃ সে সময় ভবিষ্যতে ভাল হইবার জন্য সংকল্প করিত।

তাঁহার নিকট পুত্র কন্যার পার্থক্য ছিল না। তিনি জানিতেন যে স্বার্থপর মানবের চক্ষে কন্যাসন্ততি "দায়" বা পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কার্য্যের ফলরূপে পরিগৃহীত হইলেও, ন্যায়বান্ ঈশ্বরের রাজ্যে পুত্র ও কন্যার মধ্যে পার্থক্য নাই। তজ্জন্যই অন্নপূর্ণা দেবী প্রত্যেক সন্তানকে সমভাবে স্নেহ করিতেন ও প্রত্যেকের শিক্ষারপ্রতি সমান মনোযোগ দিতেন।

অন্নপূর্ণা দেবীর মুখে মূর্তিমতি প্রফুল্লতা বাস করিত। তাঁহার হৃদয় অনুরাগের আবাস ভূমি ও ললাট চিন্তার আগার ছিল। হাস্য তাঁহার অধরপ্রান্ত সর্ব্বদা আলোকিত করিত; উৎসাহ তাঁহার শারীরিক ও মানসিক ফলরূপে পরিণত হইত; ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাঁহার দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য বিকাশ করিত। বস্তুতঃ তাহার দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্যের ভাব পরিলক্ষিত হইত।

পতি উন্মাদ রোগে আক্রান্ত, সন্তান গুলি অপ্রাপ্ত বয়স্ক, গৃহের দ্রব্য সামগ্রী সমুদায় অল্প মূল্যে বিক্রীত বা লুণ্ঠিত, নিকটে পরামর্শ দিবার লোক নাই; কন্যাকার আহার সংস্থান নাই। এরূপ অবস্থায় বিদেশে অসহায় ও দরিদ্র অবস্থায়, এক জন অবলার পক্ষে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করা সহজ নহে। কিন্তু অন্নপূর্ণা অমানুষী শক্তিবলে, কেবল ঈশ্বরের করুণার উপর

নির্ভর করিয়া অম্লান বদনে বিপদের বজ্র প্রহার সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বোধ হয় উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াই সর্ব্বদর্শী চিন্ময়, তাঁহার স্কন্ধে এই গুরুতর দায়িত্ব ভার নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন। কঠোর জীবনসংগ্রামে অন্নপূর্ণার হৃদয়ের বল বিশেষ পরিক্ষিত হইয়াছিল। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া ছিলেন। নিজের শরীর নিতান্ত অসুস্থ হইলেও তাহার দিকে কিছু মাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া, স্বামীর শুশ্রূষায় জীবন পাত করিয়া ছিলেন। দারুণ পীড়ার শেষাবস্থায় উন্মত্ততা নিবন্ধন স্বামীর অকস্মাৎ কারাগার তাঁহার জীবনের সময় অত্যন্ত সংকুচিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বামীর অভাবনীয় কারামুক্তি জনিত হর্ষ ও তাঁহাকে আর অধিক দিন এ জগতে থাকিতে দেয় নাই। ভয়ানক শারীরিক অনিয়ম ও ততোধিক মানসিক কষ্টে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ এবং মন ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে ছিল। তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া ছিলেন যে ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ পীড়া; এবং পূর্ব্ব হইতেই মৃত্যুর জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিয়া আসিতে ছিলেন। তিনি আমাদিগকে অনেক বার বলিয়া ছিলেন যে, সেই পীড়াই তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া, তাঁহার হৃদয়ের প্রফুল্লতা যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; বোধ হইত সে সময় তাঁহার দৃষ্টি পরলোকে নিবদ্ধ। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে স্তিমিত প্রদীপ যেমন দ্বিগুণ বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, মৃত্যুর পূর্ব্বেও তাঁহার শারীরিক বল, এবং মানসিক তেজ একবার অত্যন্ত প্রবল হইয়া ছিল। তাঁহার শরীরে নূতন কান্তি দীপ্তি পাইতে লাগিল, বোধ হইতে লাগিল তাঁহার মধ্যে কোন স্বর্গীয় জ্যোতি বিরাজ

করিতেছে। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে, তিনি প্রার্থনা, বন্ধুদের সহিত সদালাপ, ও বন্ধু বান্ধবদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন প্রদীপ যে নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছে, বিশেষ সূক্ষ্ম দর্শন ভিন্ন সহসা তাহা বোধ গম্য হইতনা। তিনি এত শীঘ্র যে ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন, অনেকেরই তখন এরূপ বিশ্বাস হইত না। কল্পনার চক্ষে সেইরূপ ঘটনা অতিশয় ভয়াবহ ও কষ্ট দায়ক বলিয়াই বোধ হয়। প্রিয় জনেরা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের আশা করিয়া ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও আমরা বুঝিতে পারিনাই যে তিনি সেই দিনই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। জীবনের শেষ ভাগে অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করিলেও, অতি নিঃশব্দে তাঁহার প্রাণ বায়ু দেহ পিঞ্জর হইতে নির্গত হইয়াছিল। তিনি স্বর্গ হইতে আসিয়া ছিলেন। কিছু দিন এখানে অবস্থিতি করিয়া, স্বীয় কার্য্য সাধনের পর আবার স্বর্গেই চলিয়া গেলেন: কিন্তু তথাপিও যেন তিনি এখনও পৃথিবীতে ও স্বর্গে এক সময়েই বাস করিতেছেন। তাঁহার অশরীরী আত্মা এখন অলক্ষিত ভাবে কাহার কাহার উপরে কার্য্য করিতেছে। ইষ্টক নির্ম্মিত সমাধি স্তম্ভ দ্বারা তাঁহার স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার গুণাবলীর যথা-সাধ্য অনুকরণ ও স্মরণ জনিত ভাল বাসা ও ভক্তি সংযোগে সমাধি প্রস্তুত না হইলে, অন্য কোন সমাধিই চিরস্থায়ী হইবে না। তিনি পৃথিবীতে কতকগুলি সন্তান সন্ততি রাখিয়া গিয়া-ছেন; এবং ইহারা জগতে তাঁহার বংশ রাখিতে পারে সত্য, কিন্তু তিনি যাহাদিগকে আপনার জীবনের আদর্শ দ্বারা গঠিত

করিয়াছেন এবং করিবেন, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার স্থায্য উত্তরাধিকারী পদে বাচ্য।

অন্নপূর্ণা দেবীর নিকট আমাদের পরিবার অনেক বিষয়ে ঋণী। এক সময়ে মনে হয়, তিনি আমার জননীকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ফলবতী না হইলেও ইহা দ্বারা তাহার হৃদয়ের মহত্ত্ব কতক পরিমাণে অনুভব করা যাইতে পারে। তিনি আমার পরলোকগতা ভগিনী কাদম্বিনীকে কতক দিন উলের কার্য্য শিক্ষা দিয়া ছিলেন এবং সময় সময় লেখা পড়া বিষয়েও সাহায্য করিতেন। তিনি অনেক বার আমার মাতার প্রসবের সময় ধরণীর কার্য্য করিয়াছেন; সময় সময় সৎগ্রন্থ পাঠ দ্বারা তাঁহার চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন, এবং চিঠি পত্রাদী লিখিয়া দিয়া অনেক আনুকূল্য করিয়াছেন। আমার জননী তাঁহার দ্বারা পত্র লেখাইতে যেমন সুবিধা পাইতেন; অন্য কাহার দ্বারা তেমন পাইতেন না কারণ মনের ভাব শুনিলেই অন্নপূর্ণা দেবী ভাষা দ্বারা তাহা অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেন। এখনও তিনি এজন্য এবং অন্যান্য কারণে স্বর্গীয়া অন্নপূর্ণা দেবীর জন্য আক্ষেপ করিয়া থাকেন এবং বলেন, " এমন পত্র আর কেহই লিখিতে পারে না।

অন্নপূর্ণা দেবী আমাদের পরিবারের ভবিষ্যতের মঙ্গল জন্য কতক দিন পর্য্যন্ত প্রতি মাসে আমাদের উদ্বৃত্ত তহবিল আপন হস্তে রাখিয়য়া ছিলেন। এবং যত্ন করিয়া কয়েক শত টাকা সঞ্চয় করিয়া, আমাদের হস্তে প্রত্যার্পণ করিয়া ছিলেন।

অন্নপূর্ণা দেবী ২।৩ বৎসর হইল, স্বর্গে গিয়াছেন কিন্তু তিনি আপন চরিত্র বলে অনেকের অন্তরে এখনও বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার কার্য্য জগৎ, প্রাকৃতিক ও সাময়িক অবস্থা অনুসারে অতিশয় সংকীর্ণ ছিল বটে, কিন্তু তিনি এই ক্ষুদ্র জগতের এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি এক্ষণে পরলোকে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য কলাপের নিদর্শন এখনও সম্পূর্ণ বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হয় নাই। সংসারের নিয়ম অনুসারে পৃথিবীতে তাঁহার ভাগ্যে অবিমিশ্র সুখ ঘটে নাই; কিন্তু শান্তি রাজ্যে তাঁহার আত্মা অনন্ত কাল চির শান্তি ভোগ করুক এই আমার বাসনা।

অন্নপূর্ণা দেবী আপন স্বামী অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্মে অনেক উন্নত হইলেও কোন বিষয়ে স্বামীর বাক্য অবহেলা করেন নাই; অথবা অবিনীত ব্যবহারে কখন স্বামীর মনে ক্লেশ প্রবেশ করিতেও দেন নাই। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, নিজে তদনুসারে কার্য্য করিতেন, এবং সুযুক্তি দ্বারা স্বামীকেও আপন মতে আনিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেন, এবং প্রায়ই কৃতকার্য্য হইতেন। তিনি বিবাদ পরায়ণা ছিলেন না বরং বিবাদকে কাল সর্পের ন্যায় ভাবিয়া সর্ব্বদা তাহা হইতে দূরে থাকিতেন, অনেক সময়ে তাঁহাকে অন্যের বিবাদ মীমাংসা করিতে দেখা যাইত; সুতরাং স্বামীর সহিত কোন বিষয়ে মত দ্বৈধ উপস্থিত হইলেও তাহা দ্বারা পারিবারিক অশান্তি উপস্থিত হইবার সম্ভবনা ছিল না। সাংসারিক বিষয়ে স্বামী নামতঃ পরিচালক হইলেও কার্য্যতঃ স্ত্রী ও পুরুষের শক্তি সমান ভাবে কার্য্য করিত। অন্নপূর্ণা ধর্ম্ম ও

সাংসারিক সর্ব্ব বিষয়ে স্বামীর সহায় হইয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর স্থলবর্ত্তিনী হইয়া ছিলেন। স্বামীর সহিত তাঁহার যেমন পবিত্র প্রণয় ছিল, অতি অল্প স্থলেই তেমন দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামীর চরিত্র ও ধর্ম্ম-জীবন গঠনের পক্ষে তিনি প্রচুর সাহায্য করিয়া ছিলেন। স্বামীও সাধ্যমত তাঁহার শিক্ষা ও ধর্ম্ম বিষয়ে সহায়তা করিয়া ছিলেন। এমন পত্নী সকলের ভাগ্যে ঘটে না এমন সহধর্ম্মিণীর বিয়োগও সহ্য করা সহজ কথা নহে। অন্ন-পূর্ণার আসন্ন মৃত্যু কাল যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, স্বদীয় স্বামীর উন্মাদ রোগ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং তাঁহার মৃত্যু হইতে না হইতেই তাঁহার স্বামী সম্পূর্ণ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

এই পতিত বঙ্গ দেশে যেখানে স্ত্রী কেবল দাসী বা উপ-ভোগের সামগ্রী স্বরূপে অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হয়, যেখানে স্ত্রী লোকের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সকলই অস্বাভাবিক বলিয়াই উপহাসের বিষয়ীভূত, যেখানে নারী জাতি অপদার্থ বলিয়া ঘৃণিত ও পদদলিত, যেখানে তাহাদের মনুষ্যোচিত গুণের অস্তিত্ব প্রমাণ সাপেক্ষ; যেখানে তাহাদের ন্যায়ানুসঙ্গত অধি-কারের কথা উত্থাপন করা পর্য্যন্ত বাতুলতার মধ্যে পরিগণিত; যেখানে সন্তান প্রসব ও পুরুষের পাশব অত্যাচার নিঃশব্দে সহ্য করা স্ত্রী জাতির ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত; এবং যেখানে ইতর প্রাণীদের আত্মা থাকিলেও স্ত্রী লোকের আত্মা নাই, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এবং উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনু-সারে, প্রমাণ সহ এই মহা সত্য চতুর্দ্দিকে বিদ্যুৎ বেগে প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। সেখানে অন্ন-পূর্ণার ন্যায় স্ত্রীলোকের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, স্বামীর প্রতি আচরণ

অস্বাভাবিক বা অবিশ্বাস্য হওয়া বিস্ময় কর নহে; কিন্তু ভারতের গৌরবের সময় এইজাতীয় নারীই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী বলিয়া পূজ্য হইতেন, এবং এমন দিন আসিবে যখন অন্নপূর্ণার ন্যায় স্ত্রীলোক সমধিক আদরনীয় হইবে।

শ্রীসারদা নাথ খাঁ বি, এ;
মোঃ বগুড়া।

বগুড়া
১৪ই অক্টোবর। ১৮৯১।

ধর্ম্ম জীবন প্রাতঃ স্মরনীয়। ধর্ম্মাত্মার দেহ লয় হইয়া যায়, নাম লয় হয় না। কিন্তু আমাদের দেহ ও নাম উভয়ই লয় হইয়া যায়। তোমার আমার বিনাশে পৃথিবীর ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু একটী আদর্শ জীবনের বিনাশে আমরা অনেক পিছনে হটিয়া যাই। তুমি আমি চির বিদায় লইলে হয়ত লোকে তিন দিবস মনে রাখিবে। কিন্তু ধর্ম্ম জীবনের গতি অন্যরূপ। ইহার মৃত্যু নাই। লোকে ইহা ভোলে না। কালের স্তরে ২ নামের স্মৃতি আরও যেন দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। বরং বাঁচিয়া থাকিতে যে ধর্ম্ম জীবনের উপর লোকের বড় দৃষ্টি পড়ে নাই, যাই মৃত্যু, সেই জীবনের ষোল কলা বিকাশের যেন সময় উপস্থিত হয়। তাই অকৃতীর নাম মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায়, আর সুকৃতীর জীবনের প্রারম্ভ মৃত্যুর পর হইতে আরম্ভ হয়। তাই ধন্য জীবন ধর্ম্ম জীবন। যে অন্নপূর্ণা দেবী আজ ৪ বৎসর হইল

আমাদের নিকট হইতে বিদায় হইয়াছেন, আজ কেন তাঁহার কথা আমরা মনে করি, তোমাকে আমাকে লোকে ভোলে, তাঁহাকে কেন ভুলিতে পারিনা। তিনি বাঁচিয়া থাকিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। সুতরাং তাঁহাকে আমি পরের চক্ষে জানিনা, নিজ চক্ষে বিশেষ রূপে জানি। তিনি একটী আদর্শ রমণী ছিলেন। ধর্ম্ম বল ও মানসিক বল উভয়ই তাঁহার সমান ছিল। তাঁহাকে আমি সুখে দুঃখে সমান অচল অটল দেখিয়াছি। তাঁহাকে কখন আহ্লাদে উথলিয়া উঠিতে বা দুঃখে ফাটিয়া পড়িতে দেখি নাই। সেই ধর্ম্ম জ্যোতিঃ পূর্ণ, হাসি, হাসি, মুখ সুখ দুঃখকে সমান ভাবে সহ্য করিয়াছে। এইত গেল তাঁহার মানসিক বল। ধর্ম্ম বল তাঁহার আরও অধিক ছিল, এবং ধর্ম্ম জ্ঞানের বিকাশ আরও সুন্দর ছিল এবং এই ধর্ম্ম বল ও ধর্ম্ম জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ তাঁহার ধর্ম্মে অচলা ভক্তি, লোকের একটী শিখিবার জিনিষ। তাঁহার ধর্ম্ম জ্ঞান নিরস প্রস্তরবৎ ছিল না। ভক্তির সহিত বড় সুন্দর মাখান ছিল। যাঁহার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, ভক্তিমাখা জ্ঞানচক্ষে, তিনি তাঁহাকে আরও ভাল দেখিতে পাইয়া ছিলেন। আমি বুঝি আমার প্রাণ কাঁন্দে না, সে জ্ঞানকে আমি জ্ঞান বলিনা। সে জ্ঞান বরং অনর্থের মূল। যে প্রাণ কাঁন্দে না, জ্ঞান-চক্ষু থাকিতেও সে প্রাণ অন্ধ।

দেবী অন্নপূর্ণার পারিবারিক জ্ঞান বড়ই সুন্দর ছিল। স্বামীর প্রতি ইঁহার অচলা ভক্তি, বঙ্গিয় মহিলা দিগের একটী শিখিবার জিনিষ। স্বামীর উপর অটল বিশ্বাস, ইঁহার জীবনের প্রধান ভিত্তি ছিল। স্বামীর সুখে সুখী হয়, এমত রমণী বঙ্গীয় সমাজে

পোণে ষোল আনা থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা এমত কয় জন রমণী দেখিতে পাই, স্বামীর সহিত দুঃখে গা ঢালিয়া দিয়া নিজকে পরম সুখী মনে করে সে অতি বিরল। কিন্তু দেবী অন্নপূর্ণা ইহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন। সুখের পরিবার গঠন করিতে দেবী অন্নপূর্ণা প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

দেবী অন্নপূর্ণার শিক্ষা অতি উচ্চ দরের ছিল। বাঙ্গালা ভাষাতে ইঁহার বেশ অধিকার ছিল। অনেক সময় ইঁহার অনেক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। সকল গুলিতেই মার্জ্জিত বুদ্ধি ও জ্ঞান শক্তির পূর্ণ বিকাশ ছিল।

দেবী অন্নপূর্ণার অকাল মৃত্যু, তাঁহার স্বামী সন্তানগণ ও বন্ধু বর্গের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি জনক। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের অনেক শিখিবার জিনিষ ছিল।

শ্রীশশী কান্ত বসু
মোঃ বগুড়া।

৺অন্নপূর্ণা দেবীর মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলাম। সে নিতান্ত কম দিন নয়, কিন্তু আজিও সে দৃশ্য হৃদয়ে নবীন ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই ব্যাধিক্লিষ্ট মুখে অন্তিম মুহূর্ত্তেও যে স্বর্গীয় শান্তির আভা দেখিয়া ছিলাম, মৃত্যুর করাল ছায়া যে আভা অনুমাত্রও মলিন করিতে পারিয়া ছিল না, তাহা এ জীবনে ভুলিব না।

আমি হিন্দু, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেওয়া গৌরব মনে করি আমার এ সংস্কার নাই যে স্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত আর কেহ

ধার্ম্মিক হইতে পারে না। স্বধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন আর সকলেরই জন্য নরকের অনন্তবহ্নি চির প্রজ্বলিত। ৺অন্নপূর্ণা দেবী ব্রাহ্মিকা ও ধার্ম্মিকা ছিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের ধারণা যে, তাঁহারা নিতান্ত ধার্ম্মিক, যেহেতু তাঁহারা ব্রাহ্ম। ৺অন্নপূর্ণা দেবীর সেরূপ কোন ধারণা ছিল না, থাকিলে তাঁহাকে ধার্ম্মিকা বলিতাম না। সুখে দুঃখে সেই নিরুপায়ের উপায় অগতির গতিকে যাঁহারা সম ভাবে স্মরণ করেন, সম্পদে বিপদে যাঁহারা সম ভাবে সেই সর্ব্ব নিয়ন্তাকে হৃদয়ে রাখিয়া জীবন পথে অগ্রসর হয়েন, এ সংসারে তাঁহারা ধার্ম্মিক। আমার মতে ৺অন্নপূর্ণা দেবী তাঁহাদেরই মধ্যে এক জন।

সচ্ছল অবস্থায় ৺অন্নপূর্ণা দেবীকে যেরূপ প্রসন্ন ভাবে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব দাস দাসী দিগের সহিত যেরূপ মিষ্টালাপ ও ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি, সাংসারিক ঘোর যাতনায় অর্থাভাবের ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের আঘাতে, সে প্রসন্নতা, সে মিষ্ট ব্যবহারের অনুমাত্রও লাঘব দেখি নাই। ভগবানের মঙ্গল ময় ইচ্ছার উপর যাঁহারা সর্ব্বদা নির্ভর করিয়া আছেন, সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রনায় তাঁহাদের কি কষ্ট অনুভূত হইবে? আবার যখন তাঁহার শেষ পরীক্ষা উপস্থিত, দারুণ দারিদ্রতা, নিজের সাংঘাতিক পীড়া, স্বামীর ঘোর মানসিক ব্যাধি প্রভৃতি যুগপৎ যখন তাঁহাকে চারিদিক হইতে আক্রমন করিয়াছিল তখনও স্বামীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি, ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। সেই অবস্থায় স্বামী অন্য চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা

নিষেধ করিয়া ছিলেন। সে সময় সে নিষেধ না মানিলে কোন দোষ ছিল বোধ করি না। কিন্তু তথাপি নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া, তিনি স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া ছিলেন। অন্য কাহারও ঔষধ ব্যবহার করেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে লোকের মুখ বিকৃত হয়। মুখে বিষাদ ভয় ও নৈরাশ্যের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ৺অন্নপূর্ণা দেবীর সেরূপ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষণ দেখি নাই। তাঁহার স্বতঃ প্রফুল্ল মুখ তখনও প্রফুল্ল ছিল, সতী সাধ্বী সে সময় স্পষ্ট দেখিতে পাইতে ছিলেন যে, অনন্ত ময়ের সেই অনন্ত শান্তিময় ক্রোড় তাঁহার জন্য প্রসারিত রহিয়াছে। মঙ্গলময় পিতা যেন প্রিয় দুহিতাকে সেই ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার জন্য বাহু যুগল বিস্তার করিয়াছেন, সেই জন্য সে মুহূর্ত্তেও তাঁহার প্রফুল্লতা।

ক্রমে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। শূন্য দেহ পড়িয়া রহিল। শেষ বার সে মূর্ত্তি দেখিলাম, বোধ হইল, যেন তিনি অনন্ত শান্তি ক্রোড়ে নিরুদ্বেগে শায়িত রহিয়াছেন। তাই বলি তিনি ধার্ম্মিকা ছিলেন।

শ্রীবেণী মাধব চাকী
মোঃ বগুড়া।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয়া অন্নপূর্ণা দেবীর সহিত আমার পরিচয় ছিল। তিনি সাতিশয় নম্রশীলা, উদার হৃদয়া ও সর্ব্ব প্রকার আড়ম্বর ও বিলাস বর্জ্জিতা ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা, ধর্ম্ম ভাব ও চিন্তা-

শক্তি এবং হৃদয় ও মন কিরূপ উচ্চ দরের ছিল, তাহা তাঁহার রচিত প্রবন্ধ গুলি পাঠেই প্রতীয়মান হইবে। তাঁহার জীবন চরিত সর্ব্বত্র প্রীতি জনক ও আদরণীয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৫ই আশ্বিন — শ্রীমোহিনী মোহন বসু
১২৯৮। — হেড মাষ্টার বগুড়া জেলা স্কুল।

দয়াময় সহায়।

নলহটী
২রা অক্টোবর। ১৮৯১।

শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতঃ!

তাপসী দেবী অন্নপূর্ণার অমৃতময় জীবন চরিত প্রকাশ দ্বারা আপনি যে কেবল আপনার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর প্রতি, আপনার গভীর কর্ত্তব্যের ঋণ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত হইবেন, তাহা নহে, এই কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আপনি দেশের নিকট, বিশেষতঃ ব্রাহ্ম সমাজের নিকট আপনার অশেষ ঋণদায় হইতেও মুক্ত হইবেন। সাধু, সাধ্বীর জীবন জগতের নর নারীর সাধারণ সম্পত্তি। দেবীর জীবন প্রচারে জগৎ লাভবান্ হইবে। ধর্ম্মই যে জীবনের বিশেষত্ব ছিল, ধর্ম্ম ধনে যিনি মহা ধনী হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবন চরিত প্রকাশের উপযুক্ত পাত্রই তাঁহার ধর্ম্ম বন্ধু এবং পথের সহায়। ভগবান্ আপনার এই মহৎ কার্য্যের সহায় হউন।

দেবীর সহিত পরিচয় হইয়া আমি পরম লাভবান্ হইয়াছিলাম। তাই তাঁহার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা, এবং কৃতজ্ঞতার কারণ, কিঞ্চিৎ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি সে বৈরাগ্য, সে নির্ভরতা, সে বিশ্বাসের জীবন্ত ছবি কখনই ভুলিতে পারিব না। "অনাসক্ত সংসারী" বাক্যে অনেক বার শুনিয়াছি, জীবনে দেখিয়াছি "তাপসী দেবী অন্নপূর্ণা।"

বিপদ এবং পরীক্ষাই মানুষের প্রকৃত জীবন প্রকাশ করে। বিষম পরীক্ষার মধ্যে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার মুখের এক দিনের একটী কথার মূল্য আমার নিকট এত মূল্যবান্ বোধ হইয়াছিল যে, সমস্ত জীবনে যত উপদেশ লাভ করিয়াছি, তাঁহার সমষ্টির মূল্য ও তাহার সমান হয় না। আপনি ঘোর উন্মাদ-রোগগ্রস্থ। সকলে ঢাকায় অবস্থান করিতেছেন। ঘটনা ক্রমে আমিও তথায় উপস্থিত হইলাম। ঢাকার বন্ধুগণ আপনাকে লিউনাটিক এসাইলমে দিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন। সংসারের যত অভাব, বিপদ, পরীক্ষা, পরিবারটীকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। সকলেই বিষন্ন, উদ্বিগ্ন কেবল একজন দেখিলাম, অটল স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রসন্নতায় উজ্জল। বিপদ, পরীক্ষা এবং অভাব রাশি তাঁহার জীবনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কেবল বাহিরে কিলি, বিলি করিতেছে। অবিশ্বাসী আমি তাঁহাকে বলিলাম, " এত অভাব, চিকিৎসা ও সুশ্রুষাদি চলিবার ভাল রূপ সম্ভাবনা নাই। এসাইলমে চিকিৎসা ও সুশ্রুষার অনেক সুবিধা, তাতে আপনার অমত কেন?" তাপসী হঠাৎ মহা গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইয়া চাহিলেন। কি এক অপূর্ব্ব ভাবে মুহূর্ত্তে মগ্ন হইলেন। কৃপার

ভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ভাই, পরীক্ষা যে আসে, এ তাঁর কত দয়া। আমি ইহাকে আনন্দের সঙ্গে আলিঙ্গন করি; ইহাকে এড়াইয়া যে সচ্ছন্দতা পাইব তাহার জ্বালা আমি সহিতে পারিব না। বেশ চল্‌ছে, বেশ আছি," আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। মনে মনে ভগ্নীকে শত ধন্যবাদ দিলাম, প্রণাম করিলাম।

ভগ্নী এখন এ সংসারে নাই, কিন্তু তাঁহার জীবন চির দিন কার্য্য করিবে। এইরূপ জীবন্ত ধর্ম্মের অভিনয় করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম অবতীর্ণ। ভগ্নীর জীবন দ্বারা, ব্রাহ্ম সমাজ গৌরবান্বিত হইয়াছে। করুণাময় পিতা, ভগ্নীকে অনন্ত শান্তি প্রদান করুণ, এবং এখানে আমাদের সহায় হউন।

স্নেহের ভাই
কুঞ্জ লাল।

মানিকদহ ২৫ শে কার্ত্তিক
১২৯৮।

প্রিয় সুহৃদ শ্রীমন্ত বাবু!

অনেক দিন পরে আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। বিশেষ অন্নপূর্ণার জীবনী বাহির হইয়েছে এ সংবাদ আমার

পক্ষে আহ্লাদ জনক। আপনি তাঁহার সম্বন্ধে আমার মন্তব্য চাহিয়াছেন, আমি কি মন্তব্য প্রকাশ করিব? তাঁহার যে চরিত্র আমার অন্তরে প্রতিফলিত রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করার শক্তি আমার নাই। আমার ন্যায় লোক তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিলে সে চরিত্রের কোন গুণই প্রকাশ হইবে না। আমি তাহার চরিত্রের চিত্র যাহা দেখিয়াছি তাহাও ধরিতে ছুইতে পারিতেছি না। অন্নপূর্ণা দেবী প্রকৃতই দেবী ছিলেন। তাঁহার নিকটে বসিলেই দেবী মূর্ত্তি বন্ধু বান্ধবের মনে নূতন স্বর্গের সৃষ্টি করিত। এই বিলাসিতা-প্রাণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার সেই বিলাস বিমর্ষকর সামান্য পোষাক পরিচ্ছদ ও দীন ভাব, এক দিকে যেমন অকিঞ্চন ভাব প্রকাশ করিত; সতেজ বুদ্ধি, আত্ম সংযম, কর্ত্তব্যের স্থিরতা, বিপদে ধৈর্য্য, নীচাশয়তার প্রতি ভ্রূকুটী, চিত্তের অক্ষুন্ন সরল ভাব, দৃক্‌পাত শূন্য সৎ সাহস এবং জ্ঞানগর্ভ ওজস্বী বাক্য অপর দিকে তেমনই তাঁহার অসীম শক্তির পরিচয় দিত। মনে কোন বিকৃত ভাবের উদয় হইলে তাহার নিকটে যাইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিতাম, ভ্রম সঙ্কুল সঙ্কীর্ণ মত লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে পরিষ্কার আলোক এবং প্রশস্ত অন্তর লইয়া ফিরিতাম, সেই স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত।

তাঁহার জীবনী লেখক উপযুক্ত লোক হইলে জগতে এক আশ্চর্য্য বস্তু দিতে পারিবেন অন্নপূর্ণার জীবন চরিত কে লিখিতেছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন। এখানে আমি যথাসাধ্য

চেষ্টা করিতেছি যে কয়েক জন গ্রাহক করিতে পারি পরে জানাইব।

আপনাদিগের
কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
মোঃ মানিকদহ।

অত্রত্য সুযোগ্য চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গতা সহধর্ম্মিণী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ার সহিত আমার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। তন্নিবন্ধন তাঁহার আচার ব্যবহার, স্বভাব চরিত্র বুদ্ধি মত্তা এবং ধর্ম্মভাব প্রভৃতি বিষয় যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে তিনি যে একজন সুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন তদ্বিষয়ে আমার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। যদিও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লাভ করিয়া তাঁহার নামের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া যান নাই তথাচ আমার স্থির বিশ্বাস তিনি আজ কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারিণী দিগের অপেক্ষায়ও অনেক বিষয়ে উচ্চ আসনের যোগ্য। কারণ তাঁহার শিক্ষা বিদ্যালয়ের সাহায্য না পাইয়া আত্মচেষ্টা দ্বারা লাভ হইয়াছিল এবং তাঁহার বাহ্যিক উচ্চতাপেক্ষা হৃদয়ের মহত্ব অধিক ছিল।

এই মহিলার সৌজন্য, সরলতা, নম্রতা সত্য নিষ্ঠাদি অতীব প্রশংসনীয় গুণ ছিল। ইঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস আমাদিগের মত হইতে বিভিন্ন হইলেও ইহাঁর সেই অবলম্বিত বিশ্বাসের প্রতি যে প্রগাঢ় অটল ভক্তি ও আস্থা ছিল তজ্জন্য ইহাঁকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায়না।

কি শিক্ষিতা কি অশিক্ষিতা সকল রমণীই বেশ ভূষা ভাল বাসিয়া থাকেন। কিন্তু ইনি কোন ক্রমেই তাহার পক্ষ পাতিনী ছিলেন না। হৃদয়ের উন্নতিই ইঁহার আদরনীয় ছিল। বলা বাহুল্য যে সকল গুণ স্ত্রীলোকের থাকা বাঞ্ছনীয় তাহার কোন অংশেই ন্যূনতা ইহাঁতে দেখা যায় নাই।

বগুড়া
২৪ শে পৌষ
১২৯৮ সন } শ্রীতারক নাথ রায়

অদ্য কয়েক বৎসর হয় অন্নপূর্ণা দেবীর আত্মা ভগবত চরণ প্রাপ্তে বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছেন। ইনি যখন ইহলোকে ছিলেন তখন তাঁহার মনঃপ্রান ঈশ্বর প্রেম, পবিত্রতা, সত্য-প্রিয়তা ও দয়া মমতায় অনুরঞ্জিত ছিল। আমার পরিচিত যে, যে, শ্রেণীর লোকই তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সৎ ব্যবহারে ও বিবেক-যুক্ত বাক্যালাপে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। আমার স্মরণ হয় আমার ৺মাতা ঠাকুরাণী প্রথমতঃ যখন অন্নপূর্ণা দেবীর সহিত আলাপ করেন, তখন তিনি মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করিয়া ছিলেন "জাতিচ্যুত হইলেও অন্নপূর্ণা নারী কুলের গৌরব এবং নম্রতা, ভদ্রতা ও সরলতার আদর্শ,,। ২০ বৎসরেরও অধিক কাল আমার সহিত ইহাঁর পরিচয় ছিল। এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে আমি যখনই ইহাঁকে দেখিয়াছি তখনই ইহাকে পবিত্রতা ও সাধুতায় পরিশোভিত বোধ করিয়াছি। ইহাঁর যুক্তি পূর্ণ তর্কে অনেক ভ্রম হইতে আমি উদ্ধার পাইয়াছি।

পারিবারিক অমঙ্গলে ক্লিষ্টমনা হইয়া ইহাঁর সহিত আলাপ করায় ক্লেশের অনেক উপশম হইয়াছে। ইহাঁর অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে শিক্ষা না পাইলেও স্বকীয় চেষ্টায় যে রূপ জ্ঞানোন্নতি করিয়াছিলেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের জন সমাজে যে রূপ মানসিক অবস্থা তাহা বিবেচনা করিলে আমার মতে ইহাঁকে একটি আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি দোষ ঘটেনা। আমি বোধকরি ইহাঁর সুস্নিগ্ধ পবিত্র চরিত্রের সহ মিলনে শ্রীমন্ত বাবুর প্রকৃতির তীক্ষ্ণতা অনেক পরিমানে অপনোদিত হইয়াছিল।

সন ১২৯৮ সন
তাং ২৬ পৌষ } শ্রীকেশব নাথ রায়

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী পরলোকগামিনী অন্নপূর্ণা দেবী অনেক দিবস বগুড়ায় বাস করাতে অনেক দিবস তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং কখন কখন কথা বার্ত্তাও বলিয়াছি তাহাতে আমার বিশ্বাস যে তিনি সচ্চরিত্রা বুদ্ধিমতী এবং ধার্ম্মিকা ছিলেন। ইতি

শ্রীঅনাথ বন্ধু সেন।

দেবী অন্নপূর্ণা।

বগুড়ার বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী অন্নপূর্ণা দেবী বাস্তবিক সহধর্ম্মিণী পদের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, জগতীতলে বিশুদ্ধ প্রণয়াবদ্ধা, সৎ স্বভাবান্বিতা গুণবতী ভার্য্যা অনেকের দেখিয়াছি এবং অনেকের আছে শুনিয়াছি কিন্তু অন্নপূর্ণার মত ধর্ম্মগতপ্রাণা দয়াবতী রমণীরত্ন দ্বিতীয় আর একটী দেখিয়াছি কিনা সম্পূর্ণ সন্দেহ। দয়া, লজ্জা, ধৈর্য্য প্রভৃতি নৈসর্গিক গুণ সমষ্টি সচরাচর স্ত্রী লোকেই দেখা যায় বটে কিন্তু বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব কয় জন স্ত্রী লোকেদেখা যায়? এই পবিত্র ধর্ম্মভাবটী তাঁহাতে বিদ্যমান থাকাতেই মণি-কাঞ্চন সংযোগবৎ অপূর্ব্ব শ্রী সম্পন্না হইয়াছিলেন এবং মানবী হইয়াও যেন দৈব বলে দেবী বলিয়া অনুমিত হইতেন। তাঁহার কর্ত্তব্য পরায়ণতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, বাহ্যাড়ম্বরে নিস্পৃহা, এবং দয়া দেখিলে যেন মূর্ত্তিমতী করুণা শ্রীমন্ত বাবুর গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইত।

অনেকে (নিজেও জানি)বিপদে পড়িলে "বিপদি ধৈর্য্যং" ভুলিয়া গিয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া আত্মহারা হইয়া যায়, এবং বিপদ ব্যঞ্জক ঘোর কালিমা আসিয়া তাহাদের বদন মণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। কিন্তু আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি বিপদেও তাঁহার সেই চির প্রসন্ন ভাবের একটুও এদিক ওদিক হয় নাই। বরং ঈশ্বরে দৃঢ়ানুরাগ ও দৃঢ় বিশ্বাস যেন আরও দৃঢ়তর হইত।

তাঁহার আরও একটী বিশেষ গুণ ছিল, পর দুঃখে কাতরতা। আমার স্ত্রী এক দিন দারুণ প্রসব বেদনায় অস্থির হইয়া সমস্ত

দিন ও রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করিয়াছিল। ঐ সময় আমি শ্রীমন্ত বাবুকে ডাকিতে গেলাম, যাইয়া দেখি শ্রীমন্ত বাবু তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন। অন্নপূর্ণা দেবী ভীষণ নিমোনিয়া জ্বরে প্রায় সজ্ঞাহীনা। কেবল প্রত্যেক বার শ্বাস কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে (আহা উহুর পরিবর্ত্তে) হরি বল, হরি বল, হরি বল বলিতেছেন। আমি শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন শ্বাস কষ্ট হওয়াতেই বড় যাতনা হইয়াছে। আমি এই অবস্থা দেখিয়া যে জন্ত গিয়াছিলাম তাহা বলিতে সাহস পাইতেছি না; এমন সময় শ্রীমন্ত বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "এত রাত্রে আপনার আসার কারণ কি?" আমি সুযোগ পাইয়া আমার স্ত্রীর অবস্থা বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া পাশ ফিরিতে অসমর্থা অন্নপূর্ণা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, আমি দেখিতে যাইব। আমিত দেখিয়া শুনিয়া অবাক। পরিশেষে শ্রীমন্ত বাবু ও আমি উভয়ে তাঁহাকে বুঝাইয়া সে রাত্রিতে যাওয়া রহিত করিয়া দিলাম। কিন্তু শ্রীমন্ত বাবুকে তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। বাসায় আসিয়াই শুনিলাম ভগবানের কৃপায় একটী কন্তা সন্তান জন্মিয়াছে এইরূপে আরও অনেক বিষয় মনে আছে, কিন্তু সমস্ত বিষয় লিখিতে গেলে এক খানি পুস্তক হইয়া পড়ে।

একটী দীপ শিখা হইতে অপর একটী দীপ জালিলে যেমন পরবর্ত্তী দীপটীও তদ্রূপ তেজস্বী ও উজ্জল হয় অন্নপূর্ণার কন্তা সুশীলাও ঠিক সেইরূপ হইয়াছেন। শ্রীমন্ত বাবু যখন ক্ষিপ্তাবস্থায় জেলে প্রেরিত হন, অন্নপূর্ণা দেবী তখন রুগ্নাবস্থায়

শয্যা-শায়িতা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ বিপদ-পাতেও তাঁহার অপ্রসন্নতা বা ঈশ্বরে একান্তানুরাগের কোন রূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। বরং ঈশ্বরে অনুরাগ আরও দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতে ছিল।

দেবী অন্নপূর্ণার যখন জীবন দীপ নির্ব্বাণ হওয়ার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল (আমি তখন নিকটেই) তখন আমরা কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান সন্ততির গতি কি হইবে ভাবিতে ছিলাম তখনও তিনি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ দ্বারা উর্দ্ধ দেখাইয়া অর্দ্ধ পরিস্ফুট ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "ভগবান আছেন"। দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধ ঘটিকা পরেই হরি বল, হরি বল, বলিয়াই তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গেল। সেই দিন হইতেই অন্নপূর্ণাকে হারাইয়া শ্রীমন্ত বাবু পুনরায় বহরামপুর জেলে প্রেরিত হইলেন ইতি ১২৯৮ সন ২৮ পৌষ।

শ্রীশ্রীমন্ত রায় কবিরাজ।
বগুড়া।

প্রিয় সুহৃদ শ্রীমন্ত বাবু!

অনেক দিন হইল আমার কলিকাতা অবস্থিতি কালে আপনারা সপরিবারে তথায় ভ্রমণ করিতে গমন করিয়া ছিলেন। ভগবানের কৃপায় আপনাদিগের সহিত তদবধি আমার বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিয়া ছিল। অতঃপর বগুড়ায় প্রত্যাগমন করিয়া মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের বগুড়াস্থ বাস ভবনে গমন করিতাম।

মনে অশান্তি উৎপন্ন হইলে, আপনাদিগের সদালাপে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইতাম। বিশেষতঃ আপনার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণী অন্নপূর্ণা দেবীর সদাচার ও ধর্ম্মভাবে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া ছিলাম। তাঁহার ভক্তি বিগলিত সরল অন্তকরণ আমার হৃদয়ে ভক্তি ভাব উদ্দীপিত করিয়াছে। যদিও তিনি কোন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া কোন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই তথাপি পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে স্বয়ং এ প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় বিদুষী রমণীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার পতি-ভক্তি অতুলনীয়া। বিষয় ব্যাপারে তিনি ছায়ার ন্যায় আপনার অনুবর্ত্তিনী ছিলেন, তবে ধর্ম্মভাবে আপনাকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে অতিক্রম করিয়া ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। প্রেম ভক্তি ঈশ্বরের নিষ্ঠাই তাঁহার অলঙ্কার ছিল সাধারণ স্ত্রীগণের ন্যায় তাঁহার স্বর্ণাভরণ পরিধানের লালসা এক দিনও দৃষ্ট হয় নাই। পশ্চিম ভ্রমণ কালে দিল্লী নগরে এক দিবস আপনি আমাকে তাঁহার লিখিত এক খানি পত্র দেখাইয়া ছিলেন তাহার ভাষা ও ভাবে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া ছিলাম তাঁহার ন্যায় আদর্শস্থানীয়া রমণীর জীবন চরিত লিপি বদ্ধ থাকা নিতান্তই প্রয়োজন।

বশম্বদ

শ্রীযাদব লাল রায়।

পরমারাধ্যা স্বর্গীয়া অন্নপূর্ণা দেবীর জীবন সম্বন্ধে আমার মন্তব্য।

প্রায় ছয় বৎসর কাল আমি তাঁহার স্নেহে প্রতিপালিত হইয়া পরম সুখে বগুড়াতে বাস করিয়াছি। তিনি আমাকে সর্ব্বদা সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছেন। শত অপরাধ করিলেও তাঁহার বিরক্তি ভাব আমি কখনও দেখি নাই। ঈশ্বর প্রেমে তাঁহার মন সর্ব্বদা মোহিত ছিল। পার্থিব সুখ দুঃখে তাঁহার মন বিচলিত হইত না। তাঁহার জীবন এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে পূর্ণ ছিল। সাংসারিক নানা প্রকার অনটন বশতঃ কিম্বা শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তাঁহার সে জ্যোতির তিরোধান হইত না। ঈশ্বর তাঁহাকে নানা প্রকার পার্থিব কষ্ট দ্বারা অনেক বার পরীক্ষা করিয়াছেন তিনি অম্লান বদনে সে সকল কষ্ট সহ্য করিয়া তাঁহার মধ্যে ইশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

সত্য তাঁহার জীবনের অবলম্বন ছিল। কেহ অসত্য ব্যবহার করিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। তিনি জীবনে কখনও সত্যভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না তাঁহার উপদেশের মধ্যে এই প্রধান "সত্যই ধর্ম্মের মূল।" তিনি জীবনের প্রধান অবলম্বন সেই ঈশ্বরকে পাইয়াছিলেন।

দয়া তাঁহার জীবনের ভূষণ ছিল। কাহার দুঃখ দেখিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। সর্ব্বস্ব দিলে ও যদি কাহার দুঃখের বিন্দু মাত্র লাঘব হয়, তবে তাহাও দিতে তাঁহার একবার চিন্তা হইত না। কিসে গরীবদের অবস্থা পরিবর্ত্তন হবে এই চিন্তা তাঁহার জীবনের একটী প্রধান বিষয় ছিল। শত বিঘ্ন

বাধা থাকিলেও নিয়মিত সময় উপাসনা করিতে কখন তাঁহার আলস্য দেখি নাই। আমি তাঁহার ন্যায় সত্যবাদী জিতেন্দ্রীয়, দয়াবতী রমণী আর দেখি নাই।

৬ই আশ্বিন } শ্রীমহেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়
১২৯৮ সন। } ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীচরণেষু—

আপনার কার্ড খানা সময় মতই পাইয়াছি, অনেক দিন পরে আপনাদের কুশল সংবাদ পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। অন্নপূর্ণারজীবন চরিত প্রকাশ করিতেছেন, বড়ই সুখের কথা, আমাকে ক্ষমা করিবেন যাঁহাকে দেবী বলিয়া জানি তাঁহার চরিত্রের বিন্দু মাত্রও লিখিবার উপযুক্তা আজও আমি হইতে পারি নাই, এই আমার বিশ্বাস। আপনি ইহাতে কিছু মনে করিবেন না। ৫৲ টী টাকা পাঠাইলাম প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন। আশা করি অন্নপূর্ণার জীবনী পাঠে আমাদের দেশীয়া ভগিনীগণ কেহ যদি কিছু লাভ করিতে পারেন তবেই তাঁহারা ধন্যা হইবেন।

আপনাদের স্নেহের
রাধারাণী।

স্নগন্ধি গোলাপ সম পবিত্র জীবন।
ক্ষণ স্থায়ী হইলেও প্রেম নিকেতন॥

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় ইহলোকে নাই। অনিত্য সংসারের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতঃ তিনি এখন চির শান্তির অধিকারিণী হইয়া মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি এখনও আমার স্মৃতি পটে জীবিতবৎ অঙ্কিত রহিয়াছে, সেই সরলতাব্যঞ্জক হাসি ভরা মুখ খানি আমি এখনও মনশ্চক্ষুতে সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতেছি, এবং তাঁহার সুধা মাখা ও শান্তিপ্রদ কথা গুলি এখনও আমার কর্ণে লাগিয়া রহিয়াছে। নশ্বর দেহ ব্যতীত যাঁহার সমস্ত স্বত্বাই আমরা উপলব্ধি করিতেছি, আক্ষেপের বিষয় সেই সরলতা ও পবিত্রতার আধার এ জন্মের মত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তি ধামে চলিয়া গিয়াছেন।

তিনিই বগুড়া আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠাত্রী, এবং সেই আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় লইয়াই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। আমার শুষ্ক ও নীরস জীবনে দয়া, মায়া ও স্নেহ ভাল বাসার বীজ তিনিই বপন করেন, সুতরাং তাঁহার নিকট আমি অনেক পরিমাণে ঋণী। তাঁহার পবিত্র জীবনী অনেকেই অবগত আছেন, সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার ন্যায় বিদুষী ও ধর্ম্ম পরায়ণা সতী সাধ্বী স্ত্রী অতি অল্পই আমার নয়ন গোচর হইয়াছে। বিষয় কার্য্যের ঝঞ্চটের পর, যে কিছু অবকাশ পাইতাম আমি তাহা তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে ও তাঁহার সহিত একত্রে ধর্ম্মগ্রন্থ

পাঠে অতিবাহিত করিতাম। তাঁহার ধারণা শক্তি এমনই প্রবলা ছিল যে বিদেশীয় ভাষায় লিখিত দুরূহ গ্রন্থাদি তাঁহাকে শুনাইলে তিনি সে গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে এমত ভাবে সমালোচনা করিতেন যে, সকলেই তাহা শুনিয়া অবাক হইতেন। তিনি কখনও রীতিমত বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করেন নাই। বাল্যকালে তাহার সে সুবিধা ছিলনা। বিবাহের পর নিজ চেষ্টায় এবং স্বামীর সাহায্যে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। আমি সুলেখিকা বঙ্গ মহিলাদিগের অনেকেরই রচনা পাঠ করিয়াছি। তাঁহাদের অনেকেই উপন্যাস প্রভৃতি অল্প চিন্তার পরিচায়ক গ্রন্থাদি লিখিয়া সকলের নিকট পরিচিতা হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমার সামান্য বিবেচনায় প্রগাঢ় চিন্তা-শীলতার পরিচায়ক দুরূহ বিষয় মধুর ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিবার ক্ষমতা কেবল শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ারই ছিল। তাঁহার নিকট আমাদের যে আশা ছিল তাহার শতাংশের একাংশ পরিপূর্ণ হইতে না হইতেই তিনি অকালে কাল গ্রাসে পতিতা হওয়ায় আমাদের সমস্ত আশা ভরসাই নির্ম্মূল হইয়াছে।

তাঁহার পরিচিত সমস্ত লোকেই এক মুখে তাঁহার প্রশংসা করেন। তাঁহাকে ভাল বাসিবার ও শ্রদ্ধা করিবার অনেক লোক থাকা স্বত্বেও আমার মনে একটু বিশেষ সান্ত্বনার কারণ এই আছে যে, তাঁহার সমাধি কালে আমি তাঁহার ন্যায় গুণবতী ও সতী সাধ্বী রমণী-রত্নের পদ দ্বয় সাদরে ও ভক্তি সহকারে স্বহস্তে ধারণ করতঃ তাঁহার প্রাণহীন পবিত্র দেহকে চির শান্তির ক্রোড়ে শায়িত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। সেই পবিত্র ও প্রশান্ত মূর্ত্তি যাবজ্জীবন আমার মানস-

পটে সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত থাকিবে ও আমি সততই ভগবান সকাশে তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করিব।

বগুড়া,
২৯শে জানুয়ারী
১৮৯২ সন। 　　　　শ্রীবাহার উদ্দীন আহমেদ।

অন্নপূর্ণার চরিত্র সাধারনে প্রচার হইতে যাইতেছে। যদিও পুস্তকাকারে না হউক কিন্তু সংখ্যায় বহু লোকে অন্নপূর্ণার চরিত্র অনেকাংশে বিদিত আছেন।

জেলা বগুড়ার সুতরাপুর পাড়ায় ইঁহার বাস ছিল এবং তাঁহার বাসা ও আমার বাসা অবিচ্ছেদ সংলগ্ন। প্রতিবেশী ও ভাল বাসা সূত্রে এক পরিবারস্থ ব্যক্তির ন্যায়, এরূপ ভাবে অবিচ্ছেদ ছিল যে, কোন প্রকার পার্থক্য জ্ঞান তাহার মনে উদয় হওয়া উপলব্ধি হইত না। বস্তুতঃ তদ্রূপ পৃথক ধারণাই তাঁহার ছিলনা।

ইঁহার জীবন সতত ধর্ম্মে লিপ্ত থাকিত এবং ধর্ম্ম নিহিত জীবনে চরিত্রের নির্ম্মল অংশ যেরূপ বাহিকে প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহা ইঁহার চরিত্রে নিয়তই প্রকাশ পাইত।

কোন জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক অংশ গুলি প্রকাশ করা অতি সহজ নয়, তদ্রূপ অন্নপূর্ণার জীবনের সমস্ত অংশ গুলিও সম্পুর্ণ প্রকাশ করিতে যাইতেছিনা এবং তদ্রূপ সাধ্য ও সময় আমার নাই। কয়টী ঘটনা মাত্র উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি।

অন্নপূর্ণার কখন রাগ দেখি নাই এবং পতির প্রতি অটল প্রেম ও ভাল বাসা দৃঢ় রূপে লক্ষ্য করিয়াছি। বাহ্যিক শাসন ভিন্ন, সন্তান সন্ততি দিগকে মিষ্ট বাক্যে যে রূপ কর্ত্তব্য পরায়ণ করিতে অন্নপূর্ণা উপদেশ দিতেন, তাহাতে অসভ্যোচিত শাসন ব্যতীত যে তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে ইহা অন্নপূর্ণা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিভেদে কর্ত্তব্যোপদেশেরও প্রভেদ ছিল। জ্ঞান-গর্ভ আলাপে গল্পচ্ছলে এরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিবার শক্তি ছিল যে তাহাতে বিনা জোরে অন্য হৃদয়ে উপদেশ গুলি স্বভাব রূপে প্রবেশ করিত, আরো উহা কেবল গল্প-কৌশলে অন্য হৃদয়ে প্রবেশের অভিপ্রায় অন্নপূর্ণার ছিল না। সত্য সত্যই তিনি নিজে সেই চরিত্রের আদর্শ, ইহা কার্য্যের দ্বারা দেখাইতেন। আমার দ্বিতীয়া কন্যার জন্ম সময়ের একটী ঘটনা আমার মনে আছে। প্রসবের দুই দিন পরে অকস্মাৎ সূতিকা গৃহের অগ্নিতে গৃহখানি দগ্ধ হইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ অন্নপূর্ণা উপস্থিত হইয়া প্রায় ৪। ৫ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতি ও নবপ্রসূতা কন্যাকে যেরূপ সুশ্রূসা ও যত্ন করিয়া ছিলেন তাহা দেখিলে অন্নপূর্ণার ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়াই পারা যায় না। যাঁহার হৃদয়ের অতলের তলে ঈশ্বর প্রেম বদ্ধ না থাকে সে এরূপ নিস্বার্থ ছায়া দেখাইতে পারে না। আমাদের দেশে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত প্রসবের পর স্পর্শ করা অশুচি-বোধ প্রথা প্রচলিত আছে এবং এই প্রথা, ক্রমে এত দূর শাখা প্রশাখাতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে সহসা জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিতেও অশুচি বোধে বাধা দেয়। ঐ সময় অন্নপূর্ণা না হইলে আমার বিশ্বাস অনুসারে বলিতে পারি প্রসূতি এবং

নব জাতা কন্যার জীবন সংশয় হইত। এই রূপ আরো একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। আমার তৃতীয় পুত্র হওয়ার সময়ে আমার স্ত্রী একটী গুরুতর পীড়ায় উত্থান শক্তি রহিতাবস্থায় থাকিত, ঐ অবস্থায় প্রসব হইলে উপরোক্ত অশুচি প্রথা মূলে প্রসূতির জীবনের আশা ছাড়িয়া দিতে হয়, বস্তুতঃ অন্নপূর্ণা না থাকিলে আমারও তাহাই হইত। আমার জীবন পর্য্যন্ত মনে থাকিবে যে, যে দিন, আমার স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, সেই দিন বগুড়া জেলার মুরইল নিবাসী, বগুড়ার উকীল বাবু গোপাল কিশোর ধর মহাশয়ের বাটীতে অন্নপূর্ণার স্বামী (যিনি আমার এক জন অকৃত্রিম সুহৃদ) শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় ডাক্তারকে লইতে চেষ্টা হয়, কিন্তু তখন আমার স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা শোচনীয় এবং অনিষ্ট আশঙ্কা ভাবিয়া সেই দিন অন্নপূর্ণা শ্রীমন্ত বাবুকে হটাৎ আবশ্যক মত ডাকিলে সহজে পাওয়া যাইতে পারে এরূপ ভাবে সহরের মধ্যে ভিন্ন, বাহিরে চিকিৎসায় যাইতে নিষেধ করেন এবং শ্রীমন্ত বাবু "আমার সে চিন্তা আছে'' এই উত্তর দেন। আমার অসাক্ষাতে উহাঁদের ঐ কথা গুলি দেওয়ালের বাহিরে থাকিয়া আমি নিজ কর্ণে শুনিতে পাই। কাহার অসাক্ষাতে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে আলোচনায় মনের গতি যে রূপ হইতে পারে, তাহা যাঁহাদের কখন ঘটিয়াছে, তাঁহারা সেই উপলক্ষে শত্রু এবং বন্ধু সহজে উপলব্ধি করিয়া চিনিতে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমার সম্বন্ধে অন্নপূর্ণার স্বামী, স্ত্রীর এই রূপ প্রতিবেশীর মঙ্গল-জনক-চিন্তা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের গন্ধে সেই দিন হইতে

অন্নপূর্ণাকে দেবী বলিয়া আমার মনে প্রতীতি জন্মে। তখন শ্রীমন্ত বাবু সহরের বাহিরে দৈনিক ১০৲ দশ টাকা হিসাবে ভিজিট লইতেন, বলা বাহুল্য যে সে দিন শ্রীমন্ত সহর ছাড়িয়া যাওয়া দূরে থাকুক সহরের মধ্যে দূরেও যান নাই এবং অন্নপূর্ণা উদ্বিগ্ন চিত্তে সর্ব্বদা প্রসব কালের প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। আমি সেই দিন হইতে অন্নপূর্ণাকে পত্র লিখিতে তাঁহার নামের পূর্ব্বে "দেবী" শব্দ উল্লেখ করিতাম, তৎপরে সেই দিন আমার স্ত্রী সন্ধ্যার পর সন্তান প্রসব করে। প্রসব বেদনার সময় হইতে প্রসবের পর পর্য্যন্ত অন্নপূর্ণা সূতিকা গৃহেই ছিলেন। এবং প্রসূতি ও প্রসূত সন্তানকে যে ভাবে সুশ্রূসা করিয়া সেবায় আমার স্ত্রীর জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাহা সরল চরিত্রের না হইলে হিংসা, দ্বেষ ও কাল্পনিক স্বভাব বিশিষ্ট মান-প্রিয় মানুষ কখনই করিতে বা ওরূপ নিস্বার্থ উপকার দেখাইতে পারে না।

অন্নপূর্ণার চরিত্রের সম্যক অংশ প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত একথা উপরেই বলিয়াছি এবং তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে "স্বচ্চরিত্র" কেবল এই বলিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিনা। আমি তাঁহার চরিত্র, ঘটনা ও কার্য্য এবং ব্যবহার দ্বারা পরীক্ষিত, বুঝিয়া জানি যে তাঁহার উপদেশ গুলি কেবল মৌখিক ছিল না; তাহা তাঁহার আপন ব্যবহারের সহিত অকৃত্রিম ভাবে যোগ দিয়া বুঝাইয়া দিতেন।

অন্নপূর্ণার দ্বারা সংসারিক ও পারিবারিক অন্যান্য অনেক উপকার আমি পাইয়াছি। কোনটাতেই কৃত্রিমতা বা স্বার্থপরতা দেখি নাই ও তাহা ছিল না। তিনি আপন ব্যবহারে আমার পরিবার বর্গকে এরূপে আয়ত্ব করিয়া ছিলেন যে আমার-

সন্তান সন্ততিরা ও তাঁহাকে বিভিন্ন বোধ করিতে পারে নাই শেষে মাসিমা বলিয়া আত্মীয় ভাবের উচ্ছাসে মিশিয়া যায়।

অন্নপূর্ণার কখন রাগ দেখি নাই এবং বিপদে বিচলিত হইতেন না। তিনি আপন হৃদয় ঈশ্বরে অর্পণ করা উচিত বলিয়া যে উপদেশ দিতেন তাহাতেও নিজের হৃদ্গত ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মৃত্যু সময় যখন ছট্‌ফট্‌ করেন যাহা আমাদের দেশে "শয্যা কণ্টক" নামে প্রচলিত। সেই সময় শ্রীমন্ত বাবু ও "মন্মথ" নামে অপর একটী ব্যক্তি অন্নপূর্ণাকে ওরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমাকে ডাকে"। শ্রীমন্ত বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ডাকে? উত্তর "ঈশ্বর" এই অন্নপূর্ণার শেষ বাক্য এবং একটী ব্রহ্ম সঙ্গীত, সম্পূর্ণ শেষ না হইতেই অন্নপূর্ণা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। নিরন্তর ঈশ্বর ভাবে হৃদয় গঠিত করিতে না পারিলে মৃত্যু শয্যায়, মৃত্যু যন্ত্রণায়, মৃত্যু সময়ে "ঈশ্বর" এই জ্ঞানে প্রাণ-ত্যাগ করিতে পারা যায় না ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অন্ন-পূর্ণার হৃদয় যে ঈশ্বরময় ছিল ইহা তাঁহার মৃত্যু সময় শয্যা-পার্শ্বে থাকিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

কাহার জীবনের ঘটনাবলী প্রকাশ করিতে অনেক সময় জীবিত ব্যক্তির ঘটনারও উল্লেখ প্রয়োজন হইয়া থাকে যদিও তাহা সঙ্গত না হউক কিন্তু মৃত ব্যক্তির জীবনের সহিত যে পর্য্যন্ত জীবিত ব্যক্তির আচরণের সংশ্রব থাকে সে পর্য্যন্ত প্রকাশ করা অসঙ্গত মনে করি না।

দেবী অন্নপূর্ণা যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন তাঁহার স্বামী শ্রীমন্ত বাবু দৈব ঘটনায় পড়িয়া স্বামীর কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ রূপে

প্রতিপালন করিতে স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন। তিনি তখন স্বাধীন ভাবে অন্নপূর্ণাকে তত্ত্বাবধান করিতে সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই এমন কি অন্নপূর্ণার মৃত্যু সময় শেষ সাক্ষাতের জন্য উভয়কে একবার একত্র করা হয়। সেই সময়ের একটী ঘটনা উল্লেখ করা আবশ্যক।

শ্রীমন্ত বাবু সহকারে যখন ভূবনেশ্বর গুপ্ত স্কুলের ডিপুটী ইনেস্পেক্টারের বাসা হইতে আসি, তখন আমি শ্রীমন্তকে জিজ্ঞাসা করি, "অন্নপূর্ণার পীড়ার ঠিক অবস্থা কিরূপ বোধ হয়"। শ্রীমন্ত বাবু বলেন; "এরূপ পীড়ায় আমি কখন কোন রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখি নাই। তবে যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ আমি নিজে চিকিৎসা করিয়া তৃপ্তি লাভ করি এই আমার ইচ্ছা"। বস্তুতঃ অন্নপূর্ণা তখন অন্য চিকিৎসকের ঔষধ ব্যবহার করিতে শ্রীমন্তের নিষেধ ছিল। তাহার উদ্দেশ্য এই উপলব্ধি হয় যে, অপর কাহার ঔষধ ব্যবহারের ভ্রম শ্রীমন্তের হৃদয়ে চির দিনের তরে কষ্টপ্রদ হইয়া না থাকে। বাস্তবিক ঘটনাচক্রে তাহাই হইয়াছে। অন্নপূর্ণাকে অন্য চিকিৎসকের ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং ঐরূপ অসামান্যা স্ত্রীর বিয়োগে, বিশেষতঃ বিয়োগ সময়ে দৈব বিড়ম্বনায়, স্বামীর সম্যক কর্ত্তব্য দেখাইতে না পারায়, সেই স্বামী স্ত্রীর চরিত্র আপন জীবনের সহিত চিরকালের তরে মিশাইয়া রাখিতে মনস্থ করিয়া অন্নপূর্ণার জীবন চরিত লিখিতে ইচ্ছা করা আহ্লাদের বিষয় বটে এবং স্বামীর কর্ত্তব্য পরায়ণতার পরিচয়ও বটে।

আমি আরও একটী জীবিত ব্যক্তির আচরণ উল্লেখ করিব। তাহা অন্নপূর্ণার প্রথমা কন্যা সুশীলা সম্বন্ধীয়।

যখন শ্রীমন্ত বাবু অন্নপূর্ণা দেবীকে সতত তত্ত্বাবধান করিতে বঞ্চিত ছিলেন তখন এই সুশীলার প্রতি সমস্ত কার্য্য ও কর্ত্তব্য অর্পিত হইয়াছিল। তাৎকালিক দুরবস্থার সময়ে, এক মাত্র সংসারের রক্ষক ও আশ্রয়,–পিতার অনুপস্থানে সুশীলা কর্ত্তব্য ভ্রষ্টা হয় নাই। কিম্বা সে প্রাত্যহিক ঈশ্বর-ধ্যানও ত্যাগ করে নাই। ঐ সময়ে উপাসনার সময় সুশীলা প্রার্থনা করিত যে, "আমি যেন মাতার প্রতি এই সময়ে কন্যার কর্ত্তব্য প্রদর্শন ও প্রতি-পালন করিতে পরাঙ্মুখ না হই এবং আলস্য যেন আমাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করিতে না পারে।" প্রকৃতই সুশীলা যেরূপ অবস্থায় পড়িয়া, অনাহারে ও অনিদ্রায় আলস্য পরিত্যাগ করতঃ অন্ন-পূর্ণার সুশ্রূসা ও নিয়মিত ঔষধ এবং পথ্যাদি প্রদান করিয়াছে। তাহার সমস্ত কার্য্য গুলি যিনি স্বচক্ষে দেখিয়া তাৎকালীক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াছেন তিনি কন্যার কর্ত্তব্য, সাধ্যাতীত হইলেও কিরূপে প্রতিপালন করা যাইতে পারে তৎ-সম্বন্ধে সে ভাব অনুমানে উপলব্ধি করিতে সম্যক পারগ নহেন। বস্তুতঃ ঈশ্বর ভাবের দ্বারা সুশীলার অসাধ্যও সাধ্যসীমা উল্লঙ্ঘন করিতে পারিয়াছিল না। এই জন্য সংসারে লোকে পুত্র কন্যার কামনা করিয়া থাকে। বোধ হয় এরূপ আশা "কামনা" বলিয়া পরিহার করা সংসারীর পক্ষে সঙ্গত নহে।

যে সংসারে এইরূপ সন্তান জন্মে আমার মতে সে সংসার ও সন্তান উভয়ই ধন্য ইতি।

শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ খাঁ
মোঃ বগুড়া।

আমি অন্নপূর্ণার কথা কি জানাইব? আমি লিখা পড়া কিছুই জানি না। সুশীলার মার কথা মনে করিলে আমার চক্ষে জল আসে। শ্রীমন্ত বাবু সুশীলার মাকে মনে রাখিয়াছেন এবং তার জন্যে পুথি লিখিতেছেন এটা বড়ই সুখের কথা। স্ত্রী মরিয়া গেলে যে স্বামী তাঁহাকে ভুলে না সেই যথার্থ স্বামী।

অন্নপূর্ণা আমাকে দিদি বলিয়া ডাকিত, আমি ও তাহাকে ছোট বোনের মত ভাবিতাম। সুশীলার মার মত ভাল মেয়ে-মানুষ আমি দেখি নাই। আমি তার কাছে অনেক উপদেশ ও উপকার পাইয়াছি। আমার সন্তান হওয়ার সময় সে নিজেই আতুড় ঘরে গিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছে। যখন মনে বড় কষ্ট হইয়াছে তখন সুশীলার মার মিষ্ট উপদেশে সে দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছি। শোকী-তাপির পক্ষে সুশীলার মা একটী ঔষধ ছিল। আর এজন্মে তাহাকে পাইব না এই দুঃখ। মা ভগবতী তাহাকে ভালবাসা দিয়া গড়াইয়াছিল। সে এখন স্বর্গে গিয়াছে আমরা সংসারে পড়িয়া আছি। হাজার দুঃখ কষ্টের সময় সুশীলার মার দেখা পাইলে এবং তার কথা শুনিলে সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতাম। তখন ভাবিতাম ভগবতী সুশীলার মাকে না জানি কি দিয়া বানাইয়াছে। অন্নপূর্ণার রাগ, অহঙ্কার ছিল না। সারা দিনই হাসি মুখে থাকিত। সে কাহাকে কটু কথা বলিতে শুনি নাই। কাহার ঝগড়া শুনিলে অন্নপূর্ণা বলিত মানুষে কি করিয়া ঝগড়া করিতে পারে। আহা! শ্রীমন্ত বাবু পাগল না হইলে এবং সকলে তাহাকে ফাটকে না দিলে সুশীলার মা আরো অনেক দিন বাঁচিত। তখন সকলে ভাবিল শ্রীমন্ত বাবু ফাটকে গেলে সে ভাল হইবে কিন্তু তার শোকে সুশীলার মা যে মরিয়া

যাইবে তাহা কেহই ভাবিল না। মা ভগবতী স্বামী বিনে স্ত্রী লোকের পক্ষে আর কে আছে? তুমি সুশীলার মারে মা হইয়া কোলে করিয়া রাখ। ইতি

শ্রী বামা সুন্দরী দেবী।

জেলা বগুড়ার সুতরাপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার মহাশয় বহু দিন বগুড়াতে থাকিয়া, চিকীৎসা ব্যবসা করিতেছেন। তিনি যে এক জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহার পত্নী স্বর্গীয়া অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় সর্ব্ব বিষয়ে স্বীয় ভর্ত্তার অনুগামিনী হইয়া, অতি পবিত্র ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে এক জন বিশুদ্ধ স্বভাবা ও মনীষী সম্পন্না মহিলা ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমাদের অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত একবার প্রগাঢ় রূপে আলাপ করিয়াছেন, তাঁহাকেই একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। দুই চারি দিন, নয় প্রায় ১০ বৎসর তাহার সহিত আমার পরিচয় ছিল। আমি তাঁহার মত বাঙ্গালা ভাষায় বুৎপন্না স্ত্রী লোক আর দেখি নাই। এরূপ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না, বাঙ্গালা ভাষাতে তাঁহার এরূপ বুৎপত্তি ছিল যে, তিনি সময়ে সময়ে যে সকল প্রবন্ধ রচনা করিতেন, তাহা অনেকের নিকটেই সাদরে পরিগৃহীত হইত। সাম্প্রদায়িকতা পরিশূন্য, উদার ধর্ম্মভাব তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজমান ছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যখন যে আলাপ

যা তর্ক বিতর্ক করিতেন, তাহা অতিবিশুদ্ধ ও গভীর ভাব পরি-পূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তাঁহার এই একটী বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি তর্ক স্থলে অযৌক্তিক স্বমত পোষক যুক্তি কথনই প্রয়োগ করিতেন না। শান্ত ও সরল ভাবে নিজ মতের পোষকতা করিতেন। তাঁহার যুক্তি সকল পুস্তক পঠিতের ন্যায় বলিয়া বোধ হইত না, যেন এই সকল যুক্তি ও ভাব তাঁহার হৃদয় কন্দর হইতে স্বতঃই বহির্গত হইত। বিশেষ যখন তিনি ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহার উদারতা ও ভক্তি ভাব অবলোকন করিয়া আমরা বিমোহিত হইতাম। তাঁহার সদুপদেশ পূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, হৃদয়ে ধর্ম্ম ভাবের উচ্ছাস না হইয়া যাইত না। তিনি যখন উপাসনা স্থলে উপস্থিত হইতেন, তখন তাঁহাকে প্রাচীন ভারতীয় ঋষি-কন্যা বলিয়া আমার ভ্রম হইত। অর্থাৎ পুরাণাদিতে বর্ণিত ঋষিকন্যা দিগের দৃশ্যটী তখন আমার হৃদয়ে প্রকটীত হইত। একথা আমি আমার পরিবারের মধ্যে অনেক সময় বলিয়াছি ও এখনও বলিয়া থাকি যে, স্বর্গীয়া অন্নপূর্ণা দেবী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী ভারতীয় প্রাচীনঋষিকন্যা। তাঁহার ভগবানের উপর এত দূর নির্ভরতা ছিল যে, তাঁহাকে আমরা তাঁহার পতির উন্মাদাবস্থায় শিশু সন্তান সহ সংসারিক বহুবিধ কষ্টে পড়িয়াও এক দিনের জন্যও হা হতাশ করিতে শুনি নাই বা বাহ্য দৃশ্যে কোন রূপ বিষন্ন ভাব পরিদর্শন করি নাই। তিনি অম্লান বদনে বলিতেন "সকলই ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছা, তাঁহার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। আমরা তাঁহার প্রতিদ্বন্দী হইয়া কি করিতে পারি, বা ব্যাকুল হইয়া কি ফল লাভ হইবে।" এরূপ অনেক সময়ে

তাঁহার হৃদয়ের ধর্ম্মবল দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি ও তাঁহাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়াছি। তিনি স্বীয় পতির ও সন্তান দিগের সুখ সচ্ছন্দতার জন্য বহুবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ধৈর্য্যশীলা রমণী আমার জীবনে আর আমি দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। তবে সীতা, দয়মন্তী ও দ্রৌপদীর কথা পুরাণে পাঠ করিয়াছি মাত্র। অধিক কি তিনি কোন বিষয়েই পতির বিরোধিনী ছিলেন না।

"নাস্তি ভার্য্যা সম বন্ধু সহায় ধর্ম্ম সাধনে" বাস্তবিক শ্রীমন্ত বাবুর ভাগ্যে সর্ব্ব বিষয়ে তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি সাংসারিক কার্য্য কলাপ নির্ব্বাহেও বিশেষ পারদর্শিণী ছিলেন। যেরূপ শিক্ষা দিলে সন্তানেরা পরিণামে ধর্ম্ম পরায়ণ ও সৎ স্বভাবান্বিত হয়, সেইরূপে শিক্ষা দিতেও তিনি বিশেষ সক্ষম ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা গুণে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলাকে আমরা প্রকৃত সুশীলা বলিয়া দেখিতেছি। বাস্তবিক তিনি মনুষ্য জীবনের অনেক কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরলোকগামিনী হইয়াছেন। আমরা তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। ইদানীন্তন বাঙ্গালী দিগের মধ্যে, তিনি যে এক জন আদর্শ মহিলা তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা ভগবানের সমীপে কায়মনো বাক্যে এই প্রার্থনা করি যে, তাঁহার পরলোকগামী আত্মা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুণ।

শ্রীরাম চন্দ্র বক্রবর্ত্তী
জেলা বগুড়ার স্কুল সবইনেস্পেক্টর।

ওঁতৎসৎ।

২১০। ৫ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১৭ই আশ্বিন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

আপনার কার্ড খানা কাল পাইয়াছি। আমি এখনও পর্য্যন্ত কলিকাতায় আছি, আপনার পত্র খানা ঘুরিয়া অনেক জায়গা দিয়া আমার নিকট এসেছে।

আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ এবং ছেলেপিলের খুব অসুখ তাহাদিগকেই নিয়া খুব ব্যস্ত আছি। আর আমি এমনইবা কি লেখাপড়া জানি যে, আমার লিখিত মন্তব্য তাঁহার ন্যায় বিদুষী রমণীর যোগ্য হইবে? অন্নপূর্ণার ভালবাসা ঋণে আমি যে ঋণী তাহা পত্রে কত প্রকাশ করিব। তাঁহার ভালবাসা ও সদ্‌গুণের কথা এ জীবনে কখনও মনে ভুলিতে পারিব না, তিনি মানবী ছিলেন না, দেবী ছিলেন।

২১০। ৫ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১৭ অশ্বিন।

আপনার
স্নেহের হরি।

২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১।

শ্রদ্ধাস্পদেষু।—

আপনার কার্ড পাইয়াছি। কি উত্তর দিব তাহা স্থির করিতে পারি নাই বলিয়া আপনার কার্ডের উত্তর দিতে গৌণ হইল।

পরলোক গতা শ্রদ্ধেয়া ভগিণী অন্নপূর্ণা দেবীর জীবন চরিতে আমার মন্তব্য প্রদান করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কোন রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে আমি নিজেকে

অনুপযুক্ত মনে করিতেছি। কারণ তাঁহার চরিত্রের উন্নত ভাব ও মাধুর্য্য সম্যক্ রূপে অনুভব করা, তাহা যথা যথ রূপে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। আমি যে দিন রাত্রি অনুমান দ্বিপ্রহরের সময় আপনার ভবনে প্রথমতঃ উপস্থিত হইয়া ছিলাম, তাঁহার সেই সময়ের ব্যবহার দেখিয়া ঠিক মনে হইল যেন আপনার ভগিণীর কাছে গিয়াছি। তাঁহার সেই সরলতা ও অমায়িকতার ভাব ভাষায় প্রকাশ হয় না। তাঁহার সম্বন্ধে লোক মুখে যাহা শুনিয়াছি এবং নিজে অন্য সময়ে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তদ্দ্বারা ইহাই মনে হইয়াছে যে তাঁহার চরিত্র সাধারনেরই অনুকরণীয়। তাঁহাকে ভক্তি করাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। সুতরাং আমি আর কি মন্তব্য প্রকাশ করিব।

অনুগত

আদি নাথ চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ।

পরলোকগতা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা আমার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ গুণ দ্বারায় নারী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুশিক্ষিতা, ধর্ম্মশীলা ও বন্ধু প্রাণা রমণী। তাঁহার সহিত যিনি এক বার মাত্র আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বাহিরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষায় ভিতরের সৌন্দর্য্য আরও মনোহর দেখিয়াছেন। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, যাহার দ্বারায় রমণী হৃদয় কলুষিত করিয়া পশুত্বে পরিণত করে তাহা তাঁহার হৃদয়ে কুত্রাপিও স্থান পায় নাই। তিনি এমনি কোমল-

হৃদয়া ছিলেন যে তাহার নারী বন্ধুগণের মধ্যে যদি কাহাকে নারী জনোচিত বিপদে পতিত হইতে দেখিতেন তবে তিনি নিজ কর্ত্তব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এমনকি অপোগণ্ড সন্তানের ভার অপরের হস্তে স্থাপন করিয়া সেই বিপদ পতিতা বন্ধুর পার্শ্বে উপস্থিত হইতেন ও সহোদরার ন্যায়, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় যত্ন ও সুশ্রূষা করিয়া তাহার তীব্র বেদনার উপশম করিয়া দিতেন। তিনি যে রমণীর পার্শ্বে উপস্থিত হইতেন তিনিই তাঁহার প্রেমাকুল কমণীয় মূর্ত্তি দর্শনে হৃদয়ে অপরিসীম বল পাইয়া বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। আজ অন্নপূর্ণা পৃথিবীতে নাই, তাই আমরা সন্তান প্রসবের মহা পরীক্ষার দিনে স্নেহময়ীর দর্শনে যে বল পাইয়া আমরা বিপদ ভুলিয়া যাইতাম আর তাহা পাইব না, আমরা হতভাগিনী তাই সে স্নেহময়ী বল দায়িনীশক্তি হারা হইয়াছি। তিনি বিপদ পূর্ণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। আমরা কর জোড়ে জগদ্ধাত্রীর নিকট প্রার্থনা করি অন্নপূর্ণা যেন তথায় এই পৃথিবীর সৎকার্য্যের জন্য শান্ত সুখের অধিকারিণী হয়েন।

শ্রীমতি প্রসন্ন ময়ী দেবী
সাকিন ছাতিয়ান গ্রাম,
বগুড়া।

অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে মন্তব্য—

আমি যত কাল উহাঁকে দেখিয়াছি সরলতা বর্জ্জিত মুখ-কান্তি বোধ হয় কখন দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যেন মূর্ত্তিমতী সরলতা অন্নপূর্ণা রূপে বিদ্যমান ছিলেন, আকৃতির গাম্ভীরতা প্রকৃতির সাম্যতাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করিতে দেখি

নাই। শান্তি প্রিয়তা যেন তাঁহার চিরাভ্যস্থা ছিল। বাঙমধুরতা অনুগতা ক্রীত দাসীর ন্যায় সর্ব্বদা সাধারণের মনোরঞ্জন করিত, এই রূপ গুণশীলা হইয়াও বিনয় ও নম্রতাকে পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন না। অমায়িকতা ইহাঁর চির সহচরী ছিল ফলতঃ ইহাঁকে স্ত্রী গরিমা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

সন ১৮৯২ সন
১৭ জানুয়ারী

শ্রীআনন্দ মোহন চৌধুরি।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গতা সহধর্ম্মিণী পবিত্র চরিত্রা অন্নপূর্ণা দেবী সুশীলতাগুণে স্ত্রীজাতির আদর্শ স্থানীয়া ছিলেন। বাঙ্গালীর পরিবারে অল্প বয়সে তাঁহার ন্যায় কুসংস্কার বিহীনা এবং মার্জ্জিতরুচিবিশিষ্টা স্ত্রীলোক অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার গৃহ একটী শান্তি নিকেতন ছিল। সদালোচনা ব্যতীত কোন সময়েই তিনি বৃথা কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন না। গৃহ কর্ম্মে তাঁহার নিপুণতা ছিল। তিনি সংসারে ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাতে সংসারিকতা ছিল না। উৎকৃষ্ট স্থানের যোগ্য বলিয়াই করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহাকে অল্প কালেই ধরাধাম হইতে লইয়া গিয়াছেন। অলমতি বিস্তরেণ।

তারিখ ১৭ই আশ্বিন
সন ১২৯৮ সন।

শ্রীকালী কিশোর মুন্সী
(সেরপুর)।

প্রিয় সুহৃদ শ্রীমন্ত বাবু,

সংসার তাপে তাপিত হইয়া, শান্তি লাভের আশায় অনেক সময় আপনার নিকট যাইতাম। আপনার সহধর্ম্মিণী, অন্নপূর্ণা দেবীর ভক্তিপূর্ণ ভগবদ্‌গুণ গানে প্রাণ মন বিমোহিত এবং অন্ততঃ ক্ষণ কালের জন্য বিষয় চিন্তা বিদূরিত হইত। গৃহিণীর

গুণে গৃহই স্বর্গ। আপনার গৃহ ইহার জলন্ত উদাহরণ। আপনার গৃহিণী যেমন জ্ঞান, শিক্ষা, শিষ্টাচারে তেমনি প্রেম, ভক্তি সচ্চরিত্রতায় অত্যুন্নতা এবং এ দেশীয় রমণীগণের অগ্রগণ্যা ছিলেন। ইহার অভাবে, একটী ধর্ম্ম পরিবার শ্রীভ্রষ্ট ও একটী শান্তি নিকেতন শ্মশান ভূমি হইয়াছে। ইহাঁর অকালে লোকান্তর গমনে, রমণী সমাজ একটী আদর্শ জীবন হারাইয়াছেন। ইহাঁর মত পুণ্যশীলা, পতিপ্রাণা, জ্ঞান প্রেমে সমুন্নতা নারীর জীবন চরিত ঘরে ঘরে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

বগুড়া শিববাটী }
৫ কার্ত্তিক ১২৯৮ সন। }

বশম্বদ
শ্রীগিরি গোপাল রায়।

প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী অন্নপূর্ণা দেবী মৃত্যুর বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই আমার নিকট সুপরিচিতা ছিলেন। স্ত্রীদিগের যে সকল গুণ থাকিলে বিষময় সংসার সোনার সংসার হইয়া উঠে, পার্থিব সুখকে স্বর্গ সুখ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, মানবী দেবীরূপে পরিচিতা হন, সে সমস্ত গুণই তাঁহাতে প্রভূত ভাবে এবং জলন্ত রূপে বর্ত্তমান ছিল। অকৃত্রিম স্নেহ, অপরিসীম দয়া, অকপট পতিভক্তি প্রভৃতি গুণে প্রকৃত পক্ষেই তিনি একটী রমণী রত্ন ছিলেন। তাঁহার উদারতা সরলতা এবং সদালাপে কে না মুগ্ধ হইতেন? সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাঁর ন্যায় বিদুষী রমণী অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার রচনা প্রণালী এবং বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় লিখিবার শক্তি উভয়ই অতি প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহার প্রণীত প্রবন্ধ গুলি সর্ব্বত্রই সাদরে পরিগৃহীত এবং পঠিত হইত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস অটল ছিল। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, কোন

অবস্থাতেই তিনি বিচলিত হইতেন না; সমস্তই প্রশান্ত ভাবে এবং অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারিতেন। ভোগ বিলাসিতা কাহাকে বলে বোধ হয় তিনি তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না। বেশভূষাকে তিনি অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন। শ্রীমন্ত বাবুর পরিবার বর্গ অনেক বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী। তাঁহাকে একটী আদর্শ নারী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার আদর্শেই তাহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতি সুশীলা সুন্দরীর পবিত্র জীবন গঠিত। শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী যে রূপ ঘোর দরিদ্রতা এবং দুঃসহ ক্লেশে পতিত হইয়া ধীর এবং পবিত্র ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে তাহাতে তাহাকে দেবকন্যা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। অন্নপূর্ণা দেবীর মত রমণী রত্ন সংসারে কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে? এহেন রমণী রত্ন হারা হইয়া শ্রীমন্ত বাবু যে আত্ম হারা হইবেন, সংসারকে অরণ্য বোধ করিবেন, এবং স্বীয় জীবনকে তুচ্ছ বোধ করিবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

বগুড়া ৫ কার্ত্তিক ১২৯৮ সন।	}	শ্রীউৎসব চন্দ্র মৈত্রেয় স্কুল সবইনেস্পেক্টর, বগুড়া।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী অন্নপূর্ণা দেবী মহাশয়া ২০ বৎসরেরও অধিক কাল যাবৎ বিশেষ

রূপে আমার পরিচিত ছিলেন। তাঁহাকে আমি যেরূপ, সকল সময়ের জন্যই দেখিয়াছি তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা আমার শক্তির অতিরিক্ত সন্দেহ নাই, তবে সংক্ষেপে এই বলিতে পারি যে পূর্ব্ব ২ সময়ে, যেমন স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে সময়োচিত, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সৎ-ব্যবহার, সৎগুণ ও পাতিব্রত্য নিমিত্ত সেই সময়ের স্ত্রীলোক সমাজে সম্মানিত উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়া সময়িক ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে নাম অঙ্কিত হইয়া আজ পর্য্যন্তও প্রাতঃস্মরনীয়া রহিয়াছেন, সেই রূপ অন্নপূর্ণা দেবীর নাম বর্ত্তমান স্ত্রীলোক সমাজের উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়া সাময়িক স্ত্রী সমাজের ইতিহাসে অঙ্কিত থাকা উচিত। তিনি ধার্ম্মিকা, পবিত্রা, পতিপরায়ণা ছিলেন। দয়া স্নেহ, মমতা যেন সর্ব্বদা তাঁহার শরীরে বিরাজ করিতে ছিল। বলিতে কি তিনি কখন স্বর্ণাদি নির্ম্মিত অলঙ্কার দ্বারায় বেশভূষা করিতেন না। কিন্ত উপযুক্ত গুণ সকলে সজ্জিত হইয়া এমন রূপের মূর্ত্তি দেখাইতেন যে নানা রূপে অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়াও কোন স্ত্রীলোক এরূপ সুন্দরী দেখাইত না। অলঙ্কার ভিন্ন এই সৌন্দর্য্যে অহঙ্কারের চিহ্ন না থাকায় এবং সেই সঙ্গে তাঁহার মনের প্রকৃত প্রফুল্লতায় যে মুখশ্রী কত সুন্দর দেখাইত তাহা যিনি এই ভাব গ্রহণ করিয়া অনুমান করিবেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। এই মূর্ত্তির আর একটী ভাব দেখিয়া আমি আমি আশ্চর্য্য হইতাম যে এই মনোহর ছবি, যাহাতে কখন রাগ, ঘৃণা, শ্লেষ বা দ্বেষ কিছুই দেখা যায় নাই, একি স্থলেও একি সময়ে সৎজন নিকট যেমন অভীতিপ্রদ দেখাইত তেমনি আবার অসৎ জনের নিকট অতিশয় ভয়াবহ দেখাইত। আমি কবি বা লিখক নহি পরিচিত মাত্রেই

জানেন, কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবীরবিষয় লিখিতে মন আপনি আপনিই এই রূপ লিখাইল ইহাই চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহা যে কাল্পনিক বা কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিবার জন্ম নহে তাহা বিশেষ রূপে প্রমাণ করিতেছে। ইহা সমস্তই সত্য; সত্য জন্মই লিখিলাম ইতি ১ লা মাঘ ১২৯৮ সন।

শ্রীমধুসূদন সান্যাল
সাকিন ছাতিন গ্রাম
হাল সাকিন বগুড়া।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় যখন, এই মায়াময় সংসার-লীলা সম্বরণ করিয়া সেই পবিত্র ময়ের শান্তি নিকেতনে গমন করেন ইহার প্রায় ৩ বৎসর পূর্ব্বে আমি তাঁহার সহিত সুপরিচিত হই। তখন তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকিতেন, সংসারিক কার্য্য কলাপে ও সন্তানগণের লালন পালন সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতে পারিতেন না। অধিকাংশ সময় তিনি তাঁহার নব জাত সন্তানটী নাম জানি না ক্রোড়ে করিয়া কি যেন চিন্তা করিতে থাকিতেন। তাঁহার স্বভাব যেমন দয়া ও সরলতা পূর্ণ ছিল, তেমনি আবার বিনীত ভাবে অলঙ্কৃত করিয়া ছিল। ঈশ্বর উপাসনা তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন মনে করিতেন। একদা তিনি জ্বরে অতিশয় কাতর ছিলেন এমন কি বসিবার শক্তি ভালরূপ ছিল না। (তখন তাঁহাদের পারিবারিক উপা-

সনা ছিল) ঐ অবস্থায় তিনি উপাসনায় করিবার জন্য বসিলেন। তাঁহার উপাসনার ভাব অতিশয় মধুর ছিল। যদি তাঁহার মন প্রাণ সর্ব্বদা রোগের ভীষণ যাতনায় অধৈর্য্য থাকিত তথাচ উপাসনা কালীন তাঁহার হৃদয় নিসৃত উপাসনা সরল প্রার্থনায় মন প্রাণ বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারিত না। ধর্ম্ম ভাবে তাঁহার হৃদয় এমন আলোকিত ছিল যে তাহাকে রমণী মণ্ডলের আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পতিগত প্রাণা অন্নপূর্ণা এই রূপ প্রায় ৩ বৎসর কাল যাপন করিয়া অবশেষে স্বীয় পুত্র কন্যা গণকে দুঃখময়, শোক, তাপ পরিপূর্ণ সংসারে রাখিয়া আনন্দ ধামে চলিয়া গেলেন ইতি।

শ্রীতীর্থ চন্দ্র দে।

আমি অন্নপূর্ণা দেবীর পারিবারিক উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া দীর্ঘ কালব্যাপী ব্রহ্মোৎসবে যোগ দান করি। সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। ইনি বড় উপাসনাশীল ধার্ম্মিকা। ইহাঁকে ঈশ্বর জানিত জ্ঞানে অতিশয় সম্মান করিতাম। তাঁহার বক্তৃতায় ও উপাসনায় শান্ত নির্ম্মল ভাব আমি অনুভব করিয়া নিজে ঈশ্বর প্রেমে মুগ্ধ হইতাম। আমার বড় দুরাদৃষ্ট যে অতি অল্প কাল তাঁহার সহিত থাকিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলাম। অতি অল্প কাল তিনি জীবন দ্বারা ব্রহ্মলীলা দেখাইয়া ব্রহ্মে আশ্রয় পাইলেন। বড় আশা ছিল সেইরূপ সাধনা করিব ও সেই কার্য্য করিব। আমরা মোহেতে ভুলিয়া রহিলাম আমাদের কি উপায় হইবে তাহা স্থির পাইতেছি না। ব্রহ্মের

কৃপার গুণে সমস্ত যাতনা ও কুচিন্তা অন্নপূর্ণার সহিত ব্রহ্মগুণ কীর্ত্তনে চলিয়া যাইত কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার হইল আমার হইল না। এজীবনের আর কি হইবে? অন্নপূর্ণার মত যদি আমাদের দিব্য জ্ঞান হইত তবে আমরাও ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া যাইতাম। দাসের অনুদাস হইয়া অন্নপূর্ণার অনুকরণ করিয়া আমরা মুক্ত হইতে পারিলাম না। কেবল মোহেতে ভুলিয়া রহিলাম। এ পামরের কি হইবে? এ দাসের কি মুক্তি হইবে? অধমের কি হইবে? হে ব্রহ্মকন্যা হে সাধুশীলে! আপনি সাধ্বী আপনি চলিয়া গেলেন। কি কার্য্য করিতে আসিলাম আর কি করিলাম। ধন্য তুমি! তুমি আপনার কার্য্য সারিয়া গেলে এ দাসের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন। আপনি তাঁহাকে পাইয়াছেন! আমি কিসে পাইব? ব্রহ্মের কৃপা হইলে এ দাস দাসীগণ নিস্তার পাইতে পারে। আমি আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া কৃতার্থ মনে করিয়াছি; স্ত্রীলোক মধ্যে আপনার মত ব্রহ্মজ্ঞানী এভূমণ্ডলে দেখি নাই আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে অনেক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমি অনেক দেশ ও অনেক স্থান দেখিয়াছি কিন্তু আপনার ন্যায় নারী দেখি নাই। আপনার সদয় ও প্রেম মাখা চরিত্র ও ভাব দেখিয়া অবাক হইলাম। ইতি।

নিঃ

শ্রীনিমাই চন্দ্র পরম হংস

গোপাল পুর—চান্দাইকোনা।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনন্ত চট্টোপাধ্যায়
মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

মহাশয়!

সাধু সঙ্গ লাভে ও ধর্ম্মালাপ শ্রবণে আমার অত্যন্ত বাসনা, যে স্থানে সৎ প্রসঙ্গ হয়, বিশেষ কোন বাধা না ঘটিলে প্রায়ই তথায় উপস্থিত হইয়া সদুপদেশ শ্রবণে ও সাধু দর্শনে কৃতার্থ হই। আজ কাল যদিও না হউক কিন্তু আপনার সর্ব্ব সদ্‌গুণ সম্পন্না স্ত্রী ৺অন্নপূর্ণা দেবীর বর্ত্তমানে আপনার ভবন সতত ধর্ম্মোৎসবে আমোদিত থাকিত তীর্থ স্থানের ন্যায় লোক সমাগত হইয়া তাহার সারগর্ভ সদুপদেশ শ্রবণে হৃদয় মন পবিত্র করিত। আমিও কখন কখন যাইতাম তাঁহাকে দেখিবা মাত্র হৃদয়ে ভক্তি উদয় হইয়া তাঁহার অন্নপূর্ণা নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিত। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে পাপীর হৃদয়ও স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার হয়; পাপ তাপে সন্তপ্ত হৃদয় শীতল ও শক্তি লাভ করে। এমত সদ্‌গুণ সম্পন্না ধর্ম্মালঙ্কারে ভূষিতা সুনির্ম্মল চরিত্রা স্ত্রীলোক আমি আর দেখি নাই। আপনি অতি সৌভাগ্যে স্ত্রী রত্নটী লাভ করিয়া ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে আপনি ও বঙ্গদেশ একটী রত্ন হারা হইয়াছেন ও হইয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার জীবনী সতী সাধ্বী স্ত্রীলোক দিগের আদর্শ বটে। সন ১২৯৮। ৮ মাঘ।

বিনয়াবনত
শ্রীনায়েব উল্যা সরকার
মোক্তার মোঃ বগুড়া।

ওঁতৎসৎ।

কয়েক বৎসর হইল আলোচনা নামক এক খানি উচ্চ অঙ্গের পত্রিকায় স্বর্গীয়া অন্নপূর্ণা দেবীর লিখিত একটী হৃদয় গ্রাহী প্রবন্ধ আমি পাঠ করিয়া, ভাবিলাম, এমন সুন্দর সারবান প্রবন্ধ আমাদের দেশে স্ত্রীলোকে লিখিতে পারে ইহাতে মনে বড়ই আনন্দ হইল।

ইহার কয়েক মাস পরে কোন কার্য্য বশতঃ বগুড়ায় অবস্থিতি কালীন আমার কোন আত্মিয়কে লইয়া অন্নপূর্ণা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করি, তাঁহার সদালাপে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়া গেল। কয়েক দিন মিলিত ভাবে সাধন ভজন করিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়া ছিলাম। তিনি ভগবানের একটী বিশ্বাসী কন্যা ছিলেন, অতি অল্প কয়েক দিন তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে যার পর নাই আপ্যায়িত হইয়া ছিলাম। তাঁহার অন্তরে এবং বাহিরে ধর্ম্মের জ্যোতি প্রকাশ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় অকালে ইহ সংসার পরিত্যাগ করিলেন। সকলেই ভগবানের ইচ্ছা। জগজ্জননীর নিকট প্রার্থনা করি তাহার মঙ্গলময় অনন্ত ক্রোড়ে ভক্ত সন্তানকে স্থান দান করিয়া তাঁহার পরলোক গত আত্মার শান্তি বিধান করুণ।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র কাঞ্জিলাল
মোঃ নেলফামাড়ী মোক্তার।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়
মহাশয় পূজ্যাস্পদেষু—

মহাশয়!

দেবী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় একটী নারী রত্ন; বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, ঘরে পড়িয়াই শিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন। গৃহ কার্য্য ও শিল্প কার্য্যে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। অধিকাংশ সময় নিজ হস্তেই গৃহ কার্য্য করিতেন অবশিষ্ট সময় সন্তানাদির শিক্ষা ও শিল্প কার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। সতত সরলতা পূর্ণ ব্যবহার আমরা কথন তাহার মুখে কটু কথা শুনি নাই। চাকর চাকরানী অত্যন্ত গর্হিত কাজ করিলেও তিনি কথন তাহাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করেন নাই; বরং মিষ্ট কথা দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। তাঁহার অহঙ্কার ছিল না কোন সময়েই আপন মুখে আপনার প্রশংসা বা আমি কোন বিষয় জানি এরূপ ভাব শ্রুত হই নাই। তাঁহাকে কখনও ভাল কাপড় বা অলঙ্কার ব্যবহার করিতে দেখি নাই, কিন্তু তাহাতে যে সমস্ত গুণ ছিল তাহাতেই তাঁহাকে সতত অলঙ্কৃত দেখাইত। সুখে বা দুঃখে কখনও তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। তাঁহার স্বামী ভক্তি অচলা ছিল। শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের উন্মাদাবস্থায় তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। গৃহ দাহের পর উন্মাদাবস্থায় যে সময় তিনি সংসারের সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করেন, সে সময় কোন প্রকার আয় ছিল না সে সময়ও তাঁহাকে কথন দুঃখিত হইতে দেখি নাই। মনে কোনরূপ কষ্ট হইবে আশঙ্কাতে তিনি সে সময় স্বামীর কাজে আপত্তি বা বাধা দেন নাই। সতত এই সমস্ত

বিষয় চিন্তায় তিনি ক্রমে উৎকট রোগাক্রান্ত হন, পরিশেষে দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গরাজ্যে অক্ষয় সুখ ও শান্তি ভোগ করিতে-ছেন। ইতি।

বশম্বদ

শ্রীবনমালী দে।

শ্রীশ্রীহরি

সহায়।

বগুড়া সিববাটী

১২৮৮। ২৮ মাঘ।

মহামহিমাবরেষু—

মহাশয়ের স্ত্রীর জীবন চরিত ছাপা করিতেছেন জ্ঞাত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার কিছু লিখিবার ইচ্ছা, কিন্তু নিজের বিদ্যা বুদ্ধি এতই অল্প যে মনোগত সকল ভাব সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। অথচ বেশী লিখিলেও পুস্তকে স্থান পাইবার যোগ্য না হইতে পারে তবে যে পর্য্যন্ত পারিলাম নিম্নে লিখিয়া পাঠাইলাম উপযুক্ত বিবেচনা হইলে এক পার্শ্বে স্থান দিবেন।

"অন্নপূর্ণা দেবীর নাম আমি পাঠ্যাবস্থা হইতে শুনিয়া ছিলাম। তিনি সরলা, পতিপ্রাণা ও ধর্ম্ম পরায়না ছিলেন। দয়া দাক্ষিণ্য গুণেও তিনি বিলক্ষণ ভূষিতা ছিলেন। কখন কেহ তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা করিলে কি কাহারও কোন অভাব জানাইলে নিস্বার্থ ভাবে তাহার উপকার করিতেন। তাহার ধর্ম্ম পিপাসা অতীব বলবতী ছিল, তাঁহার সহিত যখনই দেখা হইত তখনই ধর্ম্ম কথা হইত, এবং অন্য কথা হইলে যেন

কিছু অসুখি মনে করিতেন। তাঁহার সহিত আলাপে আমি অনেক সময় বড়ই প্রীত হইতাম। আমার নিকট বাউল সংগীত শুনিয়া আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, এবং ঐ সকল ধর্ম্ম সংক্রান্ত গান শুনিবার জন্য প্রায়ই বড় আগ্রহ পাইতেন। আমরাও তাঁহাকে শুনাইয়া সুখি হইতাম।

তিনি অনেক ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিয়া ছিলেন; মধ্যে মধ্যে তাঁহার রচিত গান ও প্রবন্ধ আমরা শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইতাম। অন্নপূর্ণা দেবীর সম্বন্ধে লিখিবার অনেক আছে তাহা সময়াভাবে বেশী লিখিতে পারিলাম না। ফল কথা তিনি বঙ্গ মহিলা মধ্যে আদর্শ মহিলা ছিলেন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অসময়ে তাঁহার মানবলীলা সম্বরণ করায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। ভগবান করুন তাঁহার অমর আত্মা অমর ধামে চিরশান্তি উপভোগ করিতে থাকুন এই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ইতি।

নিবেদক

শ্রীঅভয় চরণ মজুমদার।

ওঁ তৎসৎ।

স্বর্গীয় অন্নপূর্ণা, দেবীর সেই সরল অথচ গভীর চিন্তাপূর্ণ ছবিখানি সততই আমার চখের উপরে ভাসিতেছে। তাঁহার সেই উৎসাহপূর্ণ নিরহঙ্কার ও চাকচিক্য বিরহিত বিশ্বাসী ও সহিষ্ণু জীবন, স্মরণ করিয়া আমি নিজে অনেক সময়ই উৎসাহিত হইয়া থাকি।

আমার বিশ্বাস ব্রাহ্ম সমাজে যে সকল পুরুষ আসিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই অল্লাধিক পরিমাণে কিছু না কিছু

পরীক্ষার মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে, কিন্তু ইহার জীবনে যেমন বিশেষ পরীক্ষা পাওয়া গিয়াছে, এরূপ মহিলা ব্রাহ্ম সমাজে অতি অল্প। হিন্দু সমাজ হইতে আগতা মহিলাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই স্বামী ভাই কি অন্য কোন বিশেষ বন্ধু বান্ধবের প্রতি নির্ভর করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে আসিয়াছেন, এবং জীবনে তেমন বিশ্বাস প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন স্বামীকে প্রীতি ও প্রিয়ানুষ্ঠানে ধর্ম্ম জগতে সাহায্য করিতেছেন কি সন্তান-গণকে স্বভাবে ও ধর্ম্মে সুগঠিত করিতে পারিতেছেন, এরূপ ব্রাহ্মিকার সংখ্যা অতি অল্পই বলিতে হইবে, অপর সেই অল্প সংখ্যকের মধ্যে ও স্বর্গীয়া অন্নপূর্ণার জীবনে যেমন পরীক্ষা আসিয়াছে অন্য কাহারও এযাবৎ তেমন কঠোর পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছে বলিয়া আমার বোধ হয় না। স্বর্গীয়া অন্নপূর্ণার জীবনে ভগবানের এক অপার লীলা দেখিতে পাই যদিচ আমি তাঁহার জীবনের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা জানিনা কি অতি অল্প সময়ই তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, তথাপি লোকের মুখে যাহা যাহা শুনিতে পাই এবং নিজে তাঁহার জীবনের যে দুই একটী পরীক্ষা দেখিয়াছি তাহাতেই তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাঁহার গুণে আমি এতাধিক আকৃষ্ট যে তাঁহার জীবনী মহিলা সমাজে প্রচার যোগ্য মনে করি। একদিন একজন প্রৌঢ় ব্রাহ্মের মুখে শুনিতে পাইলাম শ্রীমন্ত বাবুর প্রথম হইতেই ব্রাহ্মসমাজের সহিত সহানুভূতি ছিল সন্দেহ নাই বোধ হয় অন্নপূর্ণার হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগ প্রথম (অর্থাৎ শ্রীমন্ত বাবু পূর্ব্বে) জাগ্রত হয়। সে যাহা হউক পূর্ব্বে না হইলেও এ উভয় জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মা-

নুরাগ জনিত ভগবানের বিশেষ কৃপা যে সমসাময়িক তদ্বিষয়ে বোধহয় কোন সন্দেহ নাই। স্বামী ব্রাহ্ম বলিয়াই যে অন্নপূর্ণা ব্রাহ্মিকা একথা বোধহয় কেহই বলিবেন না। এখনকার মেয়েদের ন্যায় অন্নপূর্ণা ছোটবেলা স্কুলে কি পিতা মাতার যত্নে লেখা পড়া শিখেন নাই অথবা কেবল স্বামীর প্রযত্নেই যে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন তাহাও বোধ হয় না। শুনিতে পাই যখন অন্নপূর্ণার জীবনে জ্ঞান পিপাসা ও ধর্ম্মাকাজ্ক্ষা ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল তখন বগুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত হেড পণ্ডিত ছিলেন, তিনি ব্রাহ্ম, ওস্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার বেশ উৎসাহ। অন্নপূর্ণা একথা শুনিতে পাইয়া একদা উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত পরিচিতা হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পণ্ডিত মহাশয় শ্রীমন্ত বাবুর মুখে তাহা শুনিতে পাইয়া এক দিবস তাঁহার বাসায় আসেন, এবং শ্রীমন্ত বাবুর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হন তখন সেই স্থানের অনতিদূরে সামান্য বেশে একখানা মোটা চাদর গায়ে একটী স্ত্রীলোক উপবিষ্টা ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমত ইঁহাকে চিনিতে পারেন নাই তিনি ভাবিতেছেন কোথায় শ্রীমন্ত বাবুর স্ত্রী ত আসিতেছেন না। কিন্তু যতই ঘনিষ্ঠরূপে সৎ-প্রসঙ্গ হইতেছিল নিটকস্থ স্ত্রীলোকটী দুচার কথায় যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন তখন পণ্ডিত মহাশয় ক্রমে বুঝিতে পারিলেন ইনিই শ্রীমন্ত বাবুর স্ত্রী। সেই দিন হইতে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত শ্রীমন্ত বাবুর ও অন্নপূর্ণার বিশেষ বন্ধুতা জন্মে। অন্নপূর্ণা ক্রমে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটে ও তৎসময়ে স্থাপিত বগুড়া মহিলা বিদ্যালয়ে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে

আরম্ভ করেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। বগুড়া আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ে ও উৎসবাদিতে অন্নপূর্ণার উৎসাহ ও যত্নের কথা শুনিয়া ও তাঁহার রচনাবলী পাঠ করিয়া আমাদের সাধারণতই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত।

তাঁহার জীবনের একদিনের চিত্র এখনও আমার চখের উপরে ভাসিতেছে এবং তাঁহার বিপদে সহিষ্ণুতা ও দয়াময়ের কৃপাতে অটল বিশ্বাস প্রত্যক্ষ করিয়া আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহা ইহাজীবনে ভুলিবার নহে। আহা! যে দিন শ্রীমন্ত বাবুকে ঢাকা পাগলা ফাটকে দেওয়া হয় সেদিন অন্নপূর্ণার জীবনে যে কি এক পরীক্ষা গিয়াছে। বাসা হইতে শুনিতে পাইলাম শ্রীমন্ত বাবু নিতান্ত অস্থির হইয়াছেন লেপ কাপড় পোড়াইতেছেন, ছেলেপেলে দিগকে যাতনা দিতেছেন আর কেবল হরিনাম করিতেছেন—কারণ তাঁহার পাগলামী সেই এক অদৃষ্ট পূর্ব্ব পাগলামি তিনি হরিনামের পাগল (১) তিনি

---

(১) শ্রীমন্ত বাবু যখন প্রথমবার পাগল হইয়া বাড়ী (বাপের গ্রাম বিক্রম পুর) গেলেন তখন আমি একদিন তাঁহদের বাড়ী যাইয়া শুনি তিনি কেবল দয়াল নাম করিতেছেন আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলাম এ কেমন পাগল! তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন এইত দেখ আমার শ্রীমন্ত হরিনামের পাগল। তখন তাঁহার কথানুসারে আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম শ্রীমন্ত বাবুর কেবল হরিনাম ও ব্রাহ্ম সমাজ নিয়াই বাতুলতা অন্নপূর্ণা পার্শ্বে বসিয়া সেই পাগলের মুখের কথা হইতেও যেন কি সুধা পান করিতেছিলেন।

পাগলা ফাটকে থাকিয়াও অসাধারণ সমাজ (২) খুলিয়া ব্রহ্ম নাম প্রচার করেন।—বেলা প্রায় একটার সময় তাঁহাদের বাসায় (সুত্রাপুর ঢাকা) যাইয়া দেখি ছেলেরা কাঁদিতেছে সকলের খাওয়া হয় নাই, শ্রীমন্ত বাবু খান নাই অন্নপূর্ণা দেবী তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহাকে কি পড়িয়া শুনাইতেছেন অল্প ক্ষণ মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম শ্রীমন্ত বাবুর কথানুসারেই তিনি কাহারও খাওয়ার জন্য ব্যস্ত না হইয়া তখনও তাঁহাকে পুস্তক পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। আমি যাওয়ার পরে তিনি খাওয়ার যোগাড় করিতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বাবু রজনীকান্ত ঘোষ একখানা দরখাস্ত হাতে করিয়া কোঠার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অন্নপূর্ণা দেবীকে তাহাতে দস্তখত করিতে বলিলেন কিন্তু তিনি বিষণ্ণ ভাবে অস্বীকৃতা হইলেন। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে শ্রীমন্ত বাবুকে পাগলা ফাটকে যাহাতে গ্রহণ করা হয়, তজ্জন্য এই দরখাস্ত লিখিত হইয়াছে তখন আমি রজনী বাবুকে বলিলান আপনারাই ত দস্তখত করিয়াছেন তিনি আর দস্তখত না করিলেই কি? তিনি আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে একজন কনেষ্টবল আসিয়া ডাকাডাকি করিতে আরম্ভ করিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম শ্রীমন্ত বাবুকে পাগলা ফাটকে নিয়া যাওয়ার জন্যই ঐ লোকটা

---

(২) শ্রীমন্ত বাবু বহরমপুর পাগলফাটক হইতে তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুশীলাকে একপত্রে এরূপ ভাবের কথা লিখিয়াছিলেন তোমরা সাধারণ সমাজে থাকিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতেছ আর আমি এক অসাধারণ সমাজে থাকিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি।

আসিয়াছে, তখন বোধহয় দুইটা বাজিয়াছে। আমাদের ইচ্ছা ছিল শ্রীমন্ত বাবুকে খাওয়াইয়া যাইতে দিব কিন্তু কনেষ্টবল বাহির হইতে ডাকাডাকি করিতেছে শুনিয়া শ্রীমন্ত বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও তাহার সহিত যাইবার জন্য বাহিরে গেলেন এবং অল্পক্ষণ চক্ষু বুজিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঐ লোকটার সঙ্গে ধীরে ধীরে চলিলেন। কি শোকাবহ দৃশ্য সংসারে যাহার অবলম্বন মাত্র ধর্ম্ম যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ঐ অবস্থায় পাগলা ফাটকে চলিলেন, তাহার স্ত্রী সাত আটটী সন্তানের সহিত নিঃস্ব অবস্থাতে পতিতা তিনি ইহাদের নিয়া কোথায় দাঁড়াবেন, কে ইহাদের মুখের দিকে চাহিবে? পতির সহিত আর জ্ঞানাজ্জুন ও ধর্ম্মালাপের আশা কি? একটী বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা, কি প্রকারে ইহার জীবন গঠিত হইতে পারে? ইত্যাদি নানা চিন্তায় অন্নপূর্ণার অবস্থাতে পতিতা অল্প বিশ্বাসী যে কোন মহিলাকে অস্থির করিয়া তুলিত, এবং অতি অল্প সংখ্যক মহিলাই এ অবস্থাতে অশ্রুসম্বরণ করিতে সমর্থা হন কিন্তু অন্নপূর্ণা কিছুতেই অধিরা হইবার অবলা ছিলেন না। তিনি একটী নির্জ্জন স্থানে যাইয়া ক্ষণকাল বসিয়া রহিলেন। কি ভাবিলেন জানিনা—এখন বোধ হয় তিনি দীনশরণ পরমপীতার আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া বলিতেছেন।——

"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী,
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি চরণে রাখি আশা।"

কিন্তু তখন আমি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতাম না আমি ভাবিয়াছিলাম তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণা হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছেন, হয়ত তিনি নির্জ্জন চিন্তাতে অধীর হইয়া পড়ি-

বেন, তাইআমি তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিলাম যদি আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া না চলেন তবে ছেলেরা এখন কাহার মুখের দিকে চাহিবে। আমি একথা বলিবামাত্র তিনি উঠিয়া আসিলেন এবং আমার সম্মুখে বসিয়া ধীরভাবে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। ভগবানের কৃপায় শ্রীমন্ত বাবু অল্পদিন মধ্যেই ভাল হইয়া আবার পরিবারের সহিত মিলিত হন, কিন্তু তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইতে যে সময় লাগিয়াছিল সেই সময়ের মধ্যে অন্নপূর্ণাদেবীকে বিশেষ পরীক্ষাতে পড়িতে হই-য়াছিল—স্বামী পাগলা ফাটকে। ছেলেপেলে দিগকে কিরূপে প্রতিপালন করিবেন একে সেই চিন্তা তাহাতে আবার প্রথমা কন্যা (যাহার সাহায্য ব্যতীত এতজন ছেলেপেলেকে সুন্দর-রূপে প্রতিপালন করা একজনের পক্ষে অসম্ভব) জরে নিতান্ত কাতরা, অন্যান্য ছেলেদের মধ্যেও কেহ কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িল। কিন্তু তিনি কিছুতেই অস্থির হইলেন না, তখন তাঁহার অস্থির হইলে চলিত না—যে স্থানে (বৈরাগী টোলা, ঢাকা) বাসাছিল তাহার নিকটে কোন ব্রাহ্মের বাসা ছিল না সুতরাং কোন ব্রাহ্ম মহিলার সাহায্য ও পাইতে পারিলেন না রাত্রি জাগরণ, দুবেলা রন্ধন, পথ্য প্রস্তুত করা, ঔষধ সেবন করান, সুস্থ ছেলেদিগকেও প্রতিপালন করা, এসমস্ত কর্ত্তব্য কাজ তাহাকে আত্ম অবস্থা চিন্তা করিতেও সময় দিতনা। তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছেন বগুড়া থাকিলে (বাসায় ডিসপেনসারি থাকিলে) আমিও ব্যবস্থা করিয়া ইহাদিগকে মধ্যে মধ্যে ঔষধ দিতে পারিতাম। বাস্তবিক তাঁহার সেই সম-য়ের ধীরতাও দয়াময়ের কৃপায় দৃঢ় বিশ্বাস যখনই আমার মনে

হয়, তখনই ব্রাহ্মসমাজে সেই মহিলা জীবন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য বলিয়া ভাবিতে থাকি।

শ্রীবিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী,
ফরিদপুর
৬ই মার্চ্চ ১৮৯২।

শ্রীশঃ—

বগুড়া
১৩ই মাঘ ১২৯৮।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়
মহাশয় সুহৃদ্বরেষু।

আপনার সহধর্ম্মিণী গুণবতী অন্নপূর্ণাদেবীর স্মরণ চিহ্নস্থাপন করিতে দেখিয়া তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আপনাকে জানাইতে অভিলাষ করি। যদিও আমার পূর্ব্ববৎ লেখনী তাহার গুণ বর্ণণে সম্পূর্ণ অক্ষম বলিয়া জানি তথাপি হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে পরিচালিত হইয়া গুটীকত কথা বলিতে চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

অন্নপূর্ণা দেবীর মৃত্যুর প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমার সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কাল মধ্যে এমন দিন অল্পই ঘটিয়াছে যে দিন তাঁহার সহিত অন্ততঃ একবার দেখা হয়নাই, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন দিনের তরে তাঁহাকে যে বিমর্ষ দেখিয়াছি এমন স্মরণ হয় না, এই দীর্ঘকাল মধ্যে তাঁহার সাংসারিক নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বিলোড়িত হইতে দেখি নাই। আমি কত সময় সাংসারিক কত অশান্তিকর ও দুশ্চিন্তা

লইয়া তাঁহার নিকট গিয়াছি কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াও আলাপ করিয়া হৃদয়ের কষ্ট অনুভূত হইয়াছে। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি স্বামী ভক্তি, সন্তানগণের লালনপালন, অতিথী সৎকার, সদালাপ, সদ্ব্যবহার, দয়া, উপচিকির্সা প্রভৃতি গুণের কার্য্য দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইতাম, ফলতঃ তিনি যে সকল সদ্‌গুণের আধার ছিলেন তাহাতে তাঁহাকে রমণী মণ্ডলের আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করিতাম, আমার বিশ্বাস যে তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় নির্ভর হেতু সমুদায় কার্য্য তাঁহার পক্ষে সহজ সাধ্য ও সুমধুর হইত, তাঁহার দীনতাই তাঁহার হৃদয়কে এত উচ্চ করিয়াছিল তাহার ন্যায় উচ্চ হৃদয়ের রমণীর বিষয় ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি ভিন্ন কখন চক্ষে দেখি নাই নিবেদন।

নিবেদক

শ্রীনবকান্ত শর্ম্মা গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীশঃ

যে সকল গুণ থাকিলে স্ত্রী লোককে দেবী বলিয়া সম্বোধন করা যাইতে পারে, অন্নপূর্ণা দেবীতে তাহার কোনটীরও অসদ্ভাব ছিল বলিয়া বুঝিতে পাই নাই। অন্নপূর্ণার অলৌকিক ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, তাঁহার জীবনের অনুপম সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়া, মহিলা সমাজে একটী উর্চ্চ আদর্শরূপে পরিচিতা হইয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে, বগুড়া ব্রাহ্ম সমাজের মেম্বরগণ (অধিকাংশের মতানুসারে) কর্ত্তৃক, উক্ত সমাজের সম্পাদিকা পদে নিয়োজিত হন; নির্ব্বাচন সভার ঘোর বাদ প্রতিবাদের মধ্যে ধীর, স্থির এবং অটলভাবে অব-

স্থিতি করিয়া নারী সমাজে চঞ্চলা নামের বিপর্য্যর্থ সম্পাদন করিয়া অসাধারণ সহিষ্ণুতা গুণের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি, বগুড়া ব্রাহ্ম সমাজে প্রকৃত ব্রাহ্মিকা বলিয়া পরিচিতা হইবার স্থান শূন্য হইয়াছে। তিনি আধ্যাত্মিক জগতে যাদৃশ উন্নতি সংসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পারলৌকিক জীবনকে ভগবান চিরশান্তি নিকেতনে স্থান দান করুন ইহাই প্রার্থনীয়।

শ্রীকেদার নাথ সাহা
বগুড়া,
১৩—২—৯২ ইং

স্বর্গীয়া অন্নপূর্ণা দেবীর উচ্চহৃদয়ের মার্জ্জিত ভাব দুই চারি কথায় আমার মত লোকের লেখনী দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিস্ফুট করার চেষ্টা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

ধর্ম্মের সহিত শিক্ষার কোন সম্বন্ধ থাকা আমি বিশ্বাস করিনা ; হয় ত, কেহ একথা শুনিয়া আমাকে নির্ব্বোধ স্থির করিতে পারেন, তাহা করুন তথাচ বলিব উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই।

অন্নপূর্ণাদেবী শিক্ষিতাছিলেন, অনেকে বলিতে পারেন সেই জন্য তিনি ধার্ম্মিকা ও ছিলেন। আমি বলি তাহা নহে, তিনি শিক্ষিতাছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি ধার্ম্মিকা ছিলেন, তাহা বলিতে পারিনা। তিনি ধার্ম্মিকছিলেন ধর্ম্ম প্রবনতা স্বভাবের জন্য। শিক্ষিতা না হইলেও তিনি ধার্ম্মিক

হইতেন ; তবে শিক্ষায় তিনি ধর্ম্মজীবনে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন মাত্র।

প্রেম এবং ভালবাসা দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু। সীমাবদ্ধগুণ বিশিষ্ট বস্তুতে প্রেম হইতে পারে কি না বুঝি না। অসীম গুণবিশিষ্টে প্রেম যে কখন কখন মনুষ্যের হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায়। সুতরাং অন্নপূর্ণা দেবীতে শ্রীমন্ত বাবুর প্রেম কি আকারে ছিল, তাহা বুঝি নাই তবে উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ও স্নেহ যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল তাহা বুঝিয়াছি সেই জন্য বলি সকলের ভাগ্যে সহসা যাহা ঘটেনা শ্রীমন্ত বাবুর তাহা ঘটিয়াছিল, বস্তুতঃ তিনিই স্ত্রী রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। এবিষয়ে তাঁহার মত ভাগ্যবান্ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

অন্নপূর্ণা দেবীর অকাল মৃত্যুতে তিনি এবং একটী বৃহৎ পরিবার যে শোক সাগরে ভাসিয়াছেন তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহার মত গুণবতী ভার্য্যার অভাব জনিত শোক হৃদয়ে ধারণ করা বড় সহজ কথা নহে। শ্রীমন্ত বাবুর ভিতরে যাহাই থাকুক বাহিরে কোন চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় নাই বেশ স্থির ধীর আছেন।

অন্নপূর্ণা দেবীর সরল হৃদয়ের সরল ব্যবহার সহসা এ জীবনে কখন ভুলিতে পারিবনা। দেখিয়া শুনিয়া তাহা যে ভুলিতে পারে ; সাধারণ মানবের নির্দ্দিষ্ট সাধারণ আবাস ভূমির একস্তর নিম্নে তাহাকে স্থান দিতে আমরা কুণ্ঠিত হইবনা।

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র নাথ সরকার
মাদলা জমিদার।

কলিকাতা
৫ই মার্চ্চ, ১৮৯২।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতঃ

আপনার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ার সহিত আমার যতটুকু পরিচয়ছিল তদ্দ্বারা আমি তাঁহার সমুদায় সদ্‌গুণের সম্যক সাক্ষদানে অসমর্থ। তথাপি তদীয় সরলতা, তদীয় সহিষ্ণুতা এবং তাঁহার সহজ ও স্বাভাবিক ভাব দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহাকে বাহিরের বেশ ভূষাতে রত হইতে দেখা যাইত না। বরঞ্চ যখন আমি তাঁহার সেই সরলতা ব্যঞ্জক সামান্য পরিচ্ছদ ও বেশভূষার কথা স্মরণ করি তখন আমার চিত্ত বৈরাগ্য ভাবে পূর্ণ হয়। বর্ত্তমান সময়ে কি অবস্থাপন্ন কি দুস্থ কোন পরিবারেই তাদৃশ ভাব লক্ষিত হয় না।

আপনার বেরামের সময়, আর আর বন্ধুগণ যখন চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিলেন, আপনার সেই ধার্ম্মিকা পত্নী যথার্থ স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া অনেকগুলি সন্তান এবং উন্মত্ত স্বামীকে লইয়া যে প্রকার ধীরভাবে এবং প্রসন্ন চিত্তে বিপদের বোঝা মাথায় বহিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত এসংসারে সচরাচর দেখা যায় না। তিনি পরমেশ্বরের প্রিয় কন্যা ছিলেন। তিনি যথার্থই সহধর্ম্মিণীপদের বাচ্য ছিলেন। তাঁহার মত নারীর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে ততই এই দীনদশাপন্ন বঙ্গ সমাজের কল্যাণ হইবে। তাঁহার অকাল মৃত্যুদ্বারা আমাদের বিশেষ ক্ষতি হই-

য়াছে, অথবা পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছা যাহা তাহাই সম্পন্ন হইয়াছে।

অনুগত

উমাপদরায়।

শ্রীশ্রীশং।

কলিকাতা

১২ই মার্চ্চ ১৮৯২।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

আপনি আপনার সহধর্ম্মিণীর জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম, আমি অনেক দিন হইতেই ইচ্ছাকরিতে ছিলাম যে দেবী অন্নপূর্ণার একখান জীবন চরিত বাহির হয়, এই জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্নেহের কন্যা সুশীলাকে অনুরোধ ও করিয়াছি যে তুমি তোমার মার জীবন চরিত একখান বাহির কর কিন্তু তাহার শরীর ভাল না থাকায় এবং আপনি নানা বিপদে পতিত থাকায় এত দিন আমার সে আশা পূর্ণ হয় নাই, এখন আপনার এই উত্তম সংকল্প ঈশ্বর পূর্ণ করুণ এই প্রার্থনা।

আমার বিশ্বাস আপনার সহধর্ম্মিণীর জীবন চরিত প্রকাশিত হইলে মহিলা সমাজের বিশেষ উপকার হইবে, শুধু মহিলা সমাজ কেন, ইহা দ্বারা জন সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইবে। আমি যদিও তাঁহাকে ভালরূপে জানিতে সুবিধা পাই নাই তথাপি প্রচার কার্য্য উপলক্ষে দুবার আপনাদের গৃহে অতিথি হইয়া তাঁহার সঙ্গে যে অল্প পরিমাণে মিশিতে

পারিয়াছি তাহাতেই তাঁহার জীবনের যে মাধুর্য্য দর্শন করিয়াছি, তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। তাঁহার ধর্ম্মভাব এবং সংস্কারের ইচ্ছা দেখিয়া খুব সুখী হইয়াছি, অনেক সময় দেখা যায় যাঁহাদের ধর্ম্মভাব বেশ আছে, তাঁহারা হয়ত খুব সংস্কারের পক্ষ পাতী নন, আবার যাঁহারা খুব সংস্কারের পক্ষ পাতী তাঁহাদের ধর্ম্ম সাধনের দিকে দৃষ্ট কম। তাঁহাকে যেমন উপাসনাতে, তেমন ধর্ম্মচর্য্যাতে অনুরক্তা দেখিয়াছি। তেমনি যাহা কুসংস্কার বলিয়া বুঝিতেন তাহা সংস্কারের জন্য খুব উৎসাহী দেখিয়াছি, জলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাসই এরূপ আচরণের মূল। তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানও বেশ উজ্জল ছিল, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধেও আলোচনায় তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নিজ যত্নে অতি অল্প লোকই সেরূপ জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে। আপনাদের গৃহে বাস করিবার সময় দেখিয়াছি, যাঁহারা গৃহে অতিথি স্বরূপে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি তিনি কেমন অমায়িক ভাব প্রকাশ করিতেন। তাঁহার গৃহে যিনি কিঞ্চিৎকাল বাস করিয়াছেন, তিনি ছাড়িবার সময় একটা বিচ্ছেদের ক্লেশ ক্ষুদ্র অনুভব করিতেন। সকলকেই একবাক্যে তাঁহার প্রসংশা করিতে শুনিয়াছি, সকল শ্রেণীর লোকের প্রিয় পাত্রী হওয়াটা খুব সহজ কথা নয়, তাঁহার অমায়িকতা, সরলতা এবং ভদ্রতাতে সকলেই প্রীত হইতেন। এ সময়ের এক প্রধান রোগ বিলাসিতা, তাঁহার জীবনে বিলাসিতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তাহার প্রসংশা আমি আর কি করিব, তাঁহার প্রসংশা তাঁহার চরিত্রই সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছে, এইরূপ চরিত্রই মানব চরিত্র গঠনের সহায়তা করে।

আমার লিখিবার বিশেষ শক্তি নাই তাই বিশেষ করিয়া লিখিতে পারিলাম না, সুধীর লেখাটী নিয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছে তাই যাইতে একটুকু বিলম্ব হইল মাপ করিবেন, আপনাদের মঙ্গল চাই।

অনুগত

নবদ্বীপচন্দ্র দাস।

শ্রীশ্রীহরি।

২২শে ফাল্গুণ।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গতা স্ত্রী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি যে সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী এবং বহুতর গুণে ভূষিতা ছিলেন বোধ হয় সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। ফল তিনি যে রমণী জাতীর আদর্শ স্বরূপা তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীরাজেন্দ্র কুমার গুপ্ত

বগুড়া।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

৺অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়

অন্নপূর্ণা দেবীকে আমি বহুকাল দেখিয়াছি ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ের প্রসস্ততা এতদূর বিস্তৃত ছিল যে, ধর্ম্ম জীবন ভিন্ন কিছুই উপলব্ধি হয় নাই।

পরোপকার তাঁহার জীবনের একটা প্রধান ব্রত ছিল। তাঁহার মত নম্র ও পতি পরায়না স্ত্রী আমি কম দেখিয়াছি,

তাঁহার স্বামী শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় এক সময়ে দুদৈব দুরবস্থার পড়িয়া সমস্ত সম্পত্তি বিনাস করিলে ঐ সময়ে অন্নপূর্ণার যে ধৈর্য্য ও প্রফুল্লতা দেখিয়াছি তাহাতে নিরতই বোধ করিয়াছি যে অন্নপূর্ণার কথন বিষণ্ণ ভাবের সহিত সন্দর্শন হইবেনা বস্তুতঃ তাহা কথন হইতে দেখি নাই, এক্ষণে অন্নপূর্ণা পরলোকে বাস করিতেছেন ঈশ্বর নিয়ত তাহাকে সহায়তা করুণ এই প্রার্থনা।

শ্রীমধুসূদন বকসী
বগুড়া।

প্রিয় শ্রীমন্ত তোমার পত্র পাইয়াছি, সময়োচিত পত্র না লিখায় অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত আছি। ক্ষমা গুণে মাপ করিবা আমার মন্তব্য নিম্নে লিখিলাম।

দেবী অন্নপূর্ণা যথন ঢাকা নগরীতে তাহার স্বামীর বাসায় আইসেন তথনই তাহার সহিত প্রথম পরিচয় হয়। তাহার স্বামী প্রথমতঃ আমার সহিত আলাপ করাইয়া দেন তৎপর তাহার স্বামীর অবিদ্যমানেও তিনি অতি সরল ভাবে, আমি যথনই তাহাদের বাসায় বেড়াইতে যাইতাম আমার সহিত আলাপ করিতেন, দেবী, অন্নপূর্ণার সহিত কয়েক দিন দেখা সাক্ষাত হইলেই আমি তাহার একটী একটী করিয়া গুণের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। তন্মধ্যে তাহার প্রথম স্মৃতি শক্তিই সম্পূর্ণ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার স্মরণ শক্তি এত প্রখরছিল যে একবার যাহা পড়িয়াছেন তাহাই তাহার মুখস্থ থাকিত। বাঙ্গালা যে বই পড়িতেন তাহার অর্থ লিখিয়া দিতে কি রাখিতে হইত না একবার বলিয়া দিলেই যথেষ্ট হইত।

বীরঙ্গনা কাব্য একবার পড়িয়াই তাহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। এই স্মরণ শক্তি ও পরিষ্কার সাধারণ বুদ্ধি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মে মতি এই তিনই তাহার উন্নতি পথের প্রধান সহায় ছিল। অন্নপূর্ণার স্বামী প্রিয় বন্ধু শ্রীমন্ত সর্ব্বদাই দেবী অন্নপূর্ণার নিকটে থাকিতে বলিতেন। কারণ শ্রীমন্তকে জেলের ডাক্তার হওয়ায় দীনের অধিকাং সময় সেই কারাগারেই কাটাইতে হইত। দেবী অন্নপূর্ণা একাকী থাকিতে ভাল বাসিতেন না। সঙ্গে কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক ছিল না আমি শ্রীমন্তের আদেশ মত এসময় তথায় যাইতাম এবং তাহার সরল ব্যবহারে নিতান্ত আপ্যায়িত হইতাম। ঐ সময়েই দেবী অন্নপূর্ণা আমাদ্বারা তাহার স্বামীর বন্ধুদের নিকট চিঠি লিখিয়া লইতেন এইরূপ ভাবে কিছু কাল যায় শ্রীমন্ত ইহা টের পাইয়া ঐরূপ চিঠি লিখিয়া লইতে আমাকে বারণ করেন, আমিও তাহার পর আর অন্নপূর্ণাকে চিঠি লিখিয়া দেই নাই। তৎপর সে নিজেই চিঠি লিখিতে আরম্ভ করে। দেবী অন্নপূর্ণার ব্রাহ্ম ধর্ম্মে প্রথম যে ঘটনায় অনুরাগ অঙ্কিত হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল। এক দিবস ঢাকা ব্রাহ্ম সংকীর্ত্তনের সঙ্গে আমি ঢাকা চকবাজারের বাটী যাই। তখন দেবী অন্নপূর্ণা সংকীর্ত্তনের গোলমাল শুনিয়াছিলেন বোধ হইতেছে কিছুই টের করিতে পারেন নাই। আমি যাওয়া মাত্রই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইতেছে, আমি তাহাকে সবিস্তার অবগত করাই ও আমার নিকট যে সংকীর্ত্তনের কাগজ ছিল তাহা তাহাকে পড়িয়া শুনাই। ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি তাহা তিনি কিছুই জানিতেন না। আমাকে বলেন

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি ? আমি যত দূর সাধ্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস পরিষ্কাররূপে ব্যাক্ষা করি ঐ দিন হইতে অন্নপূর্ণা একটু একটু করিয়া বিশ্বাস করিতে থাকেন। এই দিন হইতে উপাসনা আরম্ভ করেন, যখন অন্নপূর্ণা উপাসনা করেন তখন শ্রীমন্ত বুঝিতে পারে নাই, পরে সে বুঝিতে পারিল। এই হইতে আমার রূপিত ব্রহ্ম-বীজ জীবন্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম সত্য সত্যই দেবী অন্নপূর্ণা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সমস্ত মত ও বিশ্বাস জীবনে গ্রহণ করেন এবং তাহার নিজ বলে তাহার স্বামীকেও অনেক সংসারিক প্রলোভন হইতে রক্ষাকরেন। ইহার অনেক দিন পরে যখন দেবী অন্নপূর্ণা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশ্য ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। লিখাপড়া ও ভালরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন তখন বগুড়ায় যাইয়া তাহাদের অতিথিহই এবং কার্য্য বশত তথায় আমার ৬।৭ মাস থাকিতে হয়। সেই সময়ই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার মহত্ত্ব ও গুণ গ্রাম আমার উপলব্ধি হয়। তাহার সরল ও পবিত্র ভালবাসা স্মরণ করিয়া আমি এক্ষণ অনেক সাংসারিক দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করি। তাহার ভালবাসার প্রতিদান সংসারে নাই। কত শত আলাপ হইত, কত যে সৎবিষয়ের তর্ক বিতর্ক হইত তাহা এক্ষণ স্মরণ নাই বটে কিন্তু ইহা মনে হয় যে, দেবী অন্নপূর্ণা সকল সময়েই তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন। আমি যখন কার্য্যস্থল হইতে বাসায় আসিতাম তখনই তাহার সরল ও সস্নেহ ব্যবহারে সমুদায় ক্লান্তি ও কষ্ট ভুলিয়া যাইতাম। দেবী অন্নপূর্ণা যখন লিখা-পড়ায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন সাংসারিক কাজে ও তাহার বেশ মনযোগ ছিল। রান্না করিতে বেশ সুদক্ষ ছিলেন, তাঁহার

স্বামী যদি ও পাকের লোক রাখিয়াছিলেন তথাপিও তিনি নিজে ভাল ভাল তরকারী ইত্যাদি পাক করিতেন। দেবী অন্নপূর্ণার লিখিত অনেক প্রবন্ধ বিদ্যমান আছে তাহা দেখিলেই বুঝা-যাইবে তিনি কতদূর উন্নত হইয়াছিলেন মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার সেই ইচ্ছা পূরণ করিতে পারেন নাই। যতদিন তাহার সহবাস হইতে বিচ্যুত রহিব তত দিন তাহার সংব্যবহার ও পবিত্র চরিত্র ভূলিতে পারিব না। আমি অনেক ভালবাসা পাইয়াছি দুঃখ এই, প্রতিদান করিতে পারি নাই শ্রীমন্ত আমাকে নিজগুণে ভাল বাসিত এক্ষণ ও নিজগুণে ভালবাসে। পিতার নিকট প্রার্থনা করি অন্নপূর্ণার আত্মার মঙ্গল করুণ ও তাঁহার স্নেহের ধন তাহার সন্তান ও স্বামীর পারলৌকিক মঙ্গল বিধান করুণ, আমার প্রতিশ্রুত সাহার্য্য যত সত্বর পারি পাঠাইব। আমি পুস্তক পাইলে বিক্রয় করিয়া যাহা আদায় করিতে পারি তাহা পাঠাইব। আমার জেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রতাপ এণ্ট্রেস পরীক্ষা দিয়াছে ফল বাহির হইলে জানাইব। আমার স্ত্রী ও একটী কন্যা কতেকদিন যাবত রোগে বড় কষ্ট পাইতেছে। স্ত্রীর চক্ষু রোগ কন্যাটীর কফ ও পেটের পীড়া এজন্য বড় অসুখে আছি। তোমার মঙ্গল চাই।

তোমার

পূর্ণচন্দ্র।

জামতারা
১৮৯২। ৪ঠা মার্চ্চ।

প্রিয় শ্রীমন্ত।

অনেক দিবস পরে তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। আমাদের সমুদায়ের ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ার দরুণ এতদিন তোমার পত্রির উত্তর দিতে পারি নাই।

তুমি তোমার সহধর্ম্মিণীর সমন্ধে যাহা জানিতে চাহিয়াছ সে সম্বন্ধে আমি তোমাকে কি জানাইব? আমার যদি মনের ভাব সুললিত ভাষায় লিখিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমি কতক পরিমাণে সে বিষয় লিখিতে পারিতাম। আমার লিখিবার শক্তি নাই, ভাষার পারিপাট্ট নাই। তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারি যে তিনি স্বর্গের দেবী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিনয়ী নম্র ও সৎপ্রকৃতির মহিলা কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। যখন আমি বগুড়া তোমাদের বাসায়, ছিলাম তখন কার তাঁহার যত্নও অমায়িকতার জন্ম আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে তুমি তাহার মত স্ত্রীর সাহায্যের জন্যই বরাবর ব্রাহ্ম সমাজে অটল ভাবে ছিলে।

তোমার
শশীভূষণ সরকার।

অন্নপূর্ণা

শ্রদ্ধেয় পরলোকগতা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ইহার সহিত বহুকাল ব্যাপী বন্ধুতা থাকায় ইহার জীবনের কার্য্যাবলী

বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করাতে লিখিতে সক্ষম হইয়াছি। প্রথম দর্শনে ইহার সহিত আলাপ, ইহাঁর ফোটনোন্মুখ সদগুণ রাসির উন্মেষণ দেখিয়াও সরল আলাপে বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। পরিমল যতই ঘনীভূত হইতে লাগিল ততই সেই ধর্ম্ম পরায়না রমণীর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ঈশ্বর নির্ভরতায়, সরল সুমিষ্ট ব্যবহারে ততই প্রীত হইতে লাগিলাম। কালে অন্নপূর্ণা পরিচিতের স্থান হইতে বন্ধুতার স্থান গ্রহণ করিলেন। তিনি এমনি ধর্ম্ম প্রাণা রমণী ছিলেন যে যখনই ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কোন আলাপ হইত, তখনই তাহার বিশ্বাসের দৃঢ়তায়, জ্ঞানের গভীরতায় ঐশ প্রেমের পরিণিত এবং উচ্ছ্বাসের পূর্ণতায়, আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম। তাঁহার জলন্ত বিশ্বাসে দলিত স্বর্গীয় প্রভা ভাস্বর মুখমণ্ডল, প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়ন ও ভক্তি গদ গদ বচন শ্রবণ করিয়া রোগ শোকময় জীবন ভুলিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতাম, সেই কমনীয় মূর্ত্তি দর্শনে মনে হইত ভবদুঃখ হারি দগ্ধ হৃদয় নবনারী, শিক্ষা দিবার জন্যই যেন সেই মূর্ত্তিমতী ভক্তি দেবীকে মর ভবনের আদর্শরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। সে ভক্তি উদ্বেলিত মূর্ত্তি, সে স্থির গম্ভীর প্রশান্ত ভাব, স্বর্গীয় সামগ্রী, রোগ শোক পূর্ণ সংসারে বড়ই দুর্লভ। জীবনে সে ছবি সে দৃশ্য কথনও ভুলিবনা। যত দিন বাঁচিব সেই মূর্ত্তি প্রস্তরে অঙ্কিতের ন্যায় স্মৃতি পটে গভীর রেখায় অঙ্কিত রহিবে।

যে সময় অন্নপূর্ণা বগুড়ায় প্রথম উদয় হয়েন তখন স্ত্রী শিক্ষার বেগ বড়ই মন্দীভূত, ফল্গুর ন্যায় অন্ত সলিলা হইলেও উপরে বহুকাল ব্যাপী স্তুপীকৃত অনাস্থা বালি রাশিতে

সমাচ্ছন্ন, সে সময়ে লোকে স্ত্রী শিক্ষার কোনই সুফল দেখি-তেন না ভাবিতেন "রমণী শিক্ষিতা হইলে কু-পথ গামিনী হইবে, পতির প্রতি প্রেম ও ভক্তি না করিয়া পদানত কৃত দাসোচিত দুর্ব্যাবহার করিবে, গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবে। তাহাদের রমণী উচিত নম্রতা, শীলতা কিছুই রহিবে না, তাহারা ছিন্ন মস্তারূপ ধারণ করিবে। সুতরাং তাহাদিগকে চির জীবন গভীর আঁধারে ডুবাইয়া রাখ, বাসনা পূর্ণ হইবে, রমণী সখের সামগ্রির ন্যায়, ছায়ার ন্যায়, কিঙ্করীর ন্যায়, তোমর হাসিতে হাসিবে তোমার দুঃখে অশ্রু—বর্ষন করিবে। তোমার আদেশ পালন করিয়া আপনাকে ধন্যা মনে করিবে। তোমার কঠোর পদাঘাত তাহার নিকট কোমল কুসুম বর্ষন জ্ঞান হইবে।" এই দুর্দ্দিনে অন্নপূর্ণা একমাত্র বগুড়া বাসীর নয়ন সমক্ষে দণ্ডায়মানা। তাঁহার শিক্ষার উন্নতির সহিত বগুড়াবাসী "শিক্ষা" শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে লাগিলেন। লোকে বুঝিলেন রমণী সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে পিশাচিনী না হইয়া বরং দেবী হয়েন, নিজকে ভুলিয়া যাইয়া আপন আত্মা পরিবার বর্গের আত্মত্বে মিশাইয়া ফেলেন, স্বামী সুশ্রূষায় একান্ত মনে নিযুক্তা হয়েন, বিপদে, সম্পদে, সুখে দুঃখে, কায়মন বাক্যে তাঁহারই মঙ্গল কামনায় হৃদয় শোণিত ব্যয় করিতে থাকেন। সৎশিক্ষায় উশৃঙ্খলা বা গুরুজনাব মানিণী না হইয়া রমণী বরং বিনীতা, গুরুজন সুশ্রূষা পরায়না ও সন্নীতি যুক্তা হইয়া থাকেন। অশিক্ষিতা রমনণী যে সমস্ত প্রলোভনে অধঃপতিত হইবার সম্ভাবনা সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সে সমস্ত প্রলোভনে তাহার হৃদয় বিন্দুমাত্র ও সে দৌর্ব্বল্যের

স্ফুরণ করিয়া দেয় না। স্বাধীন রমণী অন্নপূর্ণার পবিত্র জীবনে সৎশিক্ষার সুফল, পূর্ণ মাত্রায় ফলিতে দেখিয়া সেই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী রমণীকে আদর্শ রাখিয়া বগুড়ার হিন্দু মুসলমানগণ আপন আপন কন্যা ও পত্নীগণকে সুশিক্ষা দিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা যদি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও অতি গর্ব্বিতা কি অভিমানিণী হইতেন তাহা হইলে আজ আমরা বগুড়ার সর্ব্ব শ্রেণীর বালিকাপূর্ণ বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে পাইতাম না। যে শিক্ষায় গর্ব্বিত করে তাহাপেক্ষায় অশিক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ট। আমরা অন্নপূর্ণার জীবনে শিক্ষার গুণ পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ দেখিয়া, সরল হৃদয়া, স্নেহবতী, বিনীতা ও ঈশ্বর পরায়না হইবার জন্য কন্যাগণকে শিক্ষা দিতেছি। মৃত বিদুষী অন্নপূর্ণাই কুসংস্কার প্লাবিত দেশের কুসংস্কার বিদূরীত করিয়া পদদলিত রমণী গণের আধাঁর হৃদয়ে বিমল জ্ঞান-রশ্মি সম্পাত করিয়া তাহাদের হৃদয় আলোকিত করিয়াছেন ও পরে আলোকিত হইবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য বগুড়া বাসীগণের বিশেষতঃ রমণী জাতির অন্নপূর্ণা বিশেষরূপ ধন্য বাদের পাত্রী।

ইহার পরোপকার স্পৃহা এতদূর বলবতী ছিল যে, সুযোগ পাইলে ইনি সমস্ত স্বার্থ ভুলিয়া, এমন কি ক্রোড়স্থ দুগ্ধপায়ী শিশুকেও অপর হস্তে সমর্পন করিয়া সেই কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইতেন ও প্রাণ পণে সেই উপকার করিতেন। যেই কোন নারীবন্ধুর প্রসবকাল উপস্থিতির সংবাদ কর্ণে প্রবেশ করিত অমনি তিনি অধীরা হইতেন, নিজ করনীয় কার্য্যের ভার ভুলিয়া কখনও বা তাহা অপরের হস্তে সমর্পন করিয়া সেই বিপদাপন্না রমণীর পার্শ্বে উপস্থিত হইতেন। তাহার

সেই শঙ্কটের সময়, আসন্ন মৃত্যুর সময়, নিজ সরল প্রেমপূর্ণ বচনে উৎসাহিত করিতেন। তাহার দর্শনে প্রসূতী প্রসব-বেদনার জ্বালা ভুলিয়া হৃদয়ের বল পাইতেন, তাঁহার স্নেহোদ্বেলিত কমনীয়মূর্ত্তি দর্শনে, আসন্নপ্রসবা রমণী মাত্রেই এক অপূর্ব্ব হৃদয় বল প্রাপ্ত হইতেন। এরূপ নারী বন্ধুগণের উপকারার্থে যাওয়া তাহার আমি অনেক বার দেখিয়াছি।

আর একবার আমার ২য় পুত্র সুরেন্দ্র নাথ সন্ন-বিরাম জ্বরে মরণাপন্ন কাতর হয় ও তাহার পীড়া এতদূর জটিল হইয়া উঠে যে তাহার জীবনে আমরা হতাশ হইয়া ছিলাম। এই সময় শ্রীমন্ত বাবু (ভরসা করি যথার্থ কথা বলিতেছি বলিয়া ক্ষমা করিবেন) প্রাণ পণে শয্যাগত বালকের আরোগ্যার্থে পরিশ্রম করিতেছিলেন। রোগ তখন বৃদ্ধি মুখে, আমরা রোগীর শুশ্রুষায় ও তৎপার্শ্বে বসিয়া ক্রমাগত ২০।২৫ দিবস অতিবাহিত করিতে করিতে এমনি অসুস্থ হইয়া ছিলাম যে আর কত দিন এরূপ ভাবে রাত্র জাগরণ করিলে নিশ্চয়ই পীড়ায় পতিত হইতাম। আমরা একদিন রাত্র ৮টার সময় অধীর ভাবে বাসায় বসিয়া আছি এমন সময় বিজন বিপিনে পথ ভ্রান্ত পথিকের অদূরবর্ত্তি পথ রেখার ন্যায়, নিরাশ সাগরে ডুবু ডুবু জীবের আশায় প্রথম স্ফুরনের ন্যায় ধীর গম্ভীর পদ বিক্ষেপে মূর্ত্তিময়ী শান্তি দেবী অন্নপূর্ণা আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং বিনয় সহকারে পীড়িত বালকের শুশ্রূষা ও তৎপার্শ্বে বসিয়া দীর্ঘ রজনী জাগরণে অতি বাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি মিনতি সহকারে বহু প্রকারে তাঁহাকে বারণ করিলাম, তিনি শুনিলেন না, অনুরোধ সহকারে তাঁহার

প্রার্থনা পুর্ণ করিবার প্রার্থনা করিলেন। আমি সে অনুরোধ না রাখিয়া থাকিতে পারিলাম না। দেবী রোগীর শয্যায় নিমিলিতনেত্র-বালকের পার্শ্বে বসিলেন। অন্নপূর্ণার তাৎকালিক বাৎসল্য ভাবের পূর্ণ স্ফূরণে মূর্ত্তি বড়ই মধুর হইয়াছিল। আমি অবাক্ হইয়া সে দেবী মূর্ত্তি দেখিলাম। সে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার ভাষা আমার নাই। কিন্তু সে কমনীয় অপূর্ব্ব প্রশান্ত মূর্ত্তি আজও আমার অন্তর হইতে তিরোহিত হয় নাই। এতো গেল রোগের বৃদ্ধি অবস্থার কথা। যখন শ্রীমন্ত বাবুর চিকিৎসায় রোগ বেগ হ্রাস হইতে লাগিল, ব্যাধি জটিল ভাব পরিত্যাগ করিয়া সরল ভাব ধারণ করিল তখন অন্নপূর্ণার স্বার্থ ত্যাগ আরো মহিমাময়, আরোও পবিত্র, ও আরোও মহান্।

বহু দিন ভোগের পর জর পরিত্যাগ পাইল ও তাহা পুনর্ব্বার না হইবার জন্য বন্ধু প্রবর যে ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন, এই সময়ে সেই ঔষধ কোন ঔষধালয়েই পাইলাম না কেবল শিববাটী কোন একটী ডাক্তার বাবুর ঔষধালয়ে লেভেল হীন ঐ ঔষধ প্রাপ্ত হইলাম। ঔষধ দেখিয়া শ্রীমন্ত বাবু বলিলেন যে এ ঔষধ সেবন করান উচিত নহে, কেননা ঠিক এই রকমের এক প্রকার বিষাক্ত ঔষধ আছে, যদি তাহা হয় তবে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ফলিবে। তবে আসুন এক কাজ করি, আমি নিজে এই ঔষধ সেবন করি, যদি ৬ ঘণ্টান্তর মধ্যে বিষাক্ত না হই তবে এই সেই বাঞ্ছিত "নার্ক টীনা"। যদিও আমার প্রাণাধিক পুত্র মৃত্যু শয্যায় তথাপি ও আমি বন্ধুর জীবনের উপর সেই প্রাণ নাশক পরীক্ষা

করিয়া স্বার্থ পরতার পারাকাষ্ঠা দেখাইতে পারিলাম না। শ্রীমন্ত বাবুকে অনেক বলিলাম; তিনি বলিলেন সামান্য বিষ আপনি ভয় করিবেন না, ইহাতে আমার কিছু হইবেনা।" আমরা উপায়ান্তর না দেখিয়া তৎপত্নী অন্নপূর্ণাকে তখনই ডাকিয়া আনিয়া এসমস্ত কথা বিবৃত করিলাম। তিনি নিজে ডাক্তারী জানিতেন হাস্যমুখে বলিলেন "আপনারা অত ভীত হইয়াছেন কেন, প্রাণ নাশক ও ঔষধি নহে। শ্রীমন্ত বাবু পরীক্ষা করুণ।" তৎপর স্বামী সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে নিজ হস্তে ঔষধি ঢালিয়া দিলেন। সে দৃশ্যে আমরা স্তম্ভিত হইলাম। শ্রীমন্ত বাবু ঔষধ সেবন করিলেন। পরীক্ষায় সুফল ফলিল সে যাত্রায় দয়াবতীর চেষ্টায় বালক রক্ষা পাইল। বল পাঠক বর্গ, তোমরা কি এমন পরার্থ প্রীতি-প্রনোদিত প্রাণের আত্মবলি দেখিয়াছ? তোমরা কি এ রমণীকে দেবী বলিবে না? ধন্য অন্নপূর্ণা তুমি ধন্যা!! তোমার ন্যায় রমণী জন্ম গ্রহণ করিয়া রমণী জাতির মুখ উজ্জল করুক।

তাঁহার হৃদয়ের বলের কথা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বিপদের ধারা বাহিক সমাগমে হৃদয় নিপীড়িত হইলেও তিনি কখনও আত্ম বেদনার কথা প্রকাশ করিয়া বন্ধুগণকে ব্যথিত করেন নাই। নিরবে আগ্নেয়গিরিন্যায় ঘনীভূত দুঃখাগ্নি অন্তরে সহ্য করিয়াছেন। ভিতরে তুমুল ঝড়, বাহিরে নিশ্চল শান্ত ভাব। যেমন শ্রাবণের ঘন ঘটাকোন গগণস্পর্শী গিরি শৃঙ্গের মধ্য প্রদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া মলিন পৃথিবী প্লাবিত করিলেও শৃঙ্গমস্তক অপ্লাবিত, পবিত্র সৌর করে উদ্ভাসিত উজ্জল কিরিট শোভায় শোভান্বিত হয়, অন্নপূর্ণা ও

সেইরূপ পৃথিবীর বিপদ জালে জড়িত হইয়া নিরবে একাকিনী দণ্ডায়মানা হইলেও ঈশ্বর কৃপায় উজ্জলময়ী ও পার্থিব বিপদে বিকার শূন্যা। যখন বন্ধুবর উন্মাদ রোগে পীড়িত, পরিবারস্থ সন্তান সন্ততি ও আত্মীয়বর্গ দুঃখ তাড়নে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পর দ্বারায় জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, তখনও অন্নপূর্ণা ঈশ্বর নির্ভরতায় শান্তিমতি ও প্রশান্ত ভাবাপন্না। তখন যিনিই তাঁহাকে সেই বিপদ সাগরে ভাসমানা দেখিয়াছেন, তিনিই তাহার হৃদয় বলের, ঈশ প্রেমের, অবিচলিত বিশ্বাসের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কোথায় সন্তান সন্ততি দাস দাসী পূর্ণ ক্ষুদ্র পরিবাররাজ্যের রাণী, আর কোথায় বা পতি হইতে দূর নিক্ষিপ্ত সন্তান সন্ততি পরিবৃতা ভিখারিনী। মহা পরিবর্ত্তন! দৃঢ় প্রত্যয় না হইলে এ মহা পরিবর্ত্তনে কয় জন স্থির থাকিতে পারে? কয় জন মন প্রাণে বলিতে পারে "দেব তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক"? কিন্তু অন্নপূর্ণা পারিলেন, ঘোর বিপদের মাঝে প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারিলেন "মঙ্গলময়! তুমি যা কর সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য; আমরা অল্প প্রাণ ঘোর স্বার্থপর জীব তাই আপাততঃ অমঙ্গল বলিয়া বোধ করি কিন্তু দেব! তোমার ইচ্ছা জগতে পূর্ণ হউক। "এই বিশ্বাসের বলে কোমল প্রাণা রমণী শৌর্য্য বীর্য্যবান পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠা। দৃঢ় বিশ্বাসের বলে তিনি মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন ও পরিশোধিত স্বর্ণের ন্যায় স্বামী ও পুত্র কন্যাগণ সহ বগুড়ায় উপস্থিত হইয়া নিজগুণপ্রভায় বগুড়া উজ্জল করিলেন। কিন্তু সতী দীর্ঘকাল মানব জগতে রহিলেন না শান্তির উৎস হরি, সংসার দগ্ধাতন-যাকে নিজ শান্তি ময় চরণ কমলে স্থান দিলেন।

হে দুর্ব্বল মানবের একমাত্র আশ্রয় হরি। হে অনাথ বন্ধো! রাখ দেব, রাখ এ রত্নকে তোমার চরণ মকরন্দ পানপিপাষিত করিয়া রাখ। এঁরে তোমার চরণ রাজিতে স্থান দান কর।

শ্রীকৃষ্ণ গোপাল সান্যাল
ছাতিনগ্রাম বগুড়া।
হাঃ মোং বগুড়া।

সুশীল!

মা আজ ১১ বৎসর পর বাল্যকালের ক্রীড়াস্থল সেই বগুড়াতে আবার উপনীত। সেখানে সকলই পুর্ব্বের ন্যায় বিদ্যমান, কেবল দুইটী স্থান অন্ধকারাবৃত। দুইটী স্বর্গীয় নক্ষত্রের অভাব একটী শ্রীমতী মৃণ্ময়ী চাকী, অন্যটী তোমার মা শ্রীমতী অন্নপূর্ণাদেবী। কবৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে যাইয়া শান্তিলাভ করিতাম, আজ সে স্থান তমসাবৃত। সেখানে উপস্থিত হইলে আর চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না।

তোমার মার সমাধি স্তম্ভ দর্শনে শোকবার্তী অধিকতম উজ্জলিত হইতে লাগিল,—সেই পবিত্র স্নেহময়ী মূর্ত্তি যেন সম্মুখে উপস্থিত; মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সুললীত বক্তৃতা স্রোত, সেই সুমধুর উপদেশ, সেই সুরুচি সম্পন্ন সমাজ ও ব্যক্তিগত সমালোচন, সেই পাকশালায় হাস্যমুখ, সেই বিশ্রাম গৃহ সেই উপাসনামন্দির,—একে একে স্মৃতিপথে উপস্থিত হইতে লাগিল।

উচ্চশিক্ষা পাইলে সচরাচর রন্ধন শালার প্রতি অর্দ্ধদৃষ্টি সন্তানগণের লালনপালন-ভার অপর উপর অর্পন, অশিক্ষিতাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন ইত্যাদি তাহার কখনও হয় নাই। পরদুঃখে সহজেই তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইত। হঠাৎ ক্ষুধার্ত্ত

ভিক্ষুক দর্শনে সম্মুখের প্রস্তুত অন্ন দান করিতেও দেখিয়াছি, শীতার্ত্তকে নিজগাত্রবস্ত্র দানে সুখী হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

মধ্যে মধ্যে তিনি পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিতেন তাঁহার উপাসনায় যোগ দিয়া যে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়াছি তাহা এ জীবনে ভুলিব না।

অনেকেই 'ঈশ্বর আছেন' বা 'থাকিতে পারেন' মনে করেন, তাহারা দুর্ব্বল বিশ্বাসী, কিন্তু তিনি প্রকৃত বিশ্বাসী ছিলেন। কখন ও ভ্রমে ও মিথ্যা কথা বলেন নাই। অহঙ্কার কখন ও তাঁহার নিকট স্থান পায় নাই, রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল।

ধর্ম্ম বিষয়ক, রাজ নৈতিক সামাজিক সকল বিষয়, সকল সময়েই তাঁহার সহিত আলোচনায় পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তাঁহার জীবনীতে অনুকরনোপযোগী অনেক সদ্দৃষ্টান্ত আছে, ভরসা করি তাহা পাঠে অনেক কুলবালার হৃদয় প্রশস্ত হইবে।

শ্রীনিশিকুমার ঘোষ
ঠিকানা—এজেণ্ট জীবনবীমা,
আফিস গৌহাটী আসাম।

পূর্ব্ব স্মৃতি।

সংযোগ বিয়োগ সব তোমারি ইচ্ছায় হয় ;
তোমারি ইচ্ছায় সৃষ্টি তোমারি ইচ্ছায় লয়,
ইচ্ছাময় তুমি দেব! মঙ্গলের নিকেতন,
তবহাতে অমঙ্গল কভু কি ঘটিতে পারে ?
রূপ বেশে সাজাইয়া জীবনের রঙ্গ-ভূমে,
যারে রাখ যত দিন সেই তত দিন থাকে,
অভিনয় হ'লে সাঙ্গ কেন সে থাকিবে আর ?
অনন্ত শান্তির কোলে লও তারে দিব্য লোকে।
পার্থিব ক্ষুদ্রতা ছাড়ি লভে সে দেবের প্রেম,
পিয়ে সে স্বর্গীয় সুধা অনন্ত জীবন ভরি ;—
আমরা দুর্ব্বল মতি বুঝিনা সে সুখ তার,
মরিল বলিয়া তাই বিফলে কাঁদিয়া মরি।

অঞ্জলী।

নিব দিব বিলাইব, পথে পথে ছড়াইব,
যে যারে যেখানে পাব হৃদি পুরে দিব সবে।

(অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়)

প্রায় চারি বৎসর অতীত হইতে চলিল দেবী অন্নপূর্ণা লীলা-ময় ভগবানের নিদেশে এই মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই জ্বালা যন্ত্রণাময় শোক-তাপ-জড়িত সংসারের সহিত এইক্ষণ আর তাহার প্রত্যক্ষ কোন সংস্রব নাই,—তাহার দেহের অবসান হইয়াছে সত্য কিন্তু তাঁহার অজর অমর আত্মা এখনও মাতৃক্রোড়ে চির-

শান্তি উপভোগ করিতেছে। তাঁহার স্মৃতি এখনও তাহার পরিচিত ব্যক্তিগণের অন্তরে জীবন্তভাবে জাগরুক। তাহাদের হৃদয়ে তাঁহার যে দীপ্তিময়ী ছবি অঙ্কিত হইয়াছে এখনও তাহার অন্তর্দ্ধান হয় নাই, বরং তাহা নূতন বেশে সজ্জিত, নূতন ভাবে সমাবিষ্ট রহিয়াছে। যাহারা দেবী অন্নপূর্ণার জীবিত-কালে তাঁহাকে সম্যক উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যাহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার চরিত্র পাঠে যত্নবান হই-য়াছেন এবং তদ্বিশ্লেষণে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা দেবী অন্নপূর্ণাকে এ জীবনে ভুলিতে পারিবেন না ইহা আমাদের সরল বিশ্বাস। যাহার অদৃষ্টে দেবী অন্নপূর্ণার সহিত ভাব বিনিময়ের সুবিধা ঘটিয়াছে,—যাহারা ঐ উদার চরিত্রা আদর্শ মহিলার নিকট হইতে প্রীতিপূর্ণ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন আর যাঁহারা দেবোপমা উক্ত রমণীরত্নকে উপদেশ দিবার সময় তাঁহার উপদেশ গ্রহণ ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বিস্মরণ অসম্ভব। আর যাহারা শ্রীমন্ত বাবুর সংগৃহীত অন্নপূর্ণাজীবনীর ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি একত্রও যথা স্থানে সন্নিবেশ করিয়া তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হইবেন আশা করি তাহারা ইহার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবেন।

১৮৭০ সালের নবেম্বর মাসে দেবী অন্নপূর্ণার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তাঁহার বয়ক্রম তখন চতুর্দ্দশ বৎসরের ঊর্দ্ধ নয়। তাহার স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পূর্ব্ব হইতেই আমার বন্ধুতা ছিল, সুতরাং অন্নপূর্ণার প্রতীভার কথক কথক পরিচয় পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এই অল্প বয়সেই তাঁহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্যের বিষয় অবগত হইয়া,

সাক্ষাৎ পরিচয়ের পূর্ব্ব হইতেই, তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতে অভ্যস্ত হইয়া ছিলাম। এই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত-পারিপালিতা পল্লিবালিকা যে আপনার আত্মব স্বামীর সহিত মিশাইয়া দিয়া সম্যক প্রকারে তদনুবর্ত্তিনী হইতে কৃত সংকল্পা হইয়াছেন,—এই নবীন বয়সেই যে বিলাসত্যাগ করিতে পারিয়াছেন ও স্বীয় পতীকে দাসত্ব পরিত্যাগে উৎসাহিত করতঃ পতির হস্ত ধরিয়া অন্ধকারময় ভবিষ্যৎগর্ভে ঝাঁপ দিয়া ঈশ্বরে আত্মনির্ভরের জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে সমর্থা হইয়া ছিলেন ইহা শুনিয়া আমরা পূর্ব্বেই বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিবার পূর্ব্বেই,–তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় হওয়ার পূর্ব্বেই কল্পনা প্রসূত তাঁহার একটী মনোহারিণী ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল। ক্রমে তাহার সহিত পরিচিত হইয়া ক্রমে ক্রমে দিন দিন তাঁহার নূতন নূতন প্রতীভার পরিচয় পাইয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। বরং কর্ণ যাহা পূর্ব্বে শ্রবণ করে নাই এমন নূতন অনেক বিষয় তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি ক্রমে ক্রমে বিবৰ্দ্ধিত ও তাহা পরিণামে ভক্তিতে পরিণত হইতে লাগিল।

দেবী অন্নপূর্ণা শ্রীমন্ত বাবুর সহিত প্রথম বগুড়া আইসার কয়েকদিন পরেই আমি তাহাদের বাসায় উপস্থিত হই। বন্ধুবর শ্রীমন্ত বাবু রজনীতে আহারের পর আমাকে অন্নপূর্ণার নিকট লইয়া গেলেন। এবং আমার সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। সেই দিনই কোন কোন বিষয় আমি তাঁহাকে পরীক্ষা করিলাম। সুশীলার উপাখ্যান হইতে কতিপয় প্রশ্ন করিয়া তাঁহার উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। দেখিলাম যে

তিনি কেবল বাক্যার্থ কণ্ঠস্থ করেন নাই তিনি উহার তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে এবং উক্ত উপাখ্যানের নায়িকার চরিত্র নিজজীবনে প্রতিফলিত করিতে আগ্রহাতিশয় সহকারে যত্নবতী। ঠিক এই সময় হইতে তিনি মনোযোগের সহিত বাবু দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদিত অবলাবান্ধব পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। বাস্তবিকও সুশীলার উপাখ্যান ও অবলা বান্ধব তাঁহার চরিত্র সংগঠনে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল। অবলা বান্ধবের স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবন্ধগুলী, উন্নতমনা ইউরোপীয় আদর্শ রমণীগনের জীবনী নিচয় আর সুশীলার ধর্ম্মভাব, উন্নত চরিত্র, উন্নত গৃহ কর্ম্মের ব্যবস্থা ও পতি ভক্তি তাঁহার জীবনের উপর আশ্চর্য্য ভাবে ক্রিয়া করিতে ছিল। তিনি প্রতিবাসীর ও আত্মীয় স্বজনের শ্লেষবাক্য তুচ্ছ করিয়া স্থির ভাবে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি দেবোপমা আদর্শ হিন্দুললনাগণের চরিত্র শ্রবণও অনুধ্যান করিয়া আসিতেছিলেন,—বাল্যকাল হইতেই পতিই স্বর্গ, পতিই ধর্ম্ম, পতিই সর্ব্বস্ব জানিয়া আদর্শ আর্য্য-রমণীগণের আদর্শে আপন চরিত্র গঠন করিতে ছিলেন,—বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরে আত্মনির্ভর শিক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার সহিত পাশ্চাত্য আদর্শ রমণীগণের চরিত্রের ও তৎসময়োপযোগী সুশীলার উপাখ্যানের আদর্শের সংমিশ্রণে তাঁহার চরিত্রে মনিকাঞ্চনযোগ উপস্থিত হইল। আদর্শ-আর্য্য-রমণীদের পাতিব্রত্য, সরলতা, দয়া আত্মত্যাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণের সহিত পাশ্চাত্য রমণীদিগের সৎসাহস, স্বাধীনতা, স্বদেশপ্রেম, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, কর্ত্তব্য

জ্ঞান আত্মমর্য্যাদা ও প্রতিজ্ঞা সংরক্ষন প্রভৃতি সৎগুণাবলী তিনি একে একে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে লাগিলেন।

শৈশবে মাতৃহীনা সহোদরা স্বর্ণময়ীর অকৃত্রিম স্নেহ ও আদরে প্রতিপালিতা অন্নপূর্ণা যে প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন,—যাহা শৈশবেই বাল্যসখা খুল্লতাত মহেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থের উপদেশে, বাল্য সখী অনন্তময়ীর স্নেহময় জনক হরিমোহনের যত্নে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া ছিল সেই প্রতিভা এইক্ষণ পতির অনুরাগে ও ঈশ্বরপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া এত দিনে পল্লবিত ও শুক্লাপ্রতিপদের চন্দ্র-লেখার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। সর্ব্ব প্রকারে পতির অনুবর্ত্তিণী হওয়া তাঁহার জীবনের অন্যতর লক্ষ্য ছিল সত্য কিন্তু ঈশ্বরে আত্মনির্ভর আত্মসমর্পন ও ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারনই যেন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র, এবং তৎ-সাধনাই যেন তাঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কখনও তাহাকে এই লক্ষ্যভ্রষ্টা হইতে দেখা যায় নাই। তিনি নানাবিধ বিঘ্নবাধায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া জীবনের অন্যতম লক্ষ্যগুলি, তাঁহার এই মহান্ উদ্দেশ্যের অন্তরায় হইলে, তাহাদিগকে ইহার অধীন করিয়া বিনীত অথচ স্বাধিন ভাবে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইটীই দেবী অন্নপুর্ণার স্বাতন্ত্র্য। নতুবা আর সকল স্থলেই অন্যের বিশেষতঃ স্বীয় পতির স্বার্থের নিকট নিজ স্বার্থকে বলি প্রদান করিতে কখনও কুণ্ঠিতা হইতেন না।

অন্নপূর্ণা ইতি পূর্ব্বেই প্রাণপতির নিকট ব্রাহ্মধের্ম্মর মুল সূত্র গুলি পরিজ্ঞাত হইয়া ছিলেন, ঢাকার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত ব্রহ্মোপাসনায় যোগপ্রদান করিয়া উপাসনার মাধুর্য্য

উপলব্ধি করিতে পারিয়া ছিলেন, প্রকৃত উপাসনা যে আত্মোৎকর্ষবিধানের উপায় এবং তাহাতে আত্মপ্রসাদের বিমল আনন্দ উপভোগ করা যায় ইহা কথক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ যে পদ্ধতি অনুসারেই হউক না কেন বাল্যকাল হইতেই তিনি নিবিষ্টচিত্ত সহকারে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া আসিতে ছিলেন। হিন্দুবালিকার অবশ্য প্রতিপালনীয় ব্রতনিয়ম গুলি অনুরাগের সহিত সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন, বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মে তাঁহার সম্যক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। তিনি স্বয়ং সুন্দর সুন্দর ঘটনার অবতারনা করিয়া তাঁহার বাল্য জীবনের ধর্ম্মানুরাগের বিষয় গল্প করিতেন ও কি প্রকারে স্বামীর উপদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম অর্থাৎ স্বামীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন তাহাও বলিতেন বাহুল্য ভয়ে সে সকলের সম্যক উল্লেখ হইল না।

অন্নপূর্ণার চরিত্র বিশদরূপে বুঝিতে হইলে কি প্রকার একের জীবন অন্যের জীবনের উপর কার্য্য করিতেছিল তাহা বুঝিতে হইলে প্রিয় সুহৃদ শ্রীমন্ত বাবুর গত জীবনীর কথকাংশের অবতারণা করিতে হইবে। শ্রীমন্ত বাবুও যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। হিন্দুর আচারনিয়ম গুলি অতি দৃঢ়তা সহকারে প্রতিপালন করিতেন, হিন্দুদেবদেবীর প্রতি কখনও আস্থাশূন্য হন নাই। দৃঢ়ভক্তি সহকারে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেন। কলিকাতা মেডিকাল কালেজে যখন প্রথম প্রবেশ করেন সে সময় অত্যন্তকষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি হিন্দুয়ানি বজায় রাখিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কলিকাতা যাওয়ার পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নামও শুনেন নাই। কলিকাতার মেডিকাল কালে-

জের সংসর্গেই ক্রমে ক্রমে তাঁহার হিন্দুয়ানি তিরোহিত হইতে আরম্ভ হয়। সন্ধ্যাবন্দনাদি এখন বড় একটা করেন না। হিন্দুধর্ম্মের উপর অটল বিশ্বাস এই সময় হইতে শিথিল হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে সন্দেহবাদ আসিয়া শরীর অধিকার করিল। এই সময় ভক্ত কেশব চন্দ্র আদি সামাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন এবং এই সময় হইতেই তাঁহার ভাবময়ী হৃদয় গ্রাহী মোহিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া যুবক বৃন্দ দলে দলে তাঁহার সমাজ ভুক্ত হইতে আরম্ভ করেন। শ্রীমন্ত বাবুও এই সময় হইতেই কেশব চন্দ্রের সমাজে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইলেন এবং মনে মনে একেশ্বর বাদে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। মেডিকাল কালেজের গুরুতর পরিশ্রমে এই সময় ধর্ম্ম বিষয়ে অধিক চিন্তা করিবার অবকাশ নাই। তিনি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইলেন বটে, হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী আচার নিয়ম প্রতিপালন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে বিরত হইলেন বটে কিন্তু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাই বলিয়া এ সময়ও তাহার কোনপ্রকার নৈতিক অবনতি হয় নাই বা মুহূর্ত্তেকের জন্যও নাস্তিকতা তাহার অন্তরে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। হিন্দুমতে উপাসনা ও প্রার্থনা ত্যাগে তাঁহার হৃদয়ের সরসতা কতক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছিল বটে কিন্তু তিনি নৈতিক বলে বলীয়ান হইয়া একেশ্বর সম্বন্ধীয় শুষ্ক বিশ্বাসটি সযত্নে পরিপোষণ করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। শ্রীমন্ত বাবুর বিবাহের সময় পর্য্যন্তও তাহার ধর্ম্মজীবনের অবস্থা এতদ-স্বরূপই ছিল। ১৮৬৯ সালে (বিবাহের প্রায় ২ বৎসর পর) তিনি যখন প্রথম বগুড়ায় আইসেন তখনও দেখিয়াছি ব্রাহ্মধর্ম্ম

ও ব্রাহ্ম সমাজের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে; হিন্দু আচার ব্যবহার প্রকাশ্যে কথক পরিমাণে মানিয়া চলিলেও সে সকলের উপর অনুমাত্রও আস্থা নাই। ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা মুখে স্বীকার করিতেন বটে কিন্তু উপাসনা করা বা উপাসনায় যোগদান করা বড় একটা অভ্যাস ছিল না। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন অর্থাৎ নৈতিক নিয়ম গুলি যথাযথ প্রতিপালন হইলেই যেন উপাসনার কার্য্য শেষ হইল। এই রকম কথকটা তাঁহার ধারণা ছিল। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার আবশ্যকতা তিনি আদৌ স্বীকার করিতেন না। সে সময়ে কোন রূপ প্রার্থনা করিতেও তাঁহাকে আমরা দেখি নাই। এই সময় বগুড়ায় সাধারণ সমাজ ব্যতিতও ছাত্রদের একটি শাখা ব্রাহ্মসমাজ ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে সমাজে যাইতেন বটে কিন্তু কখনও তাঁহাকে বেদিতে বসিয়া উপাসনা করিতে দেখি নাই। অন্যের উপাসনা প্রার্থনাদিতেও যে তিনি কি পরিমাণ আন্তরিক যোগপ্রদান করিতে সক্ষম হইতেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। ফল কথা সেই সময়ের শ্রীমন্ত বাবুর সহিত এইক্ষনকার শ্রীমন্ত বাবুর তুলনা করিলে বোধ হয় তিনি যেন নবজীবন পাইয়া নব কলেবর ধারণ করিয়াছেন। কি প্রকারে তাহার ধর্ম্মজীবনে এই প্রকার যুগান্তর উপস্থিত হইল অন্নপূর্ণার জীবন সমালোচনা করিতে করিতে তাহা সাধ্যানুসারে দেখাইতে চেষ্টা করিব। কতদুর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারিনা।

বিবাহের পর পতির উপদেশ প্রচলিত হিন্দু দেব দেবীর প্রতি বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল। পতিগতপ্রাণা অন্নপূর্ণা পতির আদর্শে স্বীয় জীবন গঠিত করিতে কৃতসংকল্পা

হইলেন। পতির অনুরূপ হইবার নিমিত্ত তিনি নিজের আত্মত্ব একপ্রকার লোপ করিলেন; পতির নিকট আত্মস্বার্থ চির-দিনের জন্য বিসর্জ্জন করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব গুলি পতির নিকট হইতে বুঝিয়া লইলেন। তাহার হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস যেমন ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল তেমনি তিনি ক্রমে ২ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সূত্র গুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে লাগিলেন। অভ্যস্ত কুসংস্কার গুলি ক্রমে ২ তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। বাহ্যিকে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহার স্বামীর অনুরূপ হইল বটে কিন্তু প্রার্থনার অনাবশ্যকতার কথা তাঁহার মনে স্থান প্রাপ্ত হইল না। বাল্যকাল হইতে হিন্দু দেবদেবীগণের নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিতে ছিলেন এইক্ষণও মনে মনে তদ্রূপ পরম ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং বলিতেন যে এই সময়ে যখন কোন প্রকার কষ্টে পতিতা হইয়াছেন তাহার মন প্রাণ ব্যাকুল হইলেই তখনই একমনে কাতরপ্রাণে তিনি নির্জ্জনে প্রার্থনা করিতেন এবং প্রার্থনার পরই যেন তাঁহার মন কথক ভাল হইত, হৃদয়ে যেন এক প্রকার অনির্ব্বচ-নীয় সুখ অনুভব হইত। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাসনা ও প্রার্থনার পদ্ধতি এখনও তিনি জানিতেন না সুতরাং রীতিমত উপাসনা প্রার্থনাদি করার সুযোগ ও সময় এখনও তাঁহার উপস্থিত হয় নাই।

ইহার পর যখন ১৮৭০ সালের প্রথম ভাগে তিনি ঢাকায় গিয়া পতির বন্ধুগণের সহিত পরিচিতা হইলেন, অমনি তাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুযায়ী উপাসনায় যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে উপাসনার পদ্ধতিটি তাঁহার

সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইল এবং ক্রমে ২ তাহার রসাস্বাদনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। অল্প সময়েই আড়ম্বরে না হউক কার্য্যতঃ তিনি একটী প্রকৃত ব্রাহ্মিকা হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক গুলি ক্রমে ২ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ও দিন ২ তাঁহার চিত্তে নূতন ২ ভাবের সমাবেশ হইতে লাগিল।

দেবী অন্নপূর্ণা বগুড়া আসিবার পরও কতক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকেও প্রকাশ্য উপাসনা করিতে দেখি নাই সত্য কিন্তু যখনই নির্জ্জন হইতেন অমনি ব্যাকুল অন্তরে দেবাদিদেব মহাদেবকে ডাকিতেন ও প্রার্থনা করিতেন। অন্নপূর্ণা বাল্যকাল হইতেই আড়ম্বরশূন্যা। নীরবে কার্য্য করিয়া যাওয়াই তাঁহার স্বভাব। তিনি এসময়েও নীরবে গন্তব্যপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও স্বীয় কর্ত্তব্য গুলি যথাযথ রূপে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি নীরবে এই সময় হইতেই পতির অন্তঃকরণে প্রভূত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, এই সময় হইতেই নীরবভাষায় প্রার্থনার আবশ্যকতা পতিকে বুঝাইতে আরম্ভ করেন। প্রার্থনা ভিন্ন যে হৃদয় সরস হয়না, প্রার্থনাবারী সিঞ্চিত না হইলে কেবল নৈতিক বলে ধর্ম্মবিশ্বাস টিকিতে পারেনা, একেবারে বিনষ্ট না হইলেও যে ধর্ম্ম বিশ্বাসটি ম্রিয়মাণ অবস্থায় থাকে এবং প্রার্থনা ব্যতিরেকে যে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম হওয়া যায় না ক্রমে ২ পতির হৃদ্বোধ করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রার্থনা করাই প্রার্থনার উপকারীতা-উপলব্ধির এক মাত্র উপায় ইহা তিনি নিজজীবনে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, পতিকেও তাহার অংশভাগী করিলেন। ক্রমে ২ প্রাণপ্রতীম প্রাণেশ্বরকে অন্তরের সহিত প্রার্থনায় যোগপ্রদান ও স্বয়ং

প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্তি লওয়াইলেন। অন্নপূর্ণার উদ্যোগেই শ্রীমন্ত বাবু স্বয়ং প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে আজ শ্রীমন্ত বাবুর ধর্ম্ম-জীবন নূতন ভাবে গঠিত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে ২ তিনি এক জন নিষ্ঠাবান আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়া উঠিলেন। অন্নপূর্ণার ন্যায় পত্নী প্রাপ্ত না হইলে শ্রীমন্ত বাবুকে আমরা এই প্রকার দেখিতে পাইতাম কি না বলা কঠিন। এবং ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিতে হইলে ইহাও বলিতে হয় যে অন্নপূর্ণা শ্রীমন্ত বাবুর সহিত পরিনীতা না হইলেও তাহার প্রাক্তন-প্রতিভার এপ্রকার মধুর বিকাশ এতদূর সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ।

অন্নপূর্ণা বগুড়া আইসাবধিই গৃহকর্ত্রীর সমস্ত কার্য্য তাঁহারই স্কন্ধে পড়িল। প্রথমেই দেখিলাম যে অন্নপূর্ণার শিক্ষা কেবল লেখাপড়ায় পর্য্যাপ্ত নহে। হিন্দু গৃহ পালিতা বালিকা বালিকাবয়সেই রন্ধন কার্য্য অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। গৃহস্থালী কার্য্যও অত্যন্ত নিপুনতা সহকারে অভ্যাস করিয়াছেন। শিল্প কার্য্যেও তাঁহার নিপুণতা প্রথম হইতেই ছিল। এ দিকে যৌবনের চাঞ্চল্য নাই, অহঙ্কার, বিলাসিতা, মিথ্যাচরন ও কলহ প্রভৃতি তাঁহার ত্রিসীমায়ও আসিতে পারে না। ও দিকে লোকের নিন্দায় ভ্রুক্ষেপ নাই, মুখের উপর অনেকে অনেক কটু কথা বলিয়াছে শুনিয়াছি কিন্তু তিনি প্রায় সময়ই হাস্য মুখে তাহার উত্তর দিয়াছেন। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অন্নপূর্ণার বাহ্যিকআচরণ গুলি তাহারা যেপ্রকার মন্দ দেখেন বা যে প্রকার তীব্র সমালোচনা করেন বাস্তবিক সে গুলি আদৌ

দোষাবহ নহে। নবীনা অন্য রমণী হইলে হয়ত এই প্রকার অন্যায় নিন্দা কারিণী রমণীদিগকে দ্বারবান দিয়া তাড়াইয়া দিয়া আপনার প্রেষ্টিজ (prestige) বজায় রাখিতেন, বা তাহাতে অপারগ হইলে তাহার সহিত তুমুল কোন্দল করিয়া প্রকাশ্য ক্ষমা প্রার্থনা পাঠ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত নিজে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিতেন।

দেবী অন্নপূর্ণা কিন্তু সে ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি জানিতেন যে এই প্রকার নিন্দাকারিনীদিগের মত ভ্রান্ত হইলেও উদ্দেশ্য মহৎ। তাহারা বাস্তবিক তাঁহার মঙ্গল কামনায়ই আচরিত পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলেন। হাতে শঙ্খ খাড়ু না দিলে বিধবা হওয়ার আশঙ্কা, তাহারা সরল ভাবে বিশ্বাস করেন; মোজা জুতা পায় দেওয়া শীলতা বিরুদ্ধ তাঁহারা বরাবর দেখিয়া আসিতেছেন; এই সকল লইয়া অন্য সকলে নানা বিধ কুৎসা করে, অন্নপূর্ণার প্রতি ভালবাসা থাকায়, তাহাদের তাহা অসহ্য অন্নপূর্ণা ইহা বলিতেন, ইহা বুঝিতেন। তাঁহার আত্মসংযম গুণও বিলক্ষণ ছিল তাই তিনি ক্রোধের পরিবর্ত্তে হাস্য মুখে তাহার উত্তর দিতেন। আর তাহা না জানিলে না বুঝিলেই বা কি? রূঢ় ভাষায় উত্তর দেওয়া অন্নপূর্ণার প্রকৃতি বিরুদ্ধ, তাই ঈর্ষা পূর্ব্বক কেহ তাঁহার সাক্ষাতে ঐরূপ নিন্দবাদ করিলেও তিনি হাসিয়া উত্তর দিতেন, ভাল ব্যবহার দ্বারা মন্দ ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতেন; সুতরাং অল্প সময়েই অন্নপূর্ণারই জয় হইত। যাহারা বিষাক্ত জিহ্বা লইয়া আগমন করিতেন তাহারাই আবার অন্নপূর্ণার এবম্বিধ সদ্গুণে মুগ্ধা হইয়া লজ্জিত বদনে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যাইতেন।

এই প্রকার অন্নপূর্ণা প্রতিবেশী রমণীগণের হৃদয়েও নিজ অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন।

বগুড়া আইসার ২। ৪ মাস পরই অন্নপূর্ণার প্রথম গর্ভ সঞ্চার হয়। এসময় তিনি গৃহ কার্য্য গুলি প্রায় নিজ হস্তেই করিতন। এই গর্ভাবস্থাতেই তিনি ধাত্রীবিদ্যা পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থায় ধাত্রীবিদ্যা পাঠ হইতে বিরত করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু অন্নপূর্ণা তাহা হইতে বিরত হইলেন না। ধাত্রীবিদ্যায় নব-প্রসূতীদের অনেক প্রকার বিপদাশঙ্কার কথা আছে, সে গুলি পড়িয়া ভয় প্রাপ্ত হইলে বিপদ সম্ভাবনা এই আশঙ্কায় তাঁহাকে নিবারণ করা হয় কিন্তু অন্নপূর্ণা তাহা শুনিলেন না। অত্যন্ত মনোযোগ করিয়া ধাত্রী বিদ্যা খানি পড়িয়া ফেলিলেন। বাস্তবিক এই আপনার প্রয়োজন সময় অভিনিবেশ পূর্ব্বক পুস্তক খানি পড়িয়া ছিলেন বলিয়া তিনি পরে প্রসবকালীন অনেক মহিলাকে সাহায্য করিতে সমর্থা হইয়া ছিলেন। প্রত্যুত তিনি ধাত্রী কার্য্যে সমধিক নিপুণা হইয়া ছিলেন। তিনি প্রসব দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলেই যেন প্রতিবেশী রমণীদের দ্বিগুণ মনের বল হইত। তিনিও কাহারও প্রসবে কোন কষ্ট বা বিপদাশঙ্কা শ্রবণ করিলে, কি শত্রু কি মিত্র, সেই বাটীতে শতকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইতেন।

অতি অল্প কাল মধ্যেই অন্নপূর্ণা বাঙ্গালা ভাষায় বুৎপন্না হইয়া উঠিলেন। ১৮৭২ সালে যখন বঙ্গদর্শন ও মধ্যস্থ পত্রিকা বাহির হয়, অন্নপূর্ণা ঐ উভয় পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পড়িয়াই স্থির করিলেন বঙ্গদর্শন বঙ্গসাহিত্যের গৌরব-স্থানীয় হইবে। মধ্যস্থ যতই আড়ম্বরে প্রথম ২ বাহির হউক না কেন, ইহার

স্থায়িত্ব কাল অধিক দিন নহে। তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়া নিয়মিতরূপে বঙ্গদর্শন পড়িতে আরম্ভ করেন। বঙ্গদর্শনের তৎকালীয় উপাদেয় প্রবন্ধগুলির এমত চমৎকার সমালোচনা করিতেন যে তাহাতে সময় ২ অবাক হইতে হইত। বঙ্গদর্শনে যখন "নবীনা ও প্রবীনা" প্রবন্ধ বাহির হয়; আমি ও অন্নপূর্ণা এক সঙ্গে ঐ প্রবন্ধ পড়ি। তৎপর সন্ধ্যার সময় যখন সেই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, সে সময় কেহ নবীনার কেহ প্রবীণার পক্ষপাতী হইয়া নানা প্রকার দোষ গুণের বিচার আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তখন লজ্জিত ভাবে অন্নপূর্ণা বলিলেন "উভয় পক্ষেই কতক গুলি সত্য রহিয়াছে, এক পক্ষ সমর্থন করিয়া অন্যকে ডুবাইয়া দেওয়া অসম্ভব। আমি বুঝিতে পারিনা কেন অস্মদ্দেশীয় যুবতীগণ অনুকরণের দাসী হইয়া প্রাচীনা দিগের সদ্গুণগুলিও ভুলিয়া যাইতেছেন, বাহিরের চাকচিক্যে মোহিত হইয়া পাশ্চাত্য মহিলাগণের দোষরাশী নিজেতে সংক্রমিত করিতেছেন, আবার বুঝিনা আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা অনেকেও বা কেন পাশ্চাত্য গুণশালিনী রমণীদের চরিত্র অনুকরণের অন্তরায় হইতেছেন এবং সমাজের অর্দ্ধভাগিণী নারীকুলকে চির কাল অন্ধকারে রাখিতে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন? কেনই বা নারীকুলকে পুরুষদের বিলাস-সামগ্রী অপেক্ষা উচ্চতর অধিকার দিতে সম্মত হইতেছেন না। বাস্তবিকই প্রাচিনা ও নবানার সংমিশ্রণে বঙ্গীয় নারীকুলের চরিত্র সংগঠন করা সম্ভবপর হইলে কি সুখের হইত।" তাহার এই হৃদয় গ্রাহী নিরপেক্ষ সমালোচনা শ্রবণে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সকলের মনেই যেন কোন বিশেষ ভাবের উচ্ছাশ লক্ষিত হইল।

সকলেই যেন অন্নপূর্ণার অভিমতানুরূপ নারী চরিত্র গঠনের সাহায্যে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু এ সকল তাঁহাদের সাময়িক উচ্ছাশ। জলবুদ্বুদের ন্যায় কিছুকাল পর আপনার মনেই লয় হইল। কিন্তু দেবী অন্নপূর্ণা সে প্রকৃতির নহেন। তাঁহার কথায়ও যা, কার্য্যেও তাহাই। তিনি ঐ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইলেন। আপন চরিত্র ঐ কাল্পনিক আদর্শে গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার নারী বন্ধুগণেকে তদনুরূপ হইতে পরামর্শ দিলেন; এবং যে ভাবে তিনি নিজের মেয়েদের চরিত্র গঠন করাইয়া ছিলেন তাহা দেখিয়া বোধ হয় মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ও তাঁহার সে চেষ্টার বিরাম হয় নাই।

এই সময় অন্নপূর্ণা দেবীর শিক্ষার কিছু কিছু সাহায্য আমিও করিতাম। তাঁহার উপদেশ গ্রহণ ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতে হইত। যাহা তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা এক বার তাঁহার হৃদ্গত হইলে প্রস্তর রেখার ন্যায় অঙ্কিত থাকিত। সন্ধ্যার সময় প্রত্যহই এই সময় মনোনিত কতিপয় বন্ধুগণের একটী সান্ধ্যসমিতি বসিত। ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার আলোচনা হইত। অন্নপূর্ণা এই সময়ে যে প্রকার মনোযোগের সহিত এই আলোচনায় যোগ প্রদান করিতেন,-আলোচ্য বিষয় গুলির যে প্রকার তর্ক বিতর্ক ও সমাধান হইত তাহা অভিনিবেশ সহকারে যে প্রকারে আয়ত্ব করিতে পারিতেন তাহা দেখিয়া সকলেই সুখী হইত। সকলেই ক্রমে তাঁহার প্রতীভার পরিচয় পাইতে লাগিলেন; উচ্চ ২ ভাব গুলি ক্রমে ২ তাঁহার হৃদয়ে পরিস্ফুট হইতে লাগিল এবং এই সম্মিলনীটীতে সকলেই সমধিক সুখ বোধ করিতে লাগিলেন এই সময়ই বাবু বরদা

নাথ হালদার অন্নপূর্ণার প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিক্ষার সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। অন্নপূর্ণা "নির্ম্মলার উপাখ্যান" ইতি পূর্ব্বেই পাঠ করিয়া ছিলেন এবং বরদা বাবুর উক্ত আখ্যানের ঘটনা বলিতে যে অংশ আছে তাহা সম্যক জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং বরদা বাবুর উপর যথেষ্ট ভক্তি পূর্ব্ব হইতেই ছিল। এই সময় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা ছাত্রী শ্রীমতি রাধার সহিত বরদা বাবুর জ্যেষ্ট ভ্রাতার বিবাহ হয়। বালিকা বিদ্যালয়ের তদানিন্তন পণ্ডিত শ্রীযুত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত ও বরদা বাবু এই বিবাহের উদ্যোক্তা ছিলেন। এই বিবাহ হিন্দু মতানুযায়ী হইলেও বগুড়াতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকের সহিত বাঙ্গালীর এই প্রথম বিবাহ। এই বিভিন্ন শ্রেণীর বিবাহ (Inter marriage) হইবে শুনিয়া অন্নপূর্ণা প্রথমতঃ বড়ই আনন্দিত হইলেন। হিন্দু সমাজ ক্রমে ২ কুসংস্কারের বন্ধন শিথিল করিতেছেন ভাবিয়া আশান্বিত হইলেন বটে কিন্তু পর ক্ষণেই আবার যখন শুনিলেন বর মেয়ের অনুরূপ হয় নাই এবং বগুড়াস্থ হিন্দু সমাজ এই বিবাহ অনুমোদন করেন নাই অমনি দুঃখিত হইলেন। গোবিন্দ বাবু ও বরদা বাবু প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া যে এমন গুণশালিনী বালিকাটির বিবাহ এই প্রকার বরে দিয়াছেন ইহা শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। গোবিন্দ বাবু ও বরদা বাবু উভয়েই তাঁহার শিক্ষক স্থানীয়, উভয়কেই তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিলেন না। তিনি ধীর ও নম্র ভাবে এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন এবং বরদা বাবু স্বয়ং এই মেয়েটিকে বিবাহ করিলে যে অধিক সুখাবহ হইত স্বাধিনভাবে এই মত ব্যক্ত করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরেই অন্নপূর্ণা বুঝিতে পারিলেন যে বরদা বাবুর মনে অন্ততর মহৎ উদ্দেশ্য আছে। রাধাকে তিনি বিবাহ করিলে তাঁহার বড় বিধবা ভগ্নির বিবাহ হওয়া দুষ্কর হইত, এই জন্যই বরদা বাবু ছোট ভগ্নিকে পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিয়া পরে নিজে বিধবাটিকে বিবাহ করিবেন ; বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই মনে ২ ঠিক করিয়াছিলেন। এই বিবাহের অল্প দিন পরেই বরদা বাবুর বিবাহ এক প্রকার ঠিক হইয়া গেল। মেয়ের পিতা এই বিবাহে যোগদান করিতে অস্বীকার করিলেন। এই ক্ষণ বিবাহের পর স্ত্রীটিকে কোথায় রাখিবেন কি প্রকারে বিবাহ হইবেক এই সকল আলোচনা চলিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা এইক্ষণ হিন্দু সমাজ ভুক্ত। তথাপি তিনি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে শ্রীমন্ত বাবুকে অনুরোধ করিলেন,—সমাজ অনুমোদন করুক আর নাই করুক এই বিবাহের সহায়তা ও এই বিবাহে যোগদান করিতেই হইবে এবং আবশ্যক হইলে ঐ বিধবা মেয়েটিকে তিনি নিজ গৃহে স্থান দিবেন। তিনি সহজেই শ্রীমন্ত বাবুর মত করিতে পারিলেন। অন্নপূর্ণা প্রায়সই আহ্লাদসহকারে বলিতেন যে রাধার বিবাহ বরদা বাবুর ভ্রাতার সহিত না হইলে তাঁহার বিধবা ভগ্নিটির বিবাহ হয়ত আদৌ হইত না, এবং তাহার জীবন বরদা বাবুর উপদেশ ও সংমিশ্রনে এইক্ষণ যে প্রকার উন্নত হইয়াছে তাহা আশাই করা যাইত না।

১৮৭৩ হইতে ১৮৭৫ সাল পর্য্যন্ত আমি কলিকাতায় থাকায় এই ৩ বৎসরে অন্নপূর্ণার জীবনে কি কি কারণসমবায়ে কি প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ পরিজ্ঞাত নহি। কিন্তু কলিকাতা থাকা কালে দেবী অন্নপূর্ণার যে সকল

পত্র পাইতাম তাহাতে ক্রমোন্নতির ছায়া স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইত। সেই সময় কলিকাতা স্কুলে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় যে সকল উপদেশ দিতেন তাহার সারমর্ম্ম মধ্যে মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতাম। অন্নপূর্ণা তাহা পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন। এই সময় হইতেই তাহার কলিকাতা দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হয়।

১৮৭৫ সালের শেষভাগে অন্নপূর্ণা স্বামীর সহিত কলিকাতা যান। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে তৎসম্বন্ধে আমার সহিত আলাপ হয়। তাঁহার সহিত আলাপে বুঝিলাম যে তিনি কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মিকাদের যে চিত্র পূর্ব্বে মনে মনে হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিলেন কলিকাতায় কিন্তু তদনুরূপ দেখিতে পান নাই। পুস্তকস্থ বিদ্যায় অনেক রমণীকে বিশেষ পারদর্শী দেখিলেন সত্য কিন্তু সার্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার অনেক ত্রুটি দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শ রমণীগণের যে জীবন চরিত পাঠ করিয়া ছিলেন সে প্রকার ১টি রমণীও দেখিতে পাইলেন না। বরং যাহাদের নামও গুণ গরিমার বিষয় পূর্ব্বে তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, যাহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যেও কাহাকে কাহাকে বহিশ্চাকচক্যবতী অন্তঃসারবিহীনা গর্ব্বিতা বিলাসপ্রতিমার ন্যায় দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। অধিকাংশই এতদ্দেশস্থিত পাশ্চাত্য রমণীগণের ন্যায় বেশ বিন্যাস, ও বহিঃসৌন্দর্য্যে অধিক আকৃষ্ট; বিনয়, ক্ষমা, আত্মত্যাগ, নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার প্রভৃতি সদ্গুণ গুলি যেন একেএকে তাঁহাদের অনেকের নিকট বিদায় লইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে বিলাসিতা, যশোলিপ্সা, বৃথাভিমান, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলিরই যেন অধিকার

হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা একেবারে সৎকর্ম্মহীন নন বটে কিন্তু যে সকল সৎকার্য্য তাঁহারা করেন তাহা নীরবে করিতে পারেন না, যেন সভ্য জগতে পরিচিত হওয়া বা নাম কিনাই তাঁহাদের অন্তুতর উদ্দেশ্য। তাঁহারা বিদ্যায় বুদ্ধিতে সমধিক উন্নত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে সকল সদ্গুণে ভূষিতা হইলে নারী-কুল জন সমাজে প্রসিদ্ধ হয়—ও দেবী ভাবে বর্ত্তমান ও ভবিষ্য বংশীয়গণের নিকট পূজিতা হয়, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে সে সকল গুণের বড়ই অভাব। ফলকথা কলিকাতাস্থ শিক্ষিতা-রমণীগণের চরিত্র হইতে শিক্ষয়িতব্য অনেক বিষয় সংগ্রহ করি-বেন বলিয়া যে প্রকার আশান্বিত হৃদয়ে কলিকাতা গিয়াছিলেন তাঁহার সে আশা সফল হয় নাই। তিনি কেবল কুমারী রাধারাণী লাহিড়িকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। কলিকাতার শিক্ষিত নারী সমাজ মধ্যে রাধারাণী একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বলিয়া অন্নপূর্ণার ধারনাছিল।

এই সময় অন্নপূর্ণার জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া-ছিল। এইক্ষণ তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহা হইলেও পতির অনভিমতে কোনস্থানে গমন বা পতির অনভিপ্রেত কোন কার্য্য করিতেন না। পতির হৃদয়ে এইক্ষণ তাহার পূর্ণ রাজত্ব, অন্নপূর্ণা এইক্ষণ এইক্ষুদ্র সংসারের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এবং বন্ধুবান্ধবগণ সম্বন্ধে তিনি সুখতারারূপে বিরাজ করিতেছিলেন। স্বামিকে ইতি পূর্ব্ব হইতেই প্রার্থনাশীল করিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন; এইক্ষণ শ্রীমন্ত বাবু ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য, অন্নপূর্ণার প্রভাবে শ্রীমন্ত বাবু এইক্ষণ উপবীতত্যাগী নিষ্ঠাবান আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। অন্নপূর্ণার গৃহে

এইরূপ প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত। প্রাত্যহিক উপাসনা প্রার্থনা ও অন্নপূর্ণার মধুর ভাবময় সুললীত ব্রহ্ম সংগীতে অন্নপূর্ণার ক্ষুদ্রগৃহ প্রতিধ্বনিত। অন্নপূর্ণার গৃহ এইরূপ বন্ধুবান্ধবগণের বিরামস্থল। অপরাহ্ণ চারিটার পর হইতেই তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অন্নপূর্ণার গৃহে উপস্থিত হইতেন,—এবং সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয় সদালাপনে সুখে সময় অতিবাহিত করিতেন। কঠিন কঠিন বিষয়েরও মধ্যে মধ্যে অবতারনা হইত, এবং তাহা লইয়া বাদবিসম্বাদও হইতে দেখা যাইত; কিন্তু সেই কঠিন কঠিন বিষয় সকলের অন্নপূর্ণা যেরূপ সুন্দর সুন্দর সমাধান করিতেন তাহা শুনিয়া সকলে আনন্দিত ও বিস্মিত হইতেন। এইসময় বা ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতে অন্নপূর্ণা প্রকাশ্যভাবে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। অন্নপূর্ণার উপাসনায় যাহারা অভিনিবেশ সহকারে যোগ প্রদান করিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই তাহার মাধুরিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এপ্রকার সরল, বাক্যাড়ম্বরবর্জ্জিত ভাবময়ী প্রাণস্পর্শী উপাসনায়, এমন ব্যাকুলতাপূর্ণ, উচ্ছ্বাসময় বিশ্বপ্রেমিক প্রার্থনায় যাহারা সম্যক যোগ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে তাহাতে তাঁহারা কি পরিমাণ লাভবান হইয়াছেন ও প্রার্থনান্তে নিজ নিজ অন্তরে কি প্রকার প্রশান্ত ভাবও আত্ম প্রসাদ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যাহারা অন্নপূর্ণার উপাসনাসময় তাঁহার মুখে "ও হে ধর্ম্মরাজ বিচার পতি" ও প্রার্থনান্তে "গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে নাকো আর" এই দুইটি ব্রহ্মগীতি শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারা তাহা ভুলিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।

অন্নপূর্ণা বনফুল। ঈশ্বরের আদেশে বনমধ্যেই মুকুলিত হইয়াছিলেন। ক্রমোন্নতির নিয়ম অনুসারে এইক্ষণ প্রস্ফুটিত হইয়াছেন,—আপনমনে নীরবে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। অন্যে দেখুক বা না দেখুক তাহাতে তাঁহার কি? তাঁহার সৌরভ বিস্তৃতই হউক বা সীমাবদ্ধই থাকুক তাহাতেই বা তাঁহার কি? এতদিন তিনি নির্দ্দিষ্ট বন্ধু বান্ধবগণের নিকট পরিচিতা ছিলেন, এইক্ষণ বগুড়াস্থ সকলেই তাঁহার গুণে ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণার গৃহ ক্রমে সকলের প্রাণ জুড়াইবার স্থান হইল। সকলেই আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহার সহিত ভাব বিনিময়ে অগ্রসর হইলেন। যাঁহারা ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে অন্নপূর্ণার শিক্ষায় সাহায্য করিয়াছিলেন, যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এইক্ষণ তাঁহারাই আবার অন্নপূর্ণার উপদেশপ্রদানক্ষমতা ও কঠিন কঠিন জটিলপ্রশ্ন সকলের মিমাংসা তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়া মোহিত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে অন্নপূর্ণার সদ্গুণ ও প্রতীভায় আকৃষ্ট হইয়া সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, এইক্ষণ সেই সকল গুণের সম্যক্ পরিপুষ্টি দেখিয়া সেই স্নেহ ভক্তিতে পরিণত হইতে লাগিল। এই সময় হইতেই অন্নপূর্ণা দেবী ভাবে পরিচিত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে পূজিতা হইতেলাগিলেন। আর শ্রীমন্ত বাবুর আনন্দের পরিসীমা রহিলনা। তিনি বাল্যকালে পঠদ্দশা হইতেই হিন্দুসমাজভুক্ত রমণীগণের শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানোন্নতি করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূদিগকে স্বয়ং শিক্ষাদানে যত্নবান হইয়াছিলেন। প্রতিকুল কতিপয় কারণে তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কিন্তু তাঁহার সাহায্যে তাঁহার ধর্ম্ম অর্থ ও কামের সহায়, ঈশ্বর বলে বলবতী গুণবতী ভার্য্যা যে আদর্শ রমণীর স্থান গ্রহণে সমর্থা হইয়াছেন- ইহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা করিয়া কাহার মনে আনন্দের একশেষ না হয় ?

কুচবেহার বিবাহের কিয়দ্দিন পরে বাবু দেবী প্রসন্ন চৌধুরী মহাশয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় সমভিব্যাহারে বগুড়া আইসেন, এবং অন্নপূর্ণার অতিথি হন। লোকচরিত্র পাঠে চিরদিনই দেবীবাবুর বিলক্ষণ নিপুনতা, তিনি অন্নপূর্ণার সহিত আলাপপ্রলাপে অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহাকে প্রতীভা শালিনী আদর্শস্থানীয়া রমণী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন,—অন্নপূর্ণাকে শিক্ষিত সমাজে পরিচিত করিতে যত্নবান হইলেন। অন্নপূর্ণার নিজের স্বীয়ক্ষমতার উপর তত ভরসা ছিলনা, কিন্তু দেবী বাবুর সাহসে উৎসাহিত হইয়া এই হইতে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দেবী বাবুও ইতিপূর্ব্বে তাঁহার "শরচ্চন্দ্র" পুস্তকে আদর্শরমণীর যে কাল্পনিক (ideal) ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, অন্নপূর্ণার চরিত্রে তাঁহার সমধিক স্ফূরণ দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন। এই বনকুসুমটি সজ্জিত উদ্যানে স্থাপিত হইলেও যে ইহার স্নিগ্ধসৌরভে চাকচিক্যময় উদ্যানকুসুম-গুলিকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইবে ইহা তাঁহার সম্যক উপলব্ধি হইল। তিনি কলিকাতা যাইয়াই তাঁহার পুস্তক বিশেষের উৎসর্গপত্রে আবেগপূর্ণ জলন্ত ভাষায় অন্নপূর্ণাকে বঙ্গীয় শিক্ষিত রমণীসমাজে শীর্ষ স্থান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। অতঃপর কলিকাতাস্থ কতিপয় শিক্ষিতা রমণী দেবী বাবুর উপর এই জন্য খড়্গাহস্তা হইলে যদিও তাঁহাকে অন্নপূর্ণার

সম্বন্ধীয় মন্তব্যের ভাষাগত কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল এবং যদিও সেই পরিবর্ত্তিত আকারেই উক্ত মন্তব্য এই সঙ্গে মুদ্রিত হইতেছে; কিন্তু হৃদয়ের প্রথম আবেগে দেবী বাবু যাহা লিখিয়াছিলেন ও ঘটনায় বাধ্য হইয়া নাম মাত্র যে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন ইহার কোনটি ঠিক দেবী বাবুই তাহা বলিতে পারেন। দেবী বাবুর যত্নেই অন্নপূর্ণা শিক্ষিত সমাজে প্রথম পরিচিতা হন।

এই সময় হইতেই দেবী অন্নপূর্ণার বহির্ম্মুখী বৃত্তিগুলি অন্তর্ম্মুখী হইতে আরম্ভ হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি এই সময় হইতেই বিশেষ ভাবে জীবনে আরম্ভ হয়। অন্নপূর্ণা আত্মার অনন্ত উন্নতি হৃদয়েরসহিত বিশ্বাস করিতেন, মৃত্যুর পর একমাত্র ধর্ম্মই যে অনুগমন করিবে আর সমস্ত শরীরের সহিত নাশ প্রাপ্ত হইবে ইহা বিশেষ ভাবে এই সময় উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী এইক্ষণ জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারনে স্থির প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই সময় হইতেই তিনি তাঁহার স্নেহময়ী কন্যা শ্রীমতী সুশীলার চরিত্র আপনার অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে যত্নপর হইলেন। এই সময় হইতেই তিনি জ্ঞানগর্ভ ধর্ম্মপুস্তক সকল অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ ও তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতিই এই সময় তাঁহার চরম লক্ষ্য, তাই প্রাণপতির সহিত পরামর্শ করিয়া নিজ গৃহে আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এবং এই আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়েই "রামায়ণ ও মহাভারত" হইতে সংকলিত তাঁহার সারগর্ভ প্রবন্ধ গুলি প্রথম পঠিত হয়। অন্নপূর্ণার জীবনে এই সময়ে প্রেম বৃত্তিটির বিশেষ

স্ফুরণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এপ্রেম কোন ব্যক্তি বিশেষে সীমা-বদ্ধ নয় এপ্রেম সার্ব্বভৌমিক, জীবন সর্ব্বস্ব স্বীয় পতিতে কেন্দ্রীভূত হইলেও সর্ব্বথা বিস্তৃত। তিনি বুঝিয়াছিলেন "প্রেমই স্বর্গ, স্বর্গই প্রেম," তাই এই বিশ্বব্যাপিনী প্রেমবৃত্তিটির বিশেষ অনুশীলন করিয়া তিনি এই সময় হইতেই এই ধরাধামে স্বর্গ সুখ উপভোগ করিতে ছিলেন। তাই সন্তান সন্ততিদের উপদেশ স্থলে প্রেম সম্বন্ধে বলিয়া ছিলেন "নিব দিব বিলাইব, পথে ২ ছড়াইব। যে যারে যেথানে পাব হৃদি পূরে দিব সবে"। এই প্রেমের পাত্রাপাত্র ভেদ ছিল না, কি শত্রু কি মিত্র কি ভাল কি মন্দ লোক সকলকেই প্রেম বিতরণে তিনি সমুৎসুকা হইয়া ছিলেন। এই সময় হইতেই তিনি নিজ শরীরের, নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করিতে আরম্ভ করেন। অন্যের পরিচর্য্যাতেই ও নিজ আত্মার পরিচর্য্যাতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত নশ্বর শরীরের উপর যত্ন করিবার আর তাঁহার সময় কোথায়? শ্রীমন্ত বাবু ও অন্যান্য বন্ধুগণ শরীরের উপর যত্ন করিতে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিতেন, সময় ২ এই উদাসীনতার জন্য ভর্ৎসনাও করিতেন কিন্তু তিনি মৃদু হাঁসিয়া নীরবে থাকিতেন কিছু বলিতেন না। কিন্তু পরিবারস্থ অন্যান্য বক্তির স্বাস্থ্যের বিষয় তিনি এরূপ উদাসীন ছিলেন না। শ্রীমন্ত বাবু যখন প্রথম উন্মাদ রোগাক্রান্ত হন, তখন অসম সাহস ও উদ্যমে তিনি তাঁহাকে সুস্থ করিতে কৃতসংকল্পা হইয়াছিলেন। কলিকাতায় যাওয়ার পর যখন শ্রীমন্তকে পাগলা ফাটকে দেওয়ার কথা হয়, অন্নপূর্ণা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন, কারাগারের কঠোর ব্যবহারে তাহার ব্যাধির উপকার না হইয়া বরং অপকারই

হইবে ইহা তাঁহার ধারণা ছিল, তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। শ্রীমন্ত বাবু অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল হইলে তাহাকে লইয়া প্রথম বাটীতে, পরে ঢাকাতে গেলেন। অন্নপূর্ণা নিজেই বলিয়াছেন যে এই সময় শ্রীমন্ত বাবুর ইচ্ছার কোন প্রকার প্রতিকুলাচরণ করেন নাই। শ্রীমন্ত বাবু যখন যাহা বলিয়াছেন অমনি তাহাই করিয়াছেন। সময়ে ২ তাঁহার সহিত পাগল সাজিয়াছেন। শ্রীমন্ত বাবু এক দিন নিবীড় জঙ্গলে লইয়া গেলেন, অন্নপূর্ণা নির্ভয়ে তাঁহার সঙ্গে তথায় গেলেন, শ্রীমন্ত বাবু যাহা করিতে বলিলেন তাহাই করিলেন। ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল তথাপি যে পর্য্যন্ত শ্রীমন্ত বাবুর মত করিতে না পারিলেন ঐ নিবীড় জঙ্গলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরে তাঁহার অটল বিশ্বাস, ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য গুলি নির্দ্দিষ্ট, রাত্রি সমাগমেও তিনি কিছু মাত্র ভয় পাইলেন না; এবং ঈশ্বরানুগ্রহে হিংস্র জন্তুগণ হইতে তাঁহাদের কোন বিপদও হইল না, নিরাপদে পুনরায় তাহারা গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। পতির সহিত এই প্রকার পাগল সাজা ইত্যাদি কার্য্যে পল্লীগ্রামে অনেকের ব্যঙ্গ ও ইঙ্গিত সহ্য করিতে হইয়াছিল কিন্তু অন্নপূর্ণা তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া দাসীর ন্যায় নিজ বিবেকের অনুসরন করিতে লাগিলেন। চিকিৎসার জন্য শ্রীমন্ত বাবুকে পাগলা ফাটকে পাঠাইতে না দিয়া অন্নপূর্ণাই শ্রীমন্ত বাবুকে আরোগ্য হইতে দিলেন না ইত্যাদি দোষারোপ ও যথেষ্ট হইয়াছিল কিন্তু পরিশেষে অন্নপূর্ণারই জয় হইল। 'প্রাণ পতির ইচ্ছার প্রতিরোধ না জন্মান ও তাহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাই প্রধান চিকিৎসা' এই বিবেক বাণী সতত তাঁহার অন্তরে

জাগরুক ছিল, আর কেবল আকুল অন্তরে প্রতিনিয়ত পতির আরোগ্য কামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তিনি প্রার্থনার মুল্য বুঝিতেন; কি প্রকারে প্রার্থনা করিতে হয়জানিতেন; তাই ঈশ্বরের চরণতলে তাঁহার প্রার্থনা পৌছিল ও ভক্তের ভগবান ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করিলেন। শ্রীমন্ত বাবুকে সে যাত্রায় আরোগ্য করিয়া লইয়া অন্নপূর্ণা পুনরায় বগুড়ায় পৌছিলেন।

অন্নপূর্ণা আপনার চরিত্রের অনুরূপ করিয়া আপন কন্যা শ্রীমতি সুশীলার চরিত্র সংগঠন করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন, এবং ইহাতে তিনি যথেষ্ট কৃতকার্য্যও হইয়া ছিলেন। সুশীলাও নিজ জননীর আদর্শেই নিজ চরিত্র গঠন করিতে আরম্ভ করিল মাতার অনুরূপা হইবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হইল। জননীর নিকট গৃহ কার্য্য, শিল্প, রন্ধনাদি সমুদায় ও সংযম শিক্ষা করিলেন। এই ক্ষণ গৃহকার্য্য সমস্তই সুশীলার হস্তে। অন্নপূর্ণাও সুশীলার শিক্ষার জন্য নিজের তত্বাবধানে সুশীলা দ্বারাই সকল করাইয়া লইতেন। বাল্যকালে ব্যায়ামাদি না করায় তাঁহার শারীরিক পেশী সমূহ দৃঢ় ছিল না তাই তিনি সুশীলার জন্য ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করিলেন এবং বাড়ীতেই ব্যায়াম করাইতে আরম্ভ করিলেন। পতি পত্নীর সম্বন্ধ সুশীলাকে এই সময়েই বুঝাইয়া ছিলেন। ফলকথা সুশীলার সার্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা যাহাতে সুচারু রূপে হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। সুশীলা অন্নপূর্ণার একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ। সুশীলাতে অন্নপূর্ণার প্রতিকৃতি অনেকটা উপলব্ধি হয়।

পতির উন্মাদ অবস্থায় ঢাকা অবস্থান কালীন বাবু বরদা কান্ত বসুর সহিত অন্নপূর্ণাপরিবারের বিশেষ পরিচয় হয়। বরদা বাবু সতত অন্নপূর্ণার গৃহে যাইতেন এবং এই দুঃসময়ে

যথা সাধ্য তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। বরদা বাবুর ব্যবহারে অন্নপূর্ণা এই যাত্রায় বড়ই পরিতুষ্ট হইয়া ছিলেন। অন্নপূর্ণার প্রাণাধিকা তনয়া শ্রীমতি সুশীলার সহিত বরদা বাবুর প্রণয়ের প্রথম অঙ্কুর এই সময়েই উৎপত্তি হয়। অন্নপূর্ণা প্রথমেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া ছিলেন। তিনি স্বতঃপরতঃ বরদা বাবুর গত জীবন ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া বরদা বাবুকেই সুশীলার অনুরূপ বর মনোনীত করিলেন। সুশীলারও এই বিবাহে মত আছে বুঝিতে পারিয়া তিনিও অনুমোদন করিলেন। বগুড়া আইসার পরও সুশীলার সহিত বরদা বাবুর চিঠি পত্র চলিতে আরম্ভ করিল। শ্রীমন্ত বাবু সুস্থ হওয়া মাত্রই অন্নপূর্ণা শ্রীমন্ত বাবুকে সমস্ত জ্ঞাত করিলেন। শ্রীমন্ত বাবু কিন্তু পুরুষ চরিত্রের কঠিন সমালোচক! বরদা বাবুকে তিনি পূর্ব্ব হইতেই কথকটা জানিতেন তাঁহাকে একরূপ ভাল ব্রাহ্ম বলিয়াও তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। তথাপি তিনি বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া একেবারে সম্মতি দিতে পারিলেন না; বাধাও দিলেন না। বরদা বাবুর পত্র গুলি পূর্ব্বে পড়িয়া কোন্ পত্রের কি প্রকার উত্তর দিতে হইবে তাহা সুশীলাকে বলিয়া দিতে অন্নপূর্ণাকে উপদেশ করিলেন। অন্নপূর্ণার কথাটা যেন কিছু অসহ্য হইল। সুশীলাকে তিনি কি প্রকারে গঠন করিয়াছেন শ্রীমন্ত বাবু এখনও তাহা সম্যক পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই বলিয়া যেন কিছু ক্ষোভ হইল। তিনি সক্ষোভে ও সাহঙ্কারে উত্তর করিলেন "এসকল বিষয় আমা হইতেও সুশীলা ভাল বোঝে," "তাহার স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই"। যাহা হউক সুশীলা তথাপি সমস্ত

উত্তর প্রত্যুত্তর গুলি জননীকে দেখাইতেন ও জননীর উপদেশা-নুবর্ত্তিনী হইয়া সমস্ত পত্রের উত্তর দিতেন। এই প্রকারে বিবাহের কথাবার্ত্তা যখন প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে তখন এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। এদিকে বরদা বাবুর ভ্রাতা ও জননী ওদিকে শ্রীমন্ত বাবুর সহোদরগণ এই বিবাহের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন এবং যাহাতে এই বিবাহ না হইতে পারে তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বরদা বাবু ঢাকা হইতে তাঁহার জননী ও সহোদরের নিকট নোয়াখালীতে নীত হইলেন এবং এই বিবাহ হইতে বিরত হইতে নানা প্রকারে প্ররোচিত ও অনুরুদ্ধ হইলেন। হিন্দুমতে লাভ-জনক ভাল ভাল সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, মাতা আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন ভ্রাতারাও সানুনয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বরদা বাবু মহা ফাঁপরে পড়িলেন। এই সময় বরদা বাবুর নিকট হইতে, সুশীলার নিকট এক মর্ম্মভেদী পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। যত দূর স্মরণ আছে তাহার মর্ম্ম এই:—যদি বরদা বাবুর সহিত সুশীলার বিবাহ না হয় ও বরদা বাবু অন্য স্ত্রীতে পরিণীতও হন তথাপি সুশীলা তাঁহাকে (বরদা বাবুকে) চিরদিন পতিভাবে ভাবিতে পারিবে কি না? এই পত্রের উত্তর বরদা বাবু সত্বর চান। এইটী সুশীলার জীবনের বিষম পরীক্ষা। কিন্তু সুশীলা অন্নপূর্ণার কন্যা, অন্নপূর্ণার পদানু-সরণে কৃতসংকল্পা। আত্মায় ২ মিলন হইয়াছে, মনে ২ বরদা বাবুকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল, বরদা বাবুর পক্ষে সম্ভব হই-লেও, এতদূর অগ্রসর হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাই মাতার অনুমোদন ক্রমে পত্রোত্তর লিখিলেন "বরদা বাবুর সহিত বিবাহ না হইলেও চিরকাল তাঁহাকে স্বামী

ভাবে ভাবিতে পারিবে অন্যকে পতিত্বে বরণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব"। অন্নপূর্ণার এই সময় হইতেই শরীর ভগ্ন হইয়া যায়, তাঁহার জীবন সম্বন্ধে এই সময় হইতেই হতাশ হন। জীবিতাবস্থায় সুশীলাকে পাত্রস্থা করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু সুশীলার বীরত্ব পূর্ণ উত্তরে সন্তুষ্টা হইলেন। কিন্তু সুশীলা এই প্রতিজ্ঞা স্থির রাখিতে পারিবে কিনা,—এই চিন্তায় জর্জরিত হইলেন। এই হইতে সুশীলাকে বিশেষ ভাবে ঈশ্বরে আত্মা সমর্পন বিষয় উপদেশ দিতে লাগিলেন। বোধ হয় সুশীলা সম্বন্ধে মাতার এই শেষ উপদেশ।

অন্নপূর্ণা পূর্ব্ব হইতেই পীড়িতা ছিলেন, এই ঘটনার সময় হইতে তাঁহার শরীর ভঙ্গ হইল। এ যাত্রায় রক্ষা পাইবেন না তিনিও শ্রীমন্ত বাবু উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীমন্ত বাবু অন্নপূর্ণাকে দার্জিলিং যাইবার প্রস্তাব করিলেন, অন্নপূর্ণা শ্রীমন্ত বাবুকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। মৃত্যু সন্নিকট জানিয়াও অন্নপূর্ণা কিছুমাত্র ভীত হন নাই, এ সময়েও তাঁহার শান্তিপূর্ণ প্রসন্ন মুখ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। এ সময়েও তিনি বৈশাখ মাসের উৎসবে রীতিমত যোগদান ও প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। কোন বিষয়েই যেন তাঁহার এইক্ষণ আশক্তি নাই। ঈশ্বরে আত্ম সমর্পন ভাব এইক্ষণ তাঁহাতে সম্যক পরিস্ফুটিত। কেবল প্রাণাধিকা কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে পরিনীতা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না এই একমাত্র আক্ষেপ। তাই বিষণ্ণ মনে প্রাণাধিকা কন্যাকে নিকটে লইয়া ঈশ্বরে সর্ব্বথা প্রকারে আত্মসমর্পনের উপদেশ দিলেন। এই সময় এই শঙ্কট সময় শ্রীমন্ত বাবু আবার উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া

অন্নপূর্ণাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করেন। অন্নপূর্ণার তাহাতে কিছু মাত্র ভ্রূক্ষেপ বা বিরক্তি নাই বরং এই শয্যাগতাবস্থায়ও যাহাতে শ্রীমন্ত বাবুর রীতিমত শুশ্রূষা হয় তজ্জন্য শ্রীমতী সুশীলা ও বন্ধু বান্ধবগণকে অনুরোধ করিতেন, ও শ্রীমন্ত বাবুর ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ না করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে সকলকে অনুরোধ করিতেন। এই সময় এই নিরাশার সময় শ্রীমন্ত বাবুর অভিপ্রায় অনুসারে আমি তাঁহাকে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা আরম্ভ করি। ইতি মধ্যে শ্রীমন্ত বাবু হঠাৎ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া মাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে ধুমধাম করায় মাজিষ্ট্রেটের আদেশে কারারুদ্ধ হন, অন্নপূর্ণাও তৎ সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধ খাওয়া পরিত্যাগ করিলেন। পরদিন পুত্র সুধীর চন্দ্র দ্বারায় খাওয়ার জিনিস পত্র জেলে পাঠাইয়া দিলেন এবং কি ঔষধ খাইবেন শ্রীমন্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। শ্রীমন্ত বাবু জেল হইতে "অভয়া লবণ" ব্যবস্থা করিলেন অমনি নিরাপত্যে ঐ অভয়া লবণই খাইতে লাগিলেন। ইহার কয়েক দিন পরই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বদিন বন্ধুবান্ধবগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া শ্রীমন্ত বাবুকে জামিনে খালাস করিয়া আনিলেন এবং জীবন সর্ব্বস্ব প্রাণ পতির মুখ দেখিতে দেখিতে পরলোক গমন করিলেন।

অন্নপূর্ণার সমস্ত বৃত্তিগুলির সার্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি ও সমান ভাবে অনুশীলন হয় নাই বলিয়া অনুশীলন বাদীরা তাঁহাকে হয়ত দোষী করিবেন। তিনি এতগুণের আধার হইয়া ও যে স্বীয় হস্তে দাস দাসীর ও পাচিকার কার্য্য করিয়া হস্তকে কলঙ্কিত করিতেন, সভ্যজনোচিত বেশভুষা ও বিলাস সামগ্রীর

আদর করিতেন না, এই বলিয়া হয়ত উনবিংশতি শতাব্দির সভ্যতাভিমানিনী কেহ কেহ তাঁহাকে অসভ্যা বলিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। আবার যাঁহারা গোঁড়া হিন্দু,—তাঁহারা হয়ত অন্নপূর্ণা ব্রাহ্মণকন্যা হইয়া যবনান্ন গ্রহণ করিয়াছেন, সধবা হইয়া অলঙ্কারাদি পরিধান করেন নাই, বঙ্গিয় কুলবধু হইয়া অবাধে পুরুষের সহিত আলাপ ও সভা সমিতিতে বক্তৃতা পাঠ করিতেন এই কথা শুনিয়া ঘৃণা সহকারে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবেন। ইহার প্রত্যুত্তরে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে শারীরিক ও মানসিক সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূরণ একাধারে এক প্রকার অসম্ভব। এবং ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত কিনা ইহাও সন্দেহ স্থল। চন্দ্রে সূর্য্যের ন্যায় উত্তাপ নাই বলিয়া চন্দ্রের নিন্দা, আবার সূর্য্যে চন্দ্রের স্নিগ্ধতা নাই বলিয়া সূর্য্যের নিন্দা যাহারা করিতে পারেন, অন্নপূর্ণাও তাঁহাদের নিন্দার্হ হইবেন আশ্চর্য্য কি? আর অন্নপূর্ণা বিলাসে উদাসীন ছিলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার অপকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া কেহ যদি তাঁহাকে অসভ্যা বলিয়া গালিদেন দিন, উপায় কি? তবে প্রত্যুত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে পশ্চিম সভ্যতা স্রোত রাজধানীতেই আবদ্ধ থাকুক পল্লীগ্রামে ও ক্ষুদ্র সহর গুলিতে যেন সংক্রমিত না হয়, এবং সভ্যতার অসভ্যতায় যেন পল্লী জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ্য আর নষ্ট না করে ইহাই আমরা প্রার্থনা করি। আর গোঁড়া হিন্দু মহাশয়দিগকে বলি যে অন্নপূর্ণা যবনান্ন গ্রহণ করিলেও তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণী ছিলেন। প্রকাশ্যে সকলের সহিত আলাপ করাতেও তাঁহার শীলতা সম্যক অক্ষুন্নই ছিল। প্রচলিত আচারভ্রষ্টা হইলেও তিনি "স্ত্রী" নামের

স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি পুরাকালের আর্য্য রমণীদের পদানুসরণ করিয়া আপন চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন এবং ইহাতে অনেকদুর কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

অন্নপূর্ণা শারীরিক পাপ হইতে মানসিক পাপকে অধিক ভয়াবহ মনে করিতেন। মনে মনে পাপবৃত্তি পোষণ করা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করায় তিনি বড় প্রভেদ দেখিতেন না। বরং এইজন্য প্রলোভনে পতিতা পাপ-পথগামিনী দিগের অপেক্ষা ক্রুরমতি মন্দবুদ্ধি কুটিলতা পরায়ণ লোকদিগের স্বর্গদ্বার অধিক দূর ইহা তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি এই প্রকার পতিতা দুই একটী রমণীকে ভাল করার জন্য আশ্রয় প্রদানও করিয়াছিলেন। তিনি কখনও পাপীকে ঘৃণা করিতেন না, বরং দয়ার ভাবে যাহাতে তাহাদিগকে পাপ পথ হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিতে পারেন, তাহার পতিত জীবন কর্ত্তব্য পথে উন্নীত করিতে পারেন তাহার পরামর্শ দিতেন।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তবে কি অন্নপূর্ণা দোষ শূন্যাছিল? আমরা তাহা বলি না। অন্নপূর্ণা অপূর্ণা, দোষ শূন্যা কি প্রকারে হইবেন? তবে সে সকল অকিঞ্চিৎকর। আমরা তাঁহাদের প্রত্যুত্তরে স্বভাব কবির ভাষায় এইমাত্র বলি যে "একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।" অন্নপূর্ণা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও ভক্তিভাবে আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি, কারণ আমরা জানি "গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।"

শ্রীনৃত্য গোপাল সান্যাল।

সোপানের উৎসর্গ।

শ্রদ্ধেয়া ভগ্নি,

আপনি আমার যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা প্রকাশ করিবার আমার আর কোন উপায় নাই। আপনার মানসিক সৌন্দর্য্যের নিকট আমি আত্ম বিক্রয় করিয়াছি। আপনার প্রতিভা, আপনার প্রখর বুদ্ধি, আপনার সুতীক্ষ বিবেচনা শক্তি, আপনার জ্ঞান ও শিক্ষা, আপনার অহ-ঙ্কার শূন্য আত্মাকে এই খলতাময় সংসারে এক অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছে। আমাদিগের দেশের যে সকল মহিলাগণ শিক্ষিতাহইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংসারের পুতিগন্ধ যুক্ত অহঙ্কারের নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়া উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন। সেই সকল মহিলা-গণের আচরণে আমি সর্ব্বদাই হৃদয়ে আঘাত পাইয়া থাকি; কিন্তু যখন আপনার বিনয়াবনত ও শান্ত মূর্ত্তি স্মরণ পড়ে, তখন এদেশকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করি। এই বঙ্গদেশের রমণী-গণের মধ্যে আপনাকে সৃষ্টির এক আশ্চর্য্য রচণা বলিয়া বুঝি-য়াছি সংসার আপনাকে জানুক বা না জানুক, আপনার অস্তিত্বে এদেশের গৌরব শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে হইবে; এই বলিতে পারি আমি আপনার হৃদয়কে ভাল বাসি আপনার প্রতিভাকে পুজা করি, আপনার বুদ্ধি ও বিবে-চনা শক্তির সম্মান করি, আর আপনার পবিত্র আত্মাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। কিন্তু এ সকল প্রকাশ করিবার আর কোন উপায় নাই; আমি দরিদ্র, মূর্খ, জ্ঞান হীন, বুদ্ধি হীন। পৃথিবীতে

যে ধনের কাঙ্গাল আমি, সে ধন আমার মিলিল না; ঈশ্বরকে জানিলাম না, ধর্ম্মকে বুঝিলাম না। আর কি বলিব, যাহা আমার শিক্ষা করা উচিত ছিল, এই ক্ষণ স্থায়ী জীবনে তাহার কিছুই হইল না, অগাধ সলিলে ডুবিয়া কূল কিনারা কিছুই পাই না। ভগ্নি সম দুঃখিনী আপনি, তাই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমার এ উপহার কেবল অভাব প্রকাশক মনে, করিবেন কিন্তু হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশক নহে। কি করিব ইহাই গ্রহণ করুণ। সোপান প্রথমস্তর আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম।

কলিকাতা—পটলডাঙ্গা
কার্ত্তিক ১২৮৬।

আপনার এক মাত্র স্নেহ ভিখারী
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী
শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা
২১০। ৪ নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট

অন্নপূর্ণার রচিত প্রবন্ধাবলী।

পাঠক মহোদয়গণ ও পাঠিকামহোদয়াগণের নিকট এইক্ষণ অন্নপূর্ণার রচিত প্রবন্ধগুলি ক্রমান্বয়ে উপস্থিত করিতেছি ইহাতে বুঝিতে পারিবেন, অন্নপূর্ণার মানসিক শক্তি কিরূপছিল, তিনি অন্তরে পরম দেবতাকে কিরূপ প্রীতি করিতেন, তিনি যে জীবনের সকল ভার ব্রহ্মে সমর্পন করিয়া কেবল জীবন রক্ষার জন্য সংসার করিতেন। সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র আশক্তি ছিল না তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বন্ধুগণের মন্তব্যে জানিতে পারিয়াছেন, যে যিনি লিখুন কেহ তাহার সম্বন্ধে অতিরিক্ত কিছু লিখেন নাই, বরং তাহার ব্রহ্মজ্ঞান সকলে পরিস্ফুট করিয়া

লিখিতে পারেন নাই, তবে যত গুলি লোকে তাহার জীবন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিয়াছেন, তাহাদের লেখনি ও কিছু কিছু করিয়া গুণ কীর্ত্তন করিয়াছে মূলে সকলের সুন্দর ঐক্যতা হইয়াছে কেহ কাহাকে লিখিতে দেখেন নাই অথচ নানা প্রকার ভাব শ্রোতের মধ্য দিয়া সকলই এক স্থানে মিলিয়াছেন। এত গুলি বন্ধু বান্ধব আজ তাহার জীবনী অল্প অল্প করিয়া লিখিলেও তাহাতে এক খানা ক্ষুদ্র জীবনী হইয়া পড়িয়াছে পাঠকগণ তাহর স্ব রচিত প্রবন্ধাবলী মনযোগ সহকারে পাঠ করিলে তাহার জীবন বুঝিতে প্যারিবেন, এবং তাহার লিখিত ভাষাও যে সুখদ তাহা বুঝিতে পারিবেন। তিনি একবার যে লিখিয়াদিতেন, দ্বিতীয়বার তাহা সংশোধন করিতেন না কাহারও কিছুমাত্র সাহায্য নিতেন না, কেহ তাহার প্রবন্ধ সংশোধন করেনাই তিনিই অনেকের প্রবন্ধ সংশোধন করিতেন। তাহার প্রবন্ধ পাঠ শেষ করিলে গ্রন্থকার তাহার শিক্ষা, ধর্ম্ম, ব্যবহার এবং প্রত্যেক সৎপ্রবৃত্তির প্রকৃতি কিরূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে দেখাইতে চেষ্টা করিবেন।

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

আজ কি আনন্দের দিন! এই এক বৎসরকাল আমরা যে দিনের আশায় ছিলাম, আজ সেই দিন উপস্থিত। আজ সংসারের কুটিলতা মলিনতা, কোথায়? পাপ, তাপ দুঃখ, যন্ত্রণা সকলি পলায়ন করিয়াছে, সকল হৃদয়ই অনির্ব্বচনীয় আনন্দে সন্তরণ করিতেছে; এই ক্ষুদ্রবাড়ীটী আজি আনন্দময়,—সকলি যেন স্বর্গীয়ভাবে পরিপূরিত। এই মধ্যাহ্ন গগণ কাহার মহিমা প্রচার করিতেছে? এই প্রচণ্ড তপন কাহার আদেশে জগতের

অন্ধকার হরণ করিয়া মনুষ্যদিগকে অপার আনন্দ প্রদান করিল? কি বৃক্ষ-লতা, কি ফল পুষ্প, কি পশু পক্ষী, কি সজীব জগৎ, কি নির্জীব জগৎ সকলেই আজ সমভাবে সেই স্রষ্টারই জয় ঘোষণা করিতেছে; আজ প্রকৃতি সরল রমণীয়সাজে আমাদের নিকট উপস্থিত।

কেন এই নূতন দৃশ্য? সেই পৃথিবী, সেই সংসার, সেই সুনীল অনন্ত আকাশ এবং আমাদের সেই চক্ষু, আমরাও সেই মনুষ্য, সকলইত সেই পুরাতন। সেই বৃক্ষ সেইরূপ ফলফুলে পরিশোভিত; কিন্তু পূর্ব্বে যেন ইহার কিছুই ছিল না, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আজ নূতনত্ব লক্ষিত হইতেছে, সকলের মধ্যেই সেই অনন্তদেবের হস্তচিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি আজ অপূর্ব্ব! যে দিকে যাহার প্রতি দৃষ্টি করি সকলি পূর্ণ, সকলি সরল মাধুর্য্যময়! চতুর্দ্দিকে কেবল জয়, ব্রহ্মের জয়, জয় ব্রহ্মের জয় প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আমাদের সহিত হৃদয় মিলাইয়া সকলেই সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলগানে ব্যস্ত। আজ এ সংসারের মধ্যে স্বর্গীয় ছায়া পড়িয়াছে, সকল প্রকার সাংসারিক মলিনতা যেন চলিয়া গিয়াছে, সকলের মধ্য দিয়াই পবিত্র প্রখর জ্যোতি বহির্গত হইতেছে। সকলেই, ভাবভঙ্গী আকার ইঙ্গিত ও কার্য্যকলাপ দ্বারা জীবনের জীবন পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া দিতেছে। এই যে ভ্রাতা ভগিনীগণ কাতরহৃদয়ে, তৃষিতপ্রাণে, সেই জগৎ পিতা পরিত্রাতাকে সমস্বরে ডাকিতেছেন, ইহার দৃশ্য কি স্বর্গীয়! এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে কথনও কি এ চিত্রসম্ভবে? আহা! সে দিন কত সুখের হইবে যে দিন পৃথিবীর যে স্থানে গমন কর না কেন সর্ব্বত্রই এই চিত্র

শোভা পাইতেছে দেখিবে। কোথাও এমন স্থান থাকিবে না যেখানে এই স্বর্গীয়চিত্র দেখিতে পাইবে না। তখন দেখিবে সমস্ত জগৎ সংসারই এক পিতার সংসারে পরিণত হইয়াছে এবং সকল ভ্রাতা ভগিনী একমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এক পিতার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক একতানে তাঁহারি আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছে। আহা! সে দিনের কথা স্মরণেও কত সুখ, কত আনন্দ! হৃদয় আনন্দে একেবারে আপ্লুত হইয়া যায়, না জানি সে দিন উপস্থিত হইলে কি অভাবনীয় অপূর্ব্ব আনন্দ স্রোতেই সংসারে প্রবাহিত হইবে, যাহা এক্ষণে শত সহস্র চেষ্টায়ও আমরা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি না। ঈশ্বর এমন দিন শীঘ্রই আমাদিগকে দিন, এই অন্তরের বাসনা। করুণাময়ের করুণা বলে কত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া আবার বৎসরান্তে যে এই উৎসবে সকল ভ্রাতা ভগিনী একত্রিত হইলাম ইহা সামান্য সুখের বিষয় নহে। কে জানিত আজ এইভাবে আবার সকলে একত্রিত হইয়া উৎসবানন্দ ভোগ করিতে পারিব? এই উৎসব কি কেবল পিতার কৃপায় নহে? তবে আসুন, ভ্রাতৃগণ! যাঁহার কৃপাবলে বৎসরান্তে এই উৎসবে আবার সকলে একত্রিত হইলাম, এবং যাঁহার পবিত্র জলন্ত ভাব এই উৎসব মধ্যে দেখিতে পাইয়া জীবন কৃতার্থ করিতে সক্ষম হইলাম, তাঁহাকে বিনীত ভাবে সকলে প্রণাম করি এবং হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ভক্তি উপহার তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া জীবনকে সার্থক করি। হে দয়াময় পিতঃ! তোমাকে কি বলিব? আমাদের হৃদয়ের ভাব জানিয়া পূজা গ্রহণ কর, এই হৃদয়ের নিতান্ত বাসনা।

ভ্রাতৃগণ! আজ যাঁহাকে পাইব বলিয়া এত আনন্দ এত আহ্লাদ, এত উৎসব, তিনি কোথায়? তিনি কি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আছেন? না বিশেষ বিশেষ উৎসবে বিশেষ বিশেষ স্থলে যাইয়া থাকেন? এই বিশেষ উৎসবের জন্য কি তিনি বিশেষ ভাবে আজ উপস্থিত হইয়াছেন? না তাহা নহে। তবে আমরা যে আজ বিশেষ ভাব দেখিতেছি তাহা আমাদেরই জন্য। আমরা জীবনের অধিক সময়ই তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকি, যতটুকু সময় তাঁহাতে অবস্থিতি করি সেই সময়টুকু মাত্র এই আনন্দ লাভ করিতে পারি এবং সেই সময় টুক কেবল এই জগৎ আরামের স্থান, শান্তির আলয় বলিয়া বুঝিতে পারি; যদি আমরা কোন সময়ের জন্যও তাঁহাকে না ছাড়ি তবে সমস্ত জীবনই এই উৎসব ভোগ করিতে সক্ষম হই। তিনি সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত পুরুষ, তিনি অসীম, অপার ও অগম্য। তাঁহার বিকার নাই, কোন স্থানে আবির্ভাব, কোন স্থানে তিরোধান নাই। তিনি সর্ব্বত্র সমানরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার দেশ-কাল পাত্রাপাত্র ভেদ নাই প্রীতিতেও আসেন না, নিন্দাতেও যান না। যে সরল প্রাণে ডাকে, সেই তাঁহাকে হৃদয়ে দেখিতে পায়, ঈশ্বর ও মনুষ্য ইহার মধ্যে কোন আবরণ নাই, কেবল পাপই ঈশ্বর হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে। তিনি শুদ্ধম্ এবং অপাপবিদ্ধম্। পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যেখানে পাপ, যেখানে অন্যায়, যেখানে সংসারের কুটিলতা-মলিনতা, সেখানেই অন্ধকার, সেখানেই বিভীষিকাময় নরক কুণ্ড। যাই পাপ আসিল, অমনি ঈশ্বর তথা হইতে

চলিয়া গেলেন। যেমন আলোর নিকট অন্ধকার থাকিতে পারে না, সেইরূপ ঈশ্বরের নিকটও পাপ থাকিতে পারেনা। আমরা তাঁহাতে যতক্ষণ অবস্থিতি করি, ততক্ষণই কেবল কষ্ট যন্ত্রনা অভাবাদি জানিতে পারি না। যাই তাঁহাকে ভুলিয়া সংসারে প্রবেশ করিলাম অমনি সংসার শত বিষধর হইয়া আমাদিগকে দংশন করিল, তখন বিষের যাতনায় প্রাণ ছট ফট করিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি পাপ ছাড়িতে পারিলাম না। এই দুঃখসাগরে মগ্ন হইলাম, সে অন্ধকারের মধ্যেই ভাসিতে লাগিলাম ক্রমে, গভীর হইতে গভীরতম নরককুণ্ডে পতিত হইলাম, যন্ত্রাণায় যখন প্রাণ যায় যায় হইল, তখন কাতর প্রাণে বলিলাম পিতঃ। কেন আমাকে ছাড়িলে? তুমি কাহাকেও কখন পরিত্যাগ কর না, তবে আমার এই যন্ত্রণা দেখিয়াও কেন দেখিতেছ না? কিন্তু তথাপি আমাদের ভ্রম ঘুচিল না! একবার ভাবিলাম না যে, তিনি আমাকে ছাড়েন নাই, আমরাই তাঁহাকে ছাড়িয়া দুঃখসাগরে ডুবিয়াছি। তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ কাহাকেও অনুগ্রহ করেন না, এক ন্যায় বিচারে সকলকে দেখিয়া থাকেন। আমরা নিজের প্রাণ নিজে নষ্ট করিতেছি, নিজের যন্ত্রণা নিজে বাড়াইতেছি, অবস্থায় পড়িয়াও তাহা বুঝিলাম না। আত্মহত্যা আর কাহাকে বলে? প্রকৃত জীবন হত্যা করিয়া পার্থিব জীবনের জন্যইকি এত ভয়? 'আত্মহত্যা মহা পাপ' এই মহাবাক্য যে দেশের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জাতে মজ্জাতে নিরুদ্ধ আছে, পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে, সে দেশে এই শোচনীয় আত্মহত্যা দেখিলে কোন

হৃদয় না হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠে? আজ এই ভারত খুঁজিয়া দেখ এমন এক জন পাইবে না, যিনি আত্মহত্যা মহাপাপে লিপ্ত নহেন। যে ভূমি একদিন ধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যভাণ্ডার বলিয়া গর্ব্বিত ছিল, আজ সেই স্বর্ণভূমি ধর্ম্ম জীবন হারাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে! এই ২০ কোটী জীবনহীন প্রাণী দ্বারা কি ভীষণ অন্ধকারই সৃষ্টি হইয়াছে, দেখিলেই হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। যদি প্রকৃত জীবন নষ্ট করিয়া চির দিন অন্ধকারেই থাকিলাম, তবে দুঃখপূর্ণ এই পার্থিব জীবন রাখিয়া কি করিব? এখন যতশীঘ্র এই অন্তঃসার বিহীন জীবন বিনষ্টহয়, ততই মঙ্গল; আর এ অন্ধকারের ভীষণমূর্ত্তি দেখাযায়না।

ভ্রান্ত মন! আর কত কাল সেই হৃদয়েশ্বর জীবন সখাকে ভুলিয়া এই ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিবে? এখনও কি তোমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না? ইচ্ছা করিলেই স্বর্গরাজ্যে যাইতে পার। ইচ্ছা করিয়া কে কোথায় নরকে ডুবিয়া থাকে? কিন্তু তুমি এতই ভ্রান্ত ও মোহাচ্ছন্ন হইয়াছ যে, আনন্দের সহিত পাপকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া জীবন নরকময় করিয়া তুলিয়াছ। স্বর্গ আর নরক কাহাকে বলে? তোমার হৃদয়েই স্বর্গ, আবার অবস্থা বিশেষে ঐ হৃদয়েই নরককুণ্ড, অসংখ্য পাপকীটের আবাস স্থান! যদি সুখী হইতে চাও, স্বর্গরাজ্য দেখিতে চাও, আপনার হৃদয় নির্ম্মল কর, পবিত্র কর। হৃদয় মন পরিষ্কৃত না হইলে ব্রহ্মের পূর্ণ স্বরূপ দর্শন হয় না। তোমাতে যে পরিমাণে পাপ থাকিবে তুমি ঈশ্বর হইতে সেই পরিমাণে দূরে থাকিবে। অতএব অগ্রে হৃদয় মন পবিত্র কর, আত্মাকে বিশুদ্ধ কর, মনকে এরূপ নির্ম্মলকরা চাই যাহাতে সর্ব্বদাই তোমার ব্রহ্ম-

দর্শন ঘটিতে পারে। এক বিন্দু পাপ সত্বেও পূর্ণ দর্শন ঘটিতে পারে না, ইহা বুঝিয়া সাধনা কর। যদি সমস্ত পাপ উন্মূলিত করিতে পার, মঙ্গলময়ের মূর্ত্তি হৃদয় মন্দিরে স্থাপন করিতে পার, তবেই দেখিতে পাইবে তোমার জীবন কি উৎসবময়! তখন দেখিবে এই পৃথিবীই আবার কি সুখের স্থান! সুখ শান্তি সকলি ইহাতে রহিয়াছে, বিভীষিকা কষ্ট যন্ত্রনা আর কিছুই নাই। যে উৎসবানন্দ আজ এত চেষ্টায় লাভ করিতেছ, তখন দেখিবে সদা সর্ব্বদা তোমার অন্তরে বাহিরে অবিশ্রান্ত আনন্দস্রোত খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে।

বাস্তবিক মনুষ্য ধর্ম্মেতে অনুপ্রাণিত না হইতে পারিলে, ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিলে, আর শান্তি নাই। ঈশ্বরই মনুষ্যের একমাত্র লক্ষ্য, ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন, এই ধর্ম্মই সমস্ত নর নারীকে এক সমভূমিতে আনয়ন করে। ধর্ম্মেতে কোন প্রকার পার্থক্য নাই, ধর্ম্ম জাতি বিশেষে, দেশ বিশেষে কি সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ নহে, সমুদায় মনুষ্য জাতির এক ধর্ম্ম, এক মানবজাতির বিভিন্ন ধর্ম্ম কখনই হইতে পারে না। অথচ এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকার ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, এক একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় একত্রিত হইয়া আবার এক একটী ক্ষুদ্র সমাজের অবতারণা করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই লক্ষ্য এক ঈশ্বর। এই এক লক্ষ্য থাকিয়াও যে এত বিভিন্নতা তাহার কারণ কেবল প্রকৃত ধর্ম্ম না বুঝা। ধর্ম্ম কতকগুলি অসংখ্য কুসংস্কারে বদ্ধ হইয়াই আমরা এত বিভিন্নতার সৃষ্টি করিয়াছি। যে দিন সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দিনই ধর্ম্মের যথার্থ উদারতার সঙ্কোচ ভাব আসিয়াছে, এবং

সেই দিন হইতেই কতকগুলি অধর্ম্মভাব সমাজে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মের ভাব শিথিল করিয়া দিয়াছে, ও মনুষ্যদিগকে কুসংস্কার রূপ অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন জ্ঞান সকলি সেখানে বিলুপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম মনুষ্য রচিত নহে, ধর্ম্মের স্রষ্টা স্বয়ং ঈশ্বর, যাহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম তাহাই মানবের ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই ব্রহ্ম দর্শন লাভ দ্বারা জীবন পবিত্র হয়। যে পবিত্র উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সমুদায় জগৎ সংসারে পরিব্যাপ্ত। ইহা গ্রন্থ বিশেষে কি মনুষ্য বিশেষে বদ্ধ নহে, এই সমস্ত সৌর জগতৎ তাহার গ্রন্থ, ইহার মধ্যস্থিত সমুদায় পদার্থই তাহার বর্ণমালা। এই বর্ণমালা অধ্যয়ন করিতে পারিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। আপন হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে জ্ঞাননেত্রে খুঁজিয়া লও, সাধুর হৃদয় অন্বেষণ কর তাঁহার পবিত্র ছায়া দেখিয়া মোহিত হইবে, ধর্ম্ম কি জানিতে পারিবে।

এই জগতের প্রত্যেক বস্তুতে, এ জগতের প্রত্যেক কার্য্যেতে তাঁহার অপার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। সমুদায় জগৎসংসারেই তিনি ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন। তাঁহার জন্য দূরে যাইতে হয় না, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে রহিয়াছেন। অথচ শুষ্ক প্রাণে খুঁজিলে কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। সরল হৃদয়ে কাতর প্রাণে ডাকিয়া দেখ, অবশ্যই তিনি অন্তরে দেখা দিবেন। হে করুণাময় পিতঃ! আমাদের এই কপট হৃদয় কি সরল হইবে না? চিরজীবনই কি এইরূপ কপটভাবে আঁধারে থাকিব? আমরা ব্যাকুল অন্তরে কাতর-

প্রাণে ডাকিয়া কি এই তাপিত প্রাণ শীতল করিতে সক্ষম হইব? হে হৃদয়দর্শী পিতঃ! যত দিন যাবৎ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, এতদিন যদি প্রকৃতই তোমার আশ্রয়ে থাকিতে পারিতাম, যদি তোমার সাধনদ্বারা জীবনকে পবিত্র করিতাম, তবে আজও এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ থাকিব কেন? আমরা যাহা করি তাহা অন্তরের নয় বলিয়াই পাপ আসিয়া আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, পাপের বৃদ্ধি আর সহ্য হয় না। কোথায় পাপ তাড়াইব, আর কোথায় অল্পে অল্পে আরো আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় দুর্ব্বল মন ক্রমেই পাপে ভারি হইতেছে, দিনে দিনে জীবন বড়ই কদর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করিল। এই পাপ শত্রুর ধ্বংস না হইলে আর মঙ্গল কোথায়? যে পাপ আমাদের এত অনিষ্ট করিতেছে, এত লাঞ্ছনা দিতেছে, তাহাকে বিনাশ করা দূরে থাক্, আরো আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিতেছি; মিত্রের ন্যায় আনন্দে তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া পোষণ করিতেছি। যাঁহারা আমাদের জীবনের প্রধান সহায়, যাঁহাদের সহানুভূতি ভিন্ন পরিত্রাণ অসম্ভব সেই ভ্রাতাভগিনী-দিগকে শত্রুজ্ঞান করিয়া দূরে যাইতেছি। মনুষ্যজীবনে ইহা হইতে আর কি বিড়ম্বনা আছে? আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা, সমাজের শোচনীয় ভাব এবং দেশের এই ভীষণ মূর্ত্তি! হায়! যেদিকে চাই সকলি কষ্টপূর্ণ। এসকল দেখিয়া মন নিতান্তই অস্থির হয়, এবং আশা হয় না যে শীঘ্র আর আঁধার ঘুচিবে। একধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়াই কি এত অভাবের সৃষ্টি করে নাই? কৃত্রিম ধর্ম্ম, ধর্ম্মের অভাব এবং ধর্ম্মভাবের শৈথিল্য এই সকলের জন্যই সংসারে এত অসুখ, এত বিবাদ-বিসম্বাদ

প্রতিনিয়ত ঘটিয়া আসিতেছে। ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঐক্য নাই, ভগিনীতে ভগিনীতে সদ্ভাব নাই, কেবল অশান্তির কর্কশ শব্দে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান, এই সমস্ত নর নারীই আমাদের ভ্রাতা ভগিনী, এ সম্বন্ধ এই কুটিল সংসারের সম্বন্ধ নহে, ইহা পিতার উদার পবিত্র সম্বন্ধ। যদি এ সম্বন্ধের মর্ম্ম বুঝিতাম, যদি সকল ভ্রাতাভগিনী একধর্ম্মে একমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিতাম, সকলের হৃদয়ই যদি পিতার প্রেমে অনুরঞ্জিত হইত, সকল জীবনের বল একত্রিত হইয়া যে বলের সৃষ্টি হইত, তাহাতে সমস্ত সংসার পরিষ্কৃত হইয়া স্বর্গীয় নির্ম্মলতায় পূর্ণ হইত। এই সমস্ত ভ্রাতা ভগিনীর কণ্ঠ হইতে যখন সমস্বরে পিতা পিতা বলিয়া কাতরোক্তি উত্থিত হইত এবং সকলেই ব্যাকুল প্রাণে তাঁহার পানে তাকাইতাম তখন বিন্দু পরিমাণ পাপও আর এ পৃথিবীতে তিষ্ঠিতে পারিত না। সেই দিনই স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইত। ভয়ানক কুসংস্কারের সময় যখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই উদার পবিত্র ধর্ম্মের জ্যোতিঃ ঘোরান্ধকারের মধ্যে প্রথম প্রচার করেন, তখন কত প্রকার অত্যাচার, কত প্রকার নির্য্যাতন, তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল, তিনি এই শোচনীয় অবস্থায় থাকিয়াও সেই পবিত্র জ্যোতিঃ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই এত কষ্ট এত নির্য্যাতন অনায়াসে সহ্য করিয়া দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে সক্ষম হইলেন। জীবনের সমস্ত বল তাহাদের উপকারের জন্য নিয়োযিত করিলেন। ধর্ম্মের বলে বলীয়ান হইলে এক একটি মনুষ্যজীবন দ্বারা কত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা এই মহাত্মার জীবন দেখিলেই বুঝা যায়। তিনি এক জীবনে যে ভাব

বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, যত গুলি কুসংস্কারের উচ্ছেদ করিয়াছেন, ভাবিলে কি আশ্চর্য্য ভাবের আবির্ভাব হয়। আমরা যে একটু আলো দেখিতে পাইয়াছি, যেটুকু স্বাধীন চিন্তা করিতে অভ্যাস করিয়াছি, তাহা সেই মহাত্মারই প্রসাদে। তাঁহার নিকট আমরা সর্ব্বতোভাবে ঋণী আছি। যদি এ জীবনে ধর্ম্মের জন্য কিছু করিতে পারিতাম, তবে আজ জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিয়া কতক শান্তি পাইতে পারিতাম। অন্ততঃ জীবন বিশুদ্ধ করিতে পারিলেই প্রবোধের বিষয় ছিল; কিন্তু, আমাদের দ্বারা কেবল এ ধর্ম্মের কলঙ্কই বৃদ্ধি হইল আর কিছুই নহে। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়া ছিলেন, কুসংস্কারের মূল আলোড়িত করিয়া যে সত্যস্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেই আজ এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। বহু দিনের অনেক প্রকার অন্ধকার বিদূরিত করিয়া যে সত্যজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন তাহা মনুষ্য সমাজে চির দিনের জন্য অঙ্কিত থাকিবে। তখন দিনে দিনে যেরূপ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই যে পবিত্র সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের নির্ম্মলজ্যোতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িবে, কে না আশা করিয়াছিলেন? ফলতঃ আশানুরূপ স্রোত বহিতেও ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশের অবস্থা ফিরিয়াও যে ফিরিবে না, তাহা কে, মনে করিয়াছিল? এত অল্প সময়ের মধ্যে এবং প্রথম উদ্যমে প্রবল স্রোতের মধ্যেই যে অন্যায়রূপে প্রত্যাহত হইয়া বেগে ভাঙ্গিয়া নূতন গতিতে দুই বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইবে, তাহা কে জানিত? এদেশের ভাগ্যে সকলি নূতন! যাহা কিছু অনুকূলে আসে, তাহাও আবার প্রতিকূলে দাঁড়ায়।

কেবল উদ্যম ভগ্ন হওয়াতে অনেকরূপ ক্ষতি হইয়াছে, এবং সাধারণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষরূপ শিথিলতা ঘটিয়াছে তাহা ঠিক, কিন্তু তাই বলিয়া এই ঈশ্বরের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার নহে। যদি মনুষ্য এ পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হয়, তবে তাঁহার ধর্ম্ম কিরূপে লোপ হইবে? যত দিন মনুষ্য থাকিবে ততদিন তাহাদের ধর্ম্ম অবশ্যই থাকিবে। এই বর্ত্তমান সময় যদিও খুব ভয়ানক অবস্থায় অবস্থিত, সকল সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ অবস্থাই অতীব শোচনীয় এবং সকল সমাজের জীবনই প্রায় মৃতের ন্যায় জীবনহীন হইয়া রহিয়াছে, তথাপি এই সকল শিথিলতা ঘুচিয়া ঈশ্বরের জয়পতাকা অবশ্যই একদিন উঠিবেই উঠিবে। ঈশ্বরের সত্যধর্ম্ম মনুষ্যের সাধ্য নাই, প্রতিরোধ করে। যাহা অনায়াসে সহজে লব্ধ হইত তাহা না হয় বহুকষ্টে বহু দিনে স্থাপিত হইবে। এই সময়ে এই অভিনব বিপ্লব দ্বারা সর্ব্বসাধারণের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্যপক্ষে আবার ইহার বিপরীত হইয়াছে। ব্রাহ্মদের যে সকল অন্যায় ত্রুটি ঘটিয়াছিল, এই সংশোধনে তাহা বিদূরিত হইবে আশা করা যাইতে পারে। এই ঘটনায় তাঁহাদিগকে অনেক পরিমাণে সতর্ক করিয়া দিয়াছে।

ভ্রাতৃগণ। আমরা যে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তাহার গুরুত্ব ভাব সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ করিয়া চলা উচিত। আমাদের দ্বারা যেন এ বিশুদ্ধ ধর্ম্মের কলঙ্ক না হয়। আমরা যদি সত্য সত্যই সেই সত্যস্বরূপের শরণাগত হইয়া থাকি এবং সেই পবিত্র স্বরূপের দাসদাসী হইবার জন্যই আসিয়া থাকি, তবে কখনই আমাদের মধ্যে অসত্য ভাব, অপবিত্র ভাব আসিতে পারিবে না। যদি তাহার অন্যথা দেখিতে পাই নিশ্চয়

জানির আমরা কপটী, প্রকৃতরূপে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি নাই। ধর্ম্ম আমাদের অন্তরে নহে, কেবল বাহিকে ধর্ম্ম নাম ধারণ করিয়াছি। হে অন্তর্যামি! আমাদের হৃদয়ের শোচনীয় ভাব তুমি সকলি দেখিতেছ, তোমার নিকট নাথ! কিছুই অবিদিত নাই। আমরা কে কি ভাবে তোমাকে ভাবিতেছি, কে কি ভাবে উপস্থিত হইয়াছি, সকলি তুমি জানিতেছ। নাথ! এই কর তোমার রচনার মধ্যে তোমার জলন্ত ভাব, প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া চির জীবনের জন্য মোহিত থাকি।

হে জীবনের জীবন! তোমার জীবন্ত ভাব দেখিয়া আজ মোহিতান্তঃকরণে তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম, আজ তোমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছি বলিয়া এই সমস্ত বস্তুতেই অভিনব ভাব অবলোকন করিতেছি, যাহা এতদিন একবারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, আজ কি না সেই একটী সামান্য বস্তুর মধ্য দিয়াও কি প্রখর নির্ম্মল জ্যোতি অবলোকন করিতেছি, এবং দেখিয়া কতই আনন্দ লাভ করিতেছি। ধন্য তোমার মহিমা, প্রভু! তুমি কিভাবে এই জগৎ অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছ, যে দিকে চাই, যে দিক্‌পানে লক্ষ্য করি সকলই অতি মনোরম বলিয়া প্রতীতি হয়। যাহা আজ দেখিলাম অন্য সময়েও ত এই সকল দেখিয়াছি, তবে কেন নাথ! দেখিয়া এরূপ আনন্দ পাই নাই, ঈদৃশ ভাবতত্ত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হই নাই, কি আশ্চর্য্যভাবে অদ্য বুঝাইয়া দিলে এবং এ দাসীকে তোমার প্রেমে আজ বড়ই মোহিত করিলে। তুমি যে এই ভাব এই সকল পার্থিব পদার্থে অদ্যই প্রদান করিলে তাহা নহে, বহুদিন হইতে যে দিন এই সকল পদার্থ সৃজিত

করিয়াছ, সেই দিন হইতেই তোমার ভাবে ইহা গঠিত হইয়াছে, সেইদিন হইতে এই পর্য্যন্ত, তোমার আজ্ঞায় ইহারা তোমার ভাব জগতে প্রচার করিতেছে, যাহা তোমার সর্ব্বোচ্চ সৃষ্টির প্রধান জীব মনুষ্যেরাও প্রচার করিতে পারে নাই। প্রচার করা দূরে থাকুক, যাঁহার প্রসাদে তাঁহারা সকলের উচ্চ আসন গ্রহণ করিল এবং সমস্ত সুখ শান্তির অধিকার পাইল, তাঁহাকেই বুঝিল না। বুঝিল না তাই অমৃতপানে বঞ্চিত হইল, অমৃত হারাইয়া মরুভূমে পড়িল। উত্তরোত্তর আরো আশামরীচিকায় ভুলিয়া ক্রমেই সরলতা হারাইতে বসিল। জীবন নীরস হইলে, আর কি সে রস পাইতে পারে। বল নাথ! তোমাকে ছাড়িলে কি আর মধুকে মধু বলিয়া বুঝিতে পারে? আর কি সে আস্বাদে রসনা মিষ্টত্ব অনুভব করিতে পারে? কখনই নহে। তখনই মনুষ্য মধুর অপমাননা করিয়া ভ্রমে পতিত হয়, এবং আনন্দে ও আহ্লাদের সহিত আপাতমিষ্ট পাপরূপগরল ইচ্ছা করিয়া ভক্ষণ করে, সেই গরল খাইয়াই হৃদয় বিকৃত কালীতে লেপিত হইয়াছে। তাই চেষ্টা করিলেও তোমার প্রেমজ্যোতিঃ আর হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না; সেই জন্যই জীবন এত ভারবহ বলিয়া বোধ হয়, কিছুতেই প্রকৃত সুখশান্তি পাই না। জীবন নীরস এবং যাহা দেখি সকলই যেন নীরস কর্কশভাবে আমাদিগকে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। তোমার অসীম করুণা বলিয়াই আমরা অদ্য পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করিতেছি, নতুবা হে দীননাথ! তোমার এই দীন অপ্রেমিক সন্তানগণ কোন্‌কালে প্রেম-জীবন অভাবে জীবন পরিত্যাগ করিত, তোমার অতুলনীয় দয়া অবলম্বন

করিয়াই আমরা এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। নাথ, কবে আমাদের জীবন তোমার প্রেমে গঠিত হইবে, কবে প্রত্যেক বস্তুতে কেবল তোমারই ভাব অবলোকন করিয়া এ জীবন সার্থক করিব? আমাদের এমন দিন কি শীঘ্রই আসিবে যে দিন অন্তরে বাহিরে তোমাকে দেখিয়া এ প্রাণ শীতল করিতে অধিকারিণী হইব।

ওঁ সত্যমেব জয়তে।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়া কর্ত্তৃক

বিবৃত উপাসনা ও বক্তৃতা।

যিনি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; যিনি সকলের স্রষ্টা ও পরিত্রাতা; যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী মহান্ পুরুষ; যিনি জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে সমভাবে বিদ্যমান; সর্ব্বলোকে সত্যরূপে, প্রাণরূপে, আনন্দরূপে যিনি বিরাজমান; যাঁহার মহিমার অন্ত নাই, করুণার পার নাই; এই সুনীল আকাশস্থিত গ্রহ উপগ্রহ যাঁহার প্রখর জলন্ত ভাব বিঘোষিৎ করিতেছে; এই সৌর জগৎ যাঁহার মঙ্গল ভাবের জাজ্জ্বল্য নিদর্শন এবং অসীম অনন্ত জগৎ হইতে এই ক্ষুদ্র গৃহটী পর্য্যন্ত যাঁর পবিত্র ভাবে পরিপূরিত; সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্ব সুখদাতা পরমাত্মাকে পাইবার জন্য, তাঁহার পূজার জন্য কয়েকটী ভাই ভগিনী এখানে সমবেত হইলাম। অদ্য আমাদের কি আনন্দের দিন! কি সুখের দিন! সকল ভ্রাতা ভগিনী সম্মিলিত হইয়া শান্তি নিকেতনে যাইবার

জন্য পিতার দ্বারে উপস্থিত। আজ ব্যাকুল হৃদয়ে তৃষিত প্রাণে প্রাণ ভরিয়া পিতাকে ডাকিব, ডাকিয়া বহু দিনের পিপাসা পরিতৃপ্ত করিব এবং তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া মনুষ্য জনম সফল করিব। আমরা এমন শুভ দিন, এমন উৎসবের দিন আর কবে পাইব,—যে দিন আবার এতটী পুত্র কন্যা সম্মিলিত হইয়া পিতাকে দর্শন করিয়া উৎসব সুধাপানে সক্ষম হইব। মন! তুমি আজ চঞ্চলতা পরিহার পূর্ব্বক শান্তভাব ধারণ কর; কুটিলতা ও কপটতা ছাড়িয়া সরল হও। সাংসারিক মলিন বিষয় কামনা লইয়া এই পবিত্র গৃহে স্থান পাইবে না, এখনি দুঃখের আঘাতে তোমার ঐ উন্নত মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে; সাবধান, সাবধান, এই গৃহ 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' পিতার পবিত্র গৃহ অপবিত্র আত্মার এখানে স্থান পাইবার কোন অধিকার নাই। সংসারের পঙ্কিল মলিন কামনা পরিত্যাগ কর, তবে তাঁহার সেই পবিত্র স্বরূপ দেখিতে পাইবে; যদি অমৃত স্বরূপকে পাইয়া অমর হইতে চাও, আত্মাকে পবিত্র কর, হৃদয়কে তাঁহার প্রেমে প্রেমিক কর, এবং তাঁহার ভাবের ভাবুক হইয়া, তাঁহাতে নিমগ্ন হও। পিতার অক্ষয় কবচ পরিধান করিয়া সকল শত্রুকে পরাজয় পুর্ব্বক তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হও; নির্ভয় চিত্তে হৃদয়ে সেই হৃদয়েশকে একবার অবলোকন কর, দেখ, তিনি করুণার হস্ত বিস্তার করিয়া তোমাকে ডাকিতেছেন। ভ্রাতৃগণ! ভগিনীগণ! যাঁহার উপাসনার নিমিত্ত যাঁহাকে হৃদয়ের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা দান করিবার জন্য আজ এখানে সকলে মিলিত হইয়াছি, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাঁহার পূজার জন্য উৎসুক হই, এই উৎসব সময়ে সংসারের কুটিল চিন্তা সমূহ যেন

আমাদিগের হৃদয়কে বিক্ষিপ্ত না করে, এইক্ষণ সময় থাকিতে হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করি এবং তাঁহার শান্তিবারি, প্রেমবারি, লাভ দ্বারা আত্মাকে নির্ম্মল করি, সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দান করিয়া জীবন সার্থক করি।

অদ্য যেন জ্ঞান নেত্র তাঁহাকে দেখিতে পায়; এই শূন্য হৃদয়, এই শুষ্কমন যেন তাঁহার প্রেম সুধা লাভ করিয়া পূর্ণ হয়। হে করুণাময় পিতঃ করুণা করিয়া যখন পাপীর ভগ্ন-গৃহে আসিয়াছ, তখন ভগ্ন হৃদয়কে অবশ্যই সুস্থ করিবে; আমরা তোমার অতি দরিদ্র, দুর্ব্বল সন্তান, তাই থাকিয়া থাকিয়া হৃদয় কম্পিত হইতেছে, পাছে আমাদের এই আনন্দ উৎসব কেবল আড়ম্বরেই পর্য্যবসিত হয়, পাছে শূন্য হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া যাই। পিতঃ! যদি কোন এক বিষয়ে দরিদ্র হইতাম, আশা থাকিত হৃদয়ের বলে অন্য বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া অবশ্যই এক দিন না এক দিন পরম ধন লাভ দ্বারা ধনী হইতে পারিব, কিন্তু তাহাতেও বঞ্চিত, কারণ আমরা সকল বিষয়েই দরিদ্র। হৃদয়-দর্শী পিতঃ! তোমার নিকট আর কি বলিব, তুমি প্রতিনিয়তই আমাদিগের দুর্ব্বলতা দেখিতেছ, তুমি কৃপা করিয়া এই কর, যেন অদ্য হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারি, এবং তোমার পূর্ণস্বরূপ উপ-লব্ধি করিয়া সকল ভ্রাতা ভগিনী কৃতার্থ হইতে পারি।

তুমি সত্যস্বরূপ, এই জগৎস্থিত সমস্ত সত্যের মূল সত্য তুমি। তুমি সত্যরূপে, জ্ঞানরূপে সমস্ত জগতে ওতপ্রোতভাবে চির বিরাজমান, তোমার সত্য শিবসুন্দর ভাব দেখিয়া মন স্তব্ধ হইয়া যায়। সম্পদে বিপদে, সুখে, দুখে, সকল অবস্থাতেই তোমার মঙ্গল হস্ত প্রকাশ পাইতেছে। তুমি পবিত্র স্বরূপ,

আনন্দস্বরূপ অমৃতের নিকেতন, তোমার অমৃতবারি অজস্র ধারে প্রতিনিয়ত বর্ষিত হইতেছে। পাপী তাপী, দীন দরিদ্র কেহই তোমার করুণা লাভে বঞ্চিত নহে, সকলের প্রতিই তোমার অবারিত দ্বার। যখন যে অবস্থায় যে সরল প্রাণে যাহা চাহিয়াছে, তখনি তাহা প্রদান করিয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করিয়াছ; নাথ! তোমার করুণায় কেহই কখন বঞ্চিত হয় নাই, কখন হইবে না। আমি যে সংসারের কীটাণুকীট, আমার প্রতিও কত শত বার তোমার করুণা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। পাপী যখন বিষয়ের ভীষণ আঁধারে নিপতিত হয়, যখন তাহার আর কিছুই দেখিবার শক্তি থাকে না, সংসারের কুটিল পথে পড়িয়া নানা প্রকার বিভীষিকা দেখিয়া যখন তাহার প্রাণ কাঁন্দিয়া উঠে, তখন তুমিই তাহাকে পথ দেখাইয়া আন। আমরা মনুষ্য হইয়া, তাহার ভ্রাতা ভগিনী হইয়া পাপে একটু উনিশ আর বিশ প্রভেদেই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি, এবং অতি অল্প পরিমাণে বেশকম হইলেই নিতান্ত পাপী নরাধম বলিতে একটু মাত্র কুণ্ঠিত হই না; আর তুমি সকলের রাজা হইয়া, পবিত্রতার আধার হইয়া নিতান্ত জঘন্য পাপীকেও স্বীয় ক্রোড়ে স্থান দিয়া তাহার সন্তাপিত আত্মাকে সুস্থ কর। আশ্চর্য্য তোমার করুণা, প্রভু, আশ্চর্য্য তোমার স্নেহ, ইহা দেখিয়াও আমাদের জ্ঞান নেত্র উন্মিলিত হয় না, কি আশ্চর্য্য! আমরা এত হীন, এত নীচ হইয়াও তোমার অসীম করুণাতেই বিচরণ করিতেছি।

হে করুণাসিন্ধু! তোমার এই অপার করুণার বিষয় যখন ভাবিয়া দেখি, তখন কি এক আশ্চর্য্য ভাবেরই উদয় হয়; তখন দেখি এই রাজ্যে, এই সংসার করুণার সংসার। ঐ যে অনন্ত

আকাশে পক্ষান্তরে সুধাকর উদিত হইয়া সুধা বর্ষণপূর্ব্বক জগৎ সুধাময় করিয়া থাকে, তাহাতেও তোমারই এই করুণা। শত সহস্র হিংস্র প্রাণী সঙ্কুল গহনবন, কি ফল পুষ্প পরিশোভিত সুরম্য কানন, কি ভীষণাকার মরুভূমি, কি স্নিগ্ধ সলিলা স্রোতস্বতী, অত্যুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী হইতে গভীর জলধি বারি পর্য্যন্ত, সকলেতেই তোমার করুণার ও মহিমার পরিচয় পাই। যদি বিবেককে সহায় করিয়া দেখিতে যাই, তবে সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, তোমার এক মঙ্গল হস্তই দেখিতে পাই। তুমি স্বপ্রকাশ, আপনা হইতেই ভক্তহৃদয়ে প্রকাশিত হও, তোমার প্রকাশেই সমস্ত জগৎ সংসার প্রকাশিত। যিনি সকলের প্রকাশক, তাঁহাকে আবার কে প্রকাশ করিতে পারে? তোমার সত্তাতে এই জগৎ পূর্ণ, তোমার সত্তাতেই আমাদিগের অস্তিত্ব, নতুবা কোথায় বা থাকিত আমার জ্ঞান, কোথায় বা থাকিত বুদ্ধি, নির্ব্বোধ মন কিছুই জানে না, তাই এত আস্ফালন করে; অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া পদেপদে আঘাত পায়, এবং নিজের বলে চলিয়া অসংখ্য বিপদকে ডাকিয়া আনে।

তুমি অনন্ত জ্ঞানের আধার, অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, তোমার সমস্তই অনন্ত; আমাদের কি সাধ্য যে, তোমার স্বরূপের শেষ করি, তোমার এক একটী মাত্র স্বরূপেরও আমরা নির্ণয় করিতে সক্ষম নহি, মনুষ্যভাষাতে কি কখনও তোমার স্বরূপের বর্ণনা হইতে পারে? এই ক্ষুদ্র প্রাণী দ্বারা কি মহান্, অনন্ত, অসীমভাব ব্যক্ত হইতে পারে? কখনই নহে। আমাদের সীমাবিশিষ্ট মন যখন তোমার অনন্তভাবের চিন্তায় উৎসুক হয়, কতদূর অগ্রসর হইয়াই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া তখনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া

ফিরিয়া আইসে ;—বুদ্ধি পরাস্ত মানে, জ্ঞান আঁধারে পড়িয়া হাবুডুবু খায়। কাহার সাধ্য তোমার ইয়ত্তা করে ? তবে যে আমরা তোমার স্বরূপ বলিতে যাই, তাহা কেবল আমাদের আত্মার তৃপ্তির জন্য, প্রাণের ক্ষুধা নিবারণের জন্য, অন্যথা আর কিছুই নহে। আর তুমিও সন্তানগণের বদনোচ্চারিত কতকগুলি স্তুতিবাদ শুনিতে ইচ্ছুক নহ, তুমি চাও কার্য্য ; কিসে সন্তানগণ নিজ নিজ কার্য্য বুঝিয়া চলিবে, কিসে তোমাকে লাভ করিবে এবং এই সংসার দুর্গম পথে নির্ভয় চিত্তে চলিয়া যাইতে সক্ষম হইবে, যাহাতে পবিত্র পথে বিশুদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে পারে, প্রতিনিয়তই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কেবল এই মঙ্গল কার্য্য করিতেছ। কতবার সন্তানগণ তোমার হস্ত হইতে পলাইয়াছে, কতবার তোমার অবমাননা করিয়াছে, তথাপি তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই, তোমার করুণার হস্ত তখনও তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। প্রভু! ধন্য তোমার ক্ষমা, ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা ! তুমি কখন কিভাবে পাপীকে তরাও, কিভাবে আকর্ষণ করিয়া তোমার দিকে ফিরাইয়া আন, তাহা আমরা কি বুঝি কি জানিতে পারি ? যদি তোমার দয়ার মর্ম্মই বুঝিতে পারিতাম, তবে আজও কি এতদূরে পড়িয়া থাকিতাম ! তোমার দয়ায় এত দিন ধন্য হইতাম।

পিতঃ! এখনও তোমার প্রকৃত সাধক হইতে পারি নাই, পাপের শত্রু এখনও হই নাই। আমরা ভালরূপে জানিয়াছি' ঐ শত্রু সংহার করিতে না পারিলে আর আমাদের পরিত্রাণ নাই। আমাদের এরূপ সাধ্য নাই যে, নিজের বলে সমস্ত শত্রুকে বিনাশ করি। এইক্ষণ তুমি সহায় না হইলে আর পরি-

ত্রাণ নাই, তুমি সহায় থাকিলে শত সহস্র শত্রুকেও ভয় করি না, তখন নির্ভয়চিত্তে একাকিনীই সমস্ত জগৎ জয় করিতে পারি। পিতঃ! অদ্য ব্যাকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই, যেন, এবার সকল শত্রু সংহার করিয়া তোমার জয় পতাকা উড়াইতে পারি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের বিবেককে নির্ম্মল করিয়া দেও, জ্ঞান ও বুদ্ধিকে উজ্জ্বল করিয়া দেও, আর যেন দিক্ ভ্রান্ত হইয়া আঁধারে না পড়ি, আর যেন সংসারমোহ আমাদিগকে আবৃত করিতে না পারে, বিষয়-মৃগতৃষ্ণিকায় পড়িয়া আবার যেন তোমাকে না ভুলি - তুমি যখন যে অবস্থায় রাখ, তাহা-তেই যেন তোমার দয়ার হস্ত মঙ্গলের হস্ত দেখিতে পাই। আর কিছুই চাই না, আর কিছুই আমার প্রয়োজন নাই, চিরদিন তোমার আশ্রিত হইয়া থাকিতে পারি, তোমার দাস দাসী থাকিয়া ঐ অভয়পদ পূজিতে পারি, এই বাসনা পূর্ণ কর।

ভ্রাতৃগণ; ভগিনীগণ! আমরা সকলে মিলিত হইয়া এত-ক্ষণ যে পরব্রহ্মের উপাসনা করিলাম, যাহার আশ্রয়ে সেই পিতাকে এই উৎসব মধ্যে প্রত্যেক হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে দর্শন করিয়া আজ কৃতার্থ হইলাম, একবার ভাবিয়া দেখুন, সেই উপাসনার ভাব কি সুমহৎ, কি প্রকার জীবনপ্রদ। এই উপাসনা শব্দটী বলা মাত্র হৃদয়ে কি অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়। আমাদের জীবন যে কিছুমাত্র উপাসনাশীল নহে, প্রকৃত উপাসনার ভাব যে আজীবনে কিছুই বুঝিতে পারি নাই, তথাপি ইহাতে কি আনন্দ পাই, কি আরাম পাই। যেমন 'পবিত্র' বলা মাত্র ঘোর পাতকীর মনেও পবিত্র ভাবের আবি-র্ভাব বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশ পায়, এবং তাহাকে ক্ষণকালের জন্য

জাগরিত করে, আমাদের জীবনে উপাসনার ভাবও ঠিক সেই-রূপ। আমরা জীবনের অধিকাংশ সময়ই সংসার পাশে বদ্ধ থাকি, বিষয়ের পূজা করি এবং অনিত্য ক্ষণিক সুখের নিকট আত্মাকে বিক্রয় করিয়া রাখি। এইরূপ বিষয় কামণায় নিম-জ্জিত৷ থাকিয়া যখন উসাসনার জন্য ব্যাকুল হই, তখন অনেক চেষ্টায়, অনেক সাধনে যদি সংসার পাশ ছিন্ন করিতে সক্ষম হইলাম, তবে ব্রহ্মদর্শন বিদ্যুতের ন্যায় হৃদয়ে অনুভূত হইল, ক্ষণকাল সেই সচ্চিদানন্দকে চিদাকাশে অবলোকন করিয়া সাংসারিক শোক তাপ ভুলিয়া গেলাম, এবং মুহুর্ত্তের জন্য শান্তিময়ের শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে অবস্থিতি করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিলাম ; এইরূপ ক্ষণিক উপাসনায় কি হইতে পারে? যদি পর মুহূর্ত্তেই তাহার স্বাদ ভুলিয়া বিষয় মদে মত্ত হইলাম, যদি বিষয়ের অনিত্য সুখকেই বড় ভাবিলাম, আসুরিক লাল-সাকেই জীবনের সার করিলাম, তবে এই নাম মাত্র উপাসনায় আমাদের কি হইবে? এই মৃত উপাসনা আমাদিগকে জীবন দিতে পারে না, পাপমুক্ত করিতে ইহার সাধ্য নাই। হায়! আমরা এতদিন যে উপাসনা করিয়া আসিলাম তাহার ভাব কি প্রকার মৃত, কি শোচনীয়। বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে সপ্তাহে সপ্তাহে রীতি পূর্ব্বক উপাসনা করিয়া আসিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত সজীব ভাব নাই, প্রাণগত বল নাই। যদি সুস্থির চিত্তে ঈশ্বরের স্বরূপ গুলিন হৃদয়ে আন্দোলন করায় নাম উপাসনা হইত, কিম্বা অঙ্গীভূত বিষয়গুলি যথারিতী সম্প-ন্নের নাম উপাসনা হইত,তবে আজ গতজীবন স্মরণে আহ্লাদিত হইতাম, সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ আনন্দের দিন নহে, আজ

কান্দিবার দিন ;—অদ্য সারা জীবনের উপাসনা খুঁজিয়া দেখিলাম, তাহাতে যাহা জানিলাম তাহা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধিভূত হইয়া যায়!! কি ভয়ানক কথা! এতদিন যাহা করিয়া আসিলাম আজ দেখি তাহার মধ্যে প্রায় সমস্তই বাদ। এই সমস্ত জীবনের মধ্যে প্রকৃত উপাসনা যে কতটুকু হইয়াছে, তাহা ধারণা করাই এইক্ষণ অতি দুঃসাধ্য; এই সময়ের মধ্যে এক চতুর্থাংশ সময়ও যদি প্রকৃত উপাসনা হইত, তাহা হইলেও এতদিন এ হৃদয় স্বর্গভূমি হইয়া যাইত! এখন পাপ আসিয়া হৃদয়ের উপর যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করে, বিষয় লালসা যেরূপ উৎক্ষিপ্ত করিয়া অস্থির করে; তখন কি সাধ্য ছিল ইহারা আমাদের নিকটবর্ত্তী হয়, কি আমাদের হৃদয় মন অধিকার করে? এক উপাসনার তেজেই সকলে ভস্মীভূত হইত। সকলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত।

যে ব্রহ্মোপাসনা আমাদের জীবন, যে উপাসনা আমাদের সম্বল এবং সম্পদ, যাহা দ্বারা মানুষ লক্ষ্যস্থানে যাইতে পারে, আমরা কিনা সেই পরম সত্য জীবনপ্রদ উপাসনাতত্ত্ব আজও ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই নাই; ব্যাকুল প্রাণে তাহার জন্য বিশেষ সাধনাও করি নাই। আমাদের কি মতিচ্ছন্ন কি আশ্চর্য্য ভাব, মনুষ্য হইয়া মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য বুঝিলাম না, এবং তদুপযুক্ত কোন কার্য্যও করিলাম না। কেন আমাদের এই শোচনীয়ভাব? কেনই বা জীবনের এই দুর্দ্দশা? ইহার মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে কি দেখিতে পাই? দেখি আমরা সংসাররূপ ভীষণ সমুদ্রে পড়িয়া সর্ব্বদাই হাবুডুবু খাইতেছি, তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে ক্রমশঃ এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি

যে, এইক্ষণ আর এমন সাধ্য নাই যে, নিজের বলে গম্যস্থানে যাইতে পারি, কি প্রতিকূল বিষয়ে জয়ী হইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি। সাধকের নিকট যে পথ প্রশস্ত, সরল বলিয়া বোধ হয়, আমাদের নিকট সেই পথই এইক্ষণ অতি দুর্গম বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। একবার যথার্থ পথ অতিক্রম করিলে পুনঃ সেই পথে যাইতে অনেক কষ্ট, অনেক সাধনার প্রয়োজন, সুতরাং এইক্ষণ আর নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নহে, অদ্যই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন এই মহামন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে। মন! আর কতদিন অনাহারে থাকিয়া প্রাণে মরিবে? এখনও সময় আছে, এখনও তোমার প্রাণ একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, এই রক্তের গতি থামিবার পূর্ব্বেই সেই জীবিতেশ্বরের শরণ লও, তাঁহার উপাসনা দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়া প্রফুল্লতার সহিত তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। অলিক কল্পনা জল্পনা ছাড়িয়া দেও, আর মৌখিক উপাসনা করিয়াই আপনাকে ধন্য মনে করিও না, প্রকৃত উপাসনাতত্ত্ব অধ্যয়ন কর, তাঁহাকে জীবনের সম্বল ও সহায় করিয়া মুক্ত হও।

আত্মা পরমাত্মার সমীপবর্ত্তী হওয়ার নামই যথার্থ উপাসনা, সেই পরমাত্মাকে জীবনরূপে, প্রাণরূপে উপলব্ধিপূর্ব্বক তাঁহাতে সমাহিত হইতে পারিলেই ইহার যথার্থ তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই উপাসনার জন্য তোমাকে বনে, কি পর্ব্বতগুহায় যাইতে হইবে না, ঘরে বসিয়াই ইহা সাধন করিতে পারিবে। ঈশ্বর সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে থাকেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কখন কাহাকে পরিত্যাগ করেন না, তুমি ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে হৃদয়ে দেখিতে পাও, এবং তাঁহার নিকট আছ বলিয়া নির্ভয়

নিশ্চিন্ত হও। তুমি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আছ ইহা যদি একবার বুঝিতে পার, তবে কি সংসারের কোন প্রলোভনকেই আর তুমি ভয় কর? তখন অটল বলে অবস্থিতি করিয়া পর্ব্বতাকার বিঘ্ন বিপত্তিকেও অবলীলাক্রমে সরাইয়া দিতে সক্ষম হও। বিশ্বাসীকে এসংসারে কেহই পরাজয় করিতে পারে না। এক বিশ্বাসের জোরেই সে সমস্ত সংসার জয় করিয়া থাকে। তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই ফেলিয়া দেও, আর দুঃখ সাগরেই নিমগ্ন কর, কিছুতেই তাহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারিবে না। শত সহস্র প্রলোভনের মধ্যেও সে বিশ্বাসের জয় পতাকা উড়াইতে উড়াইতে সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে॥ বিশ্বাসীর পক্ষে সকলই অনুকূল, আর অবিশ্বাসীর নিকট সকলই প্রতিকূল; তাহার নিকট সকলই তমসাচ্ছন্ন বিভীষিকাময়। অন্য অবস্থা অনুকূল হইলেও এক বিশ্বাসের অভাবে তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে। সে নিজ হৃদয়ের অন্ধকার দেখিয়াই ভয় পাইয়া থাকে, এবং পদে পদে বিপদে পড়িয়া প্রকৃত জীবন হারাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাবধান, দেখিও এই অবিশ্বাসী রাক্ষসীর হস্তে যেন মারা না যাও। তোমার বিশ্বাসের বাঁধ যেন দৃঢ় থাকে, তাহা হইলে আর কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না। জীবন, জ্ঞান, বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যভাবে তাঁহারি প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত কর, দেখিবে এইরূপ উপাসনায় কি আনন্দ, কি অমৃত লাভ করা যায়; এই উপাসনা দ্বারাই ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা মানুষকে দেব পদবীতে স্থাপন করে, মৃত্যু হইতে উদ্ধার করে, এবং আত্মাকে অমর করিয়া স্বর্গভূমিতে লইয়া

যায়। মানুষ যে সশরীরে স্বর্গধামে যাইয়া থাকে, তাহার নিগূঢ় তত্ত্বই এই।

দয়াময় পিতঃ! আমরা আর কতকাল মোহ-নিদ্রায় অভিভূত থাকিব? ইহলোকে কি আর আমাদের জ্ঞাননেত্র ফুটিবে না? তোমার আনন্দময়, প্রেমময়, প্রফুল্লমুখ কি আর দেখিয়া এ তাপিত প্রাণ শীতল করিতে পারিব না? তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সহায় হও, আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া জ্ঞানালোক প্রদান কর। আমাদের জীবনকে তোমার উপাসনায় নিযুক্ত কর, এবং উপাসনাই আমাদের অঙ্গের ভূষণ করিয়া দেও, আমরা যেন মূহুর্ত্তের জন্যও এ ভূষণ আর না ছাড়ি। এ জীবনে তোমার আধিপত্য বিস্তৃত হউক, তোমার মঙ্গল কামনা সিদ্ধ হউক, এই তোমার নিকট শেষ প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

১২৯১ সনে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম প্রচার।

যেমন জলের ধর্ম্ম নিম্নে যাওয়া, বাষ্পের ধর্ম্ম উর্দ্ধে উত্থিত হওয়া, সেইরূপ মানবের ধর্ম্ম পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হওয়া। আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া যতক্ষণ না তাঁহাকে দৃঢ়তররূপে ধরিতে পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ধর্ম্ম সে গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে না; কারণ ঈশ্বর প্রাপ্তিই তাহার ধর্ম্ম। তাপের অভাব হইলে জল জমিয়া বরফ

হয়—তাহার নিম্নগামিত্ব ধর্ম্মের লোপ হয়, বাষ্পের ঊর্দ্ধগামীত্ব শক্তির বিরাম হয়, তদ্রূপ জ্যোতির্ম্ময় সুতীক্ষ্ণ কিরণ হৃদয়ে প্রতিফলিত না হওয়া পর্য্যন্ত মানবের মুক্তি-উন্মুখী-গতি স্থগিত থাকে এবং আপন ধর্ম্মে মানব সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহে।

এই অসীম দৃশ্য-রাজ্য সন্দর্শন করিয়া মানব মন স্বতঃই স্রষ্টার জন্য প্রধাবিত হয় এবং সকল রাজ্য তন্ন তন্ন করিয়া আপনার হৃদয়ের অতি নিভৃত স্থানেই তাঁহার দর্শন পায়। তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মের অপার মহিমাতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া একেবারে স্থির ও গম্ভির ভাব ধারণ করে। ঈদৃশ ভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বলা যায় না। কেবল আপনার ধর্ম্ম কি এই মাত্র সে তখন বুঝিতে পারিয়াছে। ঈশ্বরকে অনুভব করা এবং ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া, আর ঈশ্বরকে লাভ করা, কখন সমান নহে। ব্রহ্মের আয়ত্তাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত মানব সম্পূর্ণরূপ ধর্ম্মে অদীক্ষিত থাকে। ইহা স্বীকার করিলে—স্বীকার করিলে কেন—নিশ্চয় আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা এখনও আমাদের ধর্ম্মে কেহই দীক্ষিত হইতে পারি নাই। ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া দূরে থাকুক, বিশেষ একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে পারিব যে, ধর্ম্ম-তত্ত্বও আমরা অল্পই বুঝিতে পারিয়াছি। এইরূপ স্থলে ব্রহ্মকে পাওয়া যে কত দূরের কথা ইহা না বলিলেও অনায়াসে অনুভূত হয়। আমরা ঈশ্বরের কোন একটী স্বরূপও বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমাদের কথা এখানে উত্থাপিত করাই অন্যায়; কারণ যে সকল মহাত্মাদিগের ধর্ম্ম জীবনের জন্য আজও পৃথিবী গৌরবান্বিত এবং উন্নত, সেই সকল মনীষা

সম্পন্ন লোকদিগের মধ্যেও যখন ধর্ম্মবিরোধী ভাব সকল দেখিতে পাই, তখন আমরা কোন্ ছার? পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত কত সাধকের অভ্যুদয় হইয়াছে, "কত প্রেমিক বৈরাগীর এখানে জন্ম হইয়াছে এবং ঈশ্বরের ভক্তগণ দ্বারা অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য্যও এখানে যথেষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তথাপি অন্ধকার বিবর্জ্জিত ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি কখনও বিস্ফুরণ হইল না। কখনও মানব-ভাগ্যে দুঃখ-বর্জ্জিত সুখ মিলিল না এবং অমিশ্র সত্যে কখনও মানব দাঁড়াইতে পারিল না। কোন মহাত্মাই এ পর্য্যন্ত সেই ভূমা মহান্‌কে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। ইহা বুঝাইবার জন্য আর কিছুরই আবশ্যক করে না, তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিরোধী-ভাব-মিশ্রিত জীবনই সুন্দররূপে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করি-তেছে। সুতরাং প্রকৃতরূপে আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া মানব জীবনে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষ ঘটে না! যুগযুগান্তর ধরিয়া যে সকল কঠিন সাধন ভজন সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, সকলই আংশিকরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, এক ঈশ্বরের জন্য সকল সাধকের হৃদয়ই ধাবিত হইতেছে। সকলের হৃদয়েই সেই একই পিপাসা নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের জীবন কি তাহার পরিচয় দেয়? কোন সাধকের সহিত কোন সাধকের মিল নাই। কার্য্যে, বাক্যে কি জীবনে—প্রত্যেক বিষয় দ্বারাই প্রত্যেক সাধকের স্বতন্ত্র অবস্থা প্রতিপন্ন হইতেছে। এক ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়াও কেন এই স্বতন্ত্রতা? কেন এই পরিবর্ত্তনশীল জীবন? এক বিষয়ের প্রার্থী হইয়াও কেন বিভিন্ন পথে গতি?

সাধনের বৈষম্যাবস্থাই কি ইহার কারণ নহে? ঈশ্বরের অপার মহিমার্ণবে মগ্ন হইয়া যিনি যে পরিমাণে যে বিষয়ের সাধন করিয়াছেন, ব্রহ্মতত্ত্ব সেই পরিমাণে জ্ঞাত হইয়া ঈশ্বরের সহিত তদনুরূপ মিলিত হইয়াছেন এবং জগতেও তদনুরূপ যোগী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কেহ প্রেম, কেহ দয়া, কেহ প্রীতি, কেহ ক্ষমা এইরূপ এক এক বিশেষ ভাবের ভাবুক হইয়া সাধক ঈশ্বর লাভে চেষ্টিত হইয়াছেন এবং জীবনেও কেবল তাহারই ফল প্রত্যক্ষ রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে কেহ কেহ একাধিক সাধন-তত্ত্বে সিদ্ধকাম হইতে পারিলেই আপনাকে এক জন মহা ভক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। ভক্তের এই অহং ভাব হইতেই সত্যের এবং জ্ঞানের দ্বার সাধক-জীবনে রুদ্ধ হইয়াছে। সাধক-জীবনের এই বিরুদ্ধভাব যে কেবল এক জীবনে ঘটিয়াছে, তাহা নহে; সকল সাধকেই বর্ত্তিয়াছে। যখনই মানব ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, যখনই ধর্ম্মপিপাসু হইয়া সেই মহান্ বস্তুর অন্বেষণে জগৎ অতিক্রম করিয়া অবোধ্য অগম্য অসীম অনন্ত রাজ্যে উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়াছে, তখন কোন এক দিক্ দিয়া সেই অমূল্য রত্নের জ্যোতি দেখিয়াছে, না অমনি অহং ভাব হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে একবারে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। দেখুন, কি আশ্চর্য্য, এত কষ্ট ব্যাকুলতার অন্বেষণে যে রত্নের তত্ত্ব মিলিল, তাহা প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই সে আপনাকে আর কিন্তু তদ্বিষয়ে অক্ষুণ্ণরূপে নিযুক্ত রাখিতে পারিল না! তত্ত্ব বুঝা মাত্রই বিশ্বাস হইল, আর কি আমিতো পাইয়াছি। এই যে অহংস্রোতে জীবন ভাসাইল, অমনি সকল তত্ত্বে অন্ধ হইয়া সঙ্কীর্ণ পথে

চির দিনের তরে আবদ্ধ হইল! জগতে ভক্ত জীবনের গতির প্রতিবন্ধকতার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই দেখিতে পাই যে, অন্ধতারূপ কুহকিনীই সাধকের প্রতিবাদিনী হইয়া চলিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই সংক্রামিত অন্ধতা রোগেই সকল সাধকের গমনোন্মুখী ভাব অবরুদ্ধ হইয়াছে। সময়ে স্থানে স্থানে অনুকূলাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও এই অন্ধতাই চিরদিন ধর্ম্মপথের অন্তরায় হইয়াছে। আমরা সাধকগণের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া, অমানুষিক নিস্বার্থের কার্য্য দেখিয়া এবং সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ দেখিয়া অনেক সময় স্তম্ভিত হই এবং বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিতও হইয়া থাকি; কিন্তু তথাপি পূর্ব্বোক্ত কারণের জন্য স্বীকার করিতে পারি না যে, তাঁহারা আপনার ধর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই জানি না, এমন কি সকল বিষয়েই আমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ আছি, ধর্ম্মতত্ত্বের কেবল কিঞ্চিন্মাত্র আভাস বুঝিতে পারিয়াছি, এই মাত্র। সুতরাং তাহাতে সেই বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ-দিগের শক্তি দেখিয়া এবং তাঁহাদের কার্য্যাদি দর্শন করিয়া যে স্তম্ভিত হইব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা যে উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে আমাদের কোন কথাই বলিবার অধিকার নাই। সমস্ত জীবন তাঁহাদের চরণতলে বসিয়া শিক্ষা করিলেও আমাদের আশা নাই, তাঁহা-দের লব্ধ সত্য ও জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারি। ধর্ম্মে মনুষ্যকে কি করে কল্পনায়ও আমাদের সাধ্য নাই, তাহা বুঝিয়া উঠি;— যেমন আহার না করিয়া কল্পনায় কেহ আপনার উদর পূর্ণ করিতে পারে না, সেইরূপ ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও কেহ

কল্পনার বলে ধর্ম্মের ফল লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্মের আস্বাদ কেবল ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝিতে সক্ষম। সমুচিত জ্ঞানে যখন ভগবানের সমস্ত স্বরূপের বিশ্বজনীন ভাব উপলব্ধি হয় এবং তৎ কর্ত্তৃক আত্মা অধিকৃত হয়, তখনই মানব আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ঈশ্বর লাভে সমর্থ হয়। চক্ষু খোলা মাত্রই যেমন আমরা এ দৃশ্যরাজ্যের সৌন্দর্য্যরাশি অনায়াসে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, ঈশ্বরের মহিমারাজ্যে বাস করিতে পারিলেও সেইরূপ আমরা অতি সহজভাবে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারি। বাহ্য দৃশ্য দেখিবার জন্য চক্ষু মেলিতে হয়; কিন্তু অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরকে দেখিবার জন্য আমাদের তাহাও আবশ্যক করে না। সরল অন্তরই অন্তর্য্যামীর সাক্ষাতের প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদের দৃষ্টিকে এক দেশার্থে নিয়োগ না করিলেই আমরা অন্ধতার হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া ঈশ্বরের সহিত অকাট্য-যোগে সংমিলিত হইতে পারি। সত্য, জ্ঞান, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধাদি সমান্তরাল সূত্র গুলির সাহায্যে যদি ঈশ্বরকে ধরিতে পারি, আর সমসূত্রে অবস্থান করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগের গতি ব্রহ্ম-কেন্দ্রাভিমুখী হইবে এবং তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হইয়া সকল বিষয়েই আমা-দিগকে অন্ধতাহীন করিবে। তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বরস নিঃসৃত হইয়া হৃদয়ের সমস্ত দ্বার পূর্ণ রাখিবে। জীবনের এই অবস্থাই প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা এবং ইহাই মানবের প্রার্থনীয়।

কিন্তু এই অবস্থা হইতে আমাদের জীবন কত দূরে অবস্থিত? ধর্ম্ম সম্বন্ধে যখন আমাদের এইরূপ উচ্চ অবস্থা নহে, তখন প্রচার করিব কি? যাহার কিছু মাত্র অর্থ সম্পত্তি নাই, সে যদি

আজ দানপত্র ঘোষণা করে, তবে তাহাকে যেমন বাতুল বলিয়া সমস্ত জগৎ ব্যাঙ্গ করিবে এবং তাহার পরিণাম মিথ্যারূপে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে, আমাদের ধর্ম্ম-প্রচারও কি এইক্ষণ তাহাই নহে ? আমাদের এই এক মহারোগ উপস্থিত হইয়াছে যে, আমাদের যাহা নাই, তাহা এই জগতকে প্রদান করিতে চাই ; হৃদয়ে একটু মাত্র সত্য নাই, কিন্তু বাক্য দ্বারা সত্যের জ্বলন্ত জ্যোতি দেখাইতে প্রয়াসী হই ! নিজের জীবন যাহার জন্য ব্যাকুল নহে কিংবা যাহার অনুশীলন নিজে করি না, অপরকে তাহাতে ব্যাকুলিত করিতে যাই ও অপরকে তাহাতে অভিষিক্ত করিয়া নিজে গুরু হইতে ইচ্ছা করি। নিজ সম্বন্ধে আমরা এতদূর অন্ধ যে, জানি না আপনার হৃদয়ে কতটুকু শক্তি আছে, যাহা অপরের জন্য নিয়োজন করিতে পারি। এইক্ষণ এই বিষম রোগ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের আত্মদৃষ্টি প্রখর করা আবশ্যক হইয়াছে। তাহা না হইলে অচিরে আমাদের অনুকূলাবস্থা পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া বসিবে। বাক্যের দ্বারা কখনও ধর্ম্ম প্রচার হইতে পারে না। যখন যে সাধক প্রচার করিয়াছেন, সকলই জীবনের সঞ্চিত রত্ন দিয়া। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রচার কার্য্য তাঁহাদের জীবনের প্রতি নির্ভর ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্তই তাঁহারা প্রাণের সম্পত্তি দিয়া জগতের দুঃখ দূর করিতে পারিয়াছেন। সেই সময়ে যাহা প্রচার হইয়াছে, বুদ্ধির বলে কি বাক্যের জোরে সহস্র বৎসরেও তাহা হইতে পারে নাই। বাক্যেতে কখনও কখনও জীবনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতে আছে বটে ; কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। উচ্ছ্বাসের ন্যায় তাহার

উত্থান ও পতন। প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিরাম হইয়াছে, দীপ জ্বলিল আর নিবিয়া গেল, কিংবা যাই উত্থান তাই পতন। বাক্যের প্রচার ঠিক এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রকৃত পরিবর্ত্তন ইহাতে সাধিত হয় না। যিনি প্রচার করেন তিনিও সাময়িক উচ্ছ্বাসে এবং যিনি তাহাতে ব্যাকুলিত হন তিনিও সাময়িক উচ্ছ্বাসে,—স্থায়ীত্বভাব কাহাতেই নাই। এই বাক্যের প্রচারও এক সময়ে কার্য্যকরী হইতে পারে, যখন সত্য পথ অভ্যাস দ্বারা অভ্যস্ত হয়; কিন্তু তাহা অতি বহু দূরের কথা। পাপ যেমন সহজেই অভ্যস্ত হয়, পুণ্য অভ্যস্ত হওয়া তেমন সহজসাধ্য নহে। সময়ে ঈশ্বর-প্রেমের ভিখারীগণও যখন প্রচার-ব্রতে ব্রতী হইয়া পুনঃ পৃথিবীর প্রলোভনে পড়িয়া গিয়াছেন, মলিন স্বার্থের নিকট আবার আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছেন, তখন অভ্যাস দ্বারা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হওয়া ও তাঁহার কার্য্যে যোগ দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। যখন যে ধর্ম্ম প্রকৃতভাবে জগতে প্রচারিত হইয়াছে তখনই সংখ্যাতীত নরনারী তাহাতে দীক্ষিত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে এবং জগতেরও যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। সেই প্রকৃত উচ্ছ্বাসে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, মানব তাহা চিন্তা করিতেও অক্ষম। পরে তাহার বিরোধী হইয়া এবং বিকৃতভাবে প্রচার করিয়াও মানব অদ্যাপি তাহার লোপ করিতে পারে নাই। সেই সত্যের কম্পনে যে প্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছে, কখনও যে তাহার বিনাশ হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। সত্য-স্বরূপ হইতে যে সত্য জগতে প্রচারিত হইয়াছে, মানব তাহা বিকৃত করিতে সক্ষম নহে।

প্রচারব্রত তবে কে গ্রহণ করিতে পারে? যিনি ধর্ম্মের আবহ সেই পরাৎপর সারাৎসার ঈশ্বরের আদেশবাণী যে পরিমাণে শুনিতে পান এবং জীবনে তাহা পালন করেন, তিনি সেই পরিমাণে প্রচার ব্রত গ্রহণে সক্ষম এবং জগতের দুঃখও সেই পরিমাণেই হরণ করিতে পারেন। যে সত্য জীবনে লব্ধ হইয়াছে, কেবল তাহাই প্রচারের যোগ্য এবং জগৎও কেবল তাহাই গ্রহণ করে। হৃদয়ের বাহিরের বিষয় লইয়া যখন যিনি যাহা অর্পণ করিতে যান, জগৎ তখনই তাঁহাকে ব্যাঙ্গ করিয়া তাহা প্রত্যর্পণ করে। আমাদের প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত, আমাদের হৃদয়ের কি সম্পত্তি প্রচারের জন্য সঙ্কল্প করিয়াছি। যদি অনাহারে থাকিয়া শূন্যহৃদয় লইয়া কেবল শুষ্কবাক্য সংগ্রহ করতঃই প্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়া থাকি, তবে এখনই কার্য্যের অন্যায় স্মরণ করিয়া ঈশ্বর সমীপে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। যাহা জীবনে লাভ করি নাই, তাহা কি করিয়া জগতে প্রচার করিব? যাহার আস্বাদ নিজেই গ্রহণে অসমর্থ, তাহার ব্যাখ্যা করিয়া লোকের মন কিরূপে আকর্ষণ করিব? কল্পনার জোরে সত্য রাজ্যে কেহই বেড়াইতে পারে না, এবং প্রকৃতরূপে তাহার মধুময় ভাবও জানিতে পারে না।

আর একটী কথা। নিজের পাপ স্মরণ করিয়া যাহার প্রাণ কান্দে না, কি অভাব পূরণে ব্যাকুলতা জন্মে না, জগতের নর-নারীর পাপ যন্ত্রণা দেখিয়া কি তাহার প্রাণ কান্দিতে পারে?—দুঃখ মোচনে ব্যাকুলতা আসিতে পারে? আপনি অসত্যের মধ্যে থাকিয়া নিশ্চিন্তমনে অব্যাকুলিত অবস্থায় রহিয়াছি, আর অন্যের অসত্যতা দেখিয়া প্রাণের দুঃখ দমিত করিতে পারিতেছি

না, ইহা কি আমার স্বাভাবিক অবস্থা ? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা ? আমার এই অস্বাভাবিক কার্য্য দেখিলে জগৎ আরো হীন হইয়া পড়িবে। সত্যের ভাণে অসত্য প্রচারিত হইলে সকলকেই আন্দোলিত করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। যদি বাক্যের বলে ধর্ম্ম প্রচার হইত, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, পৃথিবীর অর্দ্ধেক মনুষ্য আজ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইত। সুধু বাক্যের কায কিরূপ বিষময়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রত্যেকেরই তদ্-বিষয়ে এক্ষণ সতর্ক হওয়া আবশ্যক ; নতুবা সম্মুখের পথ অতি ভয়ঙ্কর ও ভাবীজীবনের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়—বগুড়া।

ওঁ তৎসৎ

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

ব্রহ্মোৎসব।

ব্রহ্মোৎসবই আমাদের জীবন পথের প্রধান সম্বল। সংসারে নানা প্রকার কার্য্য করিয়া আত্মা যখন অলসভাব ধারণ করে, তখন ব্রহ্মোৎসবই সেই অলস প্রাণে, উৎসাহানল প্রদীপ্ত করিয়া দেয়। অনিত্য বিষয় বাসনায় আত্মা মোহগ্রস্ত হইয়া, যখন ঘুমাইয়া পড়ে, তখন এই ব্রহ্মোৎসবই সেই মোহ-গ্রস্থ আত্মাকে জাগরিত করে। আবার যখন অসত্য ও অন্যায়ের আঁধারে নিপতিত হইয়া আত্মা লক্ষ্যহীন হয় এবং সংসার সমুদ্রে পড়িয়া কেবল হাবুডুবু খাইতে থাকে; তখন এই ব্রহ্মোৎসবই

সেই বিপদগ্রস্থ আত্মাকে সত্যলোক প্রদান করতঃ লক্ষ্য স্থান প্রদর্শন করাইয়া দেয় এবং সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে ত্রাণ করিয়া এইরূপ পাপে তাপে বিকারগ্রস্থ যে কলুষ আত্মা তাহারও মহৌষধ এই ব্রহ্মোৎসবই। ব্রহ্মোৎসবেই জীবনের সঞ্চার হয় এবং ব্রহ্মোৎসব করিয়াই আত্মা অক্ষতরূপে অনন্ত পথের যাত্রী হইতে পারে। মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার এবং পাষাণ মন বিগলিত ও উদ্ধত স্বভাব দমিত, এই ব্রহ্মোৎসবের প্রেমামৃতপান করিলেই হইয়া থাকে। জীবনে উৎসব না থাকিলে জীবন যে কত দূর ভারগ্রস্থ ও বিপদপূর্ণ হয় আমাদের বিগত জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উৎসব পূর্ণ জীবন আর উৎসবহীন জীবন এই দুই জীবনের ভাব ও কার্য্য দর্শন করিলে, আমরা এত আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হই যে, আমাদিগকে একেবারে অবাক্ করিয়া দেয়। এই দুই জীবনে এত বিভিন্ন ভাব যে দিবা রাত্রির প্রভেদ তাহার নিকট কিছুই নহে।।

আমরা সাধারণ ভাবে দেখিয়া থাকি বলিয়া ইহার প্রকৃততত্ত্ব বুঝিতে পারি না। আবার মোহাচ্ছন্ন অল্পজ্ঞান লইয়া প্রকৃতভাব জ্ঞাত হওয়া কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সংসারের এমনই বিচিত্রভাব যে কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না, কি করিয়া তোমার পতনের সোপান প্রস্তুত হইতেছে। খুব সতর্ক হইয়া সংসারে কার্য্য করিতে থাক, আর প্রত্যেক বিষয়ে আপনার বিবেচনা লইয়া গমন কর তথাপি দেখিবে কিছু দিন পরে তোমার জীবনের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এমনি অলক্ষিতরূপে জীবন কাঠে ঘুন ধরিবে যাহা কিছুতেই তুমি বুঝিতে পারিবে না। দিনে দিনে তিলে তিলে তোমার সমস্ত

বল ক্ষয় করিয়া জীবন খোসা করিয়া তুলিবে তখন শূন্য হৃদয়ের প্রবল কম্পনে মৃত্যু না হইলে তোমার চেতনার আরম্ভ হইবে। কিন্তু ঘুনের প্রকৃত ঔষধ তখনও খুঁজিয়া পাইবে না। ব্রহ্মোৎসবের অমৃত-বারি বিনা কিছুতেই তোমার ত্রাণ নাই। আর কোন ঔষধে তোমার আত্মার ঘুন মরিবে না কি প্রকৃতরূপে তোমাকে জাগাইবে না। এইটী বুঝিবার জন্য আর কোথাও আমাদিগকে যাইতে হয় না নিজ জীবনের প্রত্যেক বিভাগের প্রতি ঘটনাই ইহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। পূর্ব্বে মনে করিতাম আমরা খুব সতর্ক হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক জীবনের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিলে এবং চিন্তা-স্রোতকে সত্যের দিকে ধাবিত করিলে সংসারে প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা যাইবে ও মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন হইবে কিন্তু আমাদের বিবেচনার মধ্যে যে কি ভয়ানক অন্ধতা অবস্থিতি করিতেছে তাহা বিন্দু পরিমাণেও তখন বুঝিতে পারি নাই। যতই সেই সকল বিষয়ে বিশেষ রূপে আলোচনা করিতেছি ততই তাহার মধ্য হইতে অজ্ঞতা, অন্ধতা কত ভূরি ভূরি বাহির হইয়া পড়িতেছে। অন্ধের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে নিশ্চয় বলিতে পারি আমাদের এই প্রকৃত দুর্ব্বলতাও কস্মিনকালে আমরা জানিতে পারিতাম না। বরং আরও অন্ধ হইতে অন্ধতম কূপে নিমজ্জিত হইতাম। অজ্ঞতা, অন্ধতা লইয়া কেহ কখনও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না আর জ্ঞান দ্বারাও কেহ অন্ধতার ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। সত্য যেমন সত্যের অনুসরণ করে, জ্ঞান যেমন জ্ঞান খুঁজিয়া লয় অন্ধতাও

সেইরূপ অন্ধকারের দিকে টানিয়া লয়। যে পরিমাণে আমাদের জ্ঞান বিকশিত হইতেছে সেই পরিমাণে আমরা নিজের অজ্ঞানতা বুঝিতে পারিতেছি। যতই বয়স বৃদ্ধি হইতেছে, যতই পিতার নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য জীবনকে টানিতেছি ততই আপনার নীচতা, অজ্ঞানতা অন্ধতা দেখিয়া ভীত হইতেছি এবং হৃদয়ের শুষ্কতা দর্শন করিয়া উৎসবানন্দ লাভে হতাশ্বাস হওতঃ মৃয়মান হইতেছি। জ্ঞান সচেতন এবং জীবন উৎসাহ পূর্ণ না থাকিলে স্বার্থপরতা অহংকার ইত্যাদি পাপ-বালুকারাশি, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অলক্ষিতরূপে সংসারের বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া হৃদয়-সরোবর পূর্ণ করিয়া ফেলে এবং যতরূপ দূষিত আবর্জ্জনা দ্বারা সৎপ্রবৃত্তি প্রণালীর মুখ গুলি বন্ধ করিয়া দেয়। তখন সেই বালুকাপূর্ণ হৃদয়ে কখনই ধর্ম্মরূপ শীতল জলের আশা করা যাইতে পারে না।

মরুভূমে থাকিয়া শীতল জল পান করা কত দূর সম্ভব? শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ কর আর সাধ্যানুসারে আপন বুদ্ধির চালনা কর কিছুতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে না। এখানে তোমার বল, বুদ্ধি, কার্য্য করিতে অক্ষম কেবল সেই ঈশ্বর কৃপামাত্র ভরসা। তাহাই তোমার এক মাত্র সম্বল। মরুভূমিতে পথিক-বন্ধু ব্রহ্ম যেমন ঈশ্বর কৃপারূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমার অসহনীয় প্রাণের পিপাসার নিবৃত্তি করিয়া থাকে তেমন এই সংসারেও পাপ পূর্ণ শুষ্ক হৃদয়ে সেই ঈশ্বর কৃপাই বর্ষিত হইয়া সকল প্রকার শুষ্কতার অবসান করিয়া থাকে। আপনার ইচ্ছায় পাপ-দুরিত-অসম্ভব

কথা। পৃথিবীর বালু, পৃথিবীর জঞ্জাল দ্বারা যখন প্রণালীর মুখ বন্ধ হইয়া যায় তখন কি প্রবল বেগধারিণী স্রোতস্বিনী আপনার বলে সেই সামান্য বাধাকে অতিক্রম করিতে পারে? বর্ষার প্রবলোচ্ছ্বাস ব্যতিরেকে কি তাহার সেই জঞ্জাল অপসারিত হয়? ইহা যেমন হয় না সেইরূপ ব্রহ্মোৎসবে প্রেমপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া জীবনকে প্লাবিত না করিলে জীবনের জঞ্জালও ভাসিয়া যায় না। উৎসব এই জন্য আমাদের সঙ্গের সঙ্গী। আমরা এই উৎসবকে কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। উৎসব হীন জীবন লইয়া বাস করা আর অন্ধকার গৃহে সর্পের ক্রোড়ে শায়িত থাকা উভয়ই তুল্য। উৎসব আছে বলিয়াই এ জীবন এত দিন রহিয়াছে। যে টুকু চেতনা যে টুকু বোধ আছে তাহা কেবল এই উৎসবের জন্য। জীবনের যে সকল অভাব দেখিয়া আজ কান্দিতেছি ইহাও উৎসবের কৃপায় তাহা না হইলে কোন্ অন্ধতমষাচ্ছন্ন অবস্থায় আজ অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিতাম কে বলিতে পারে? পূর্ব্বে যে জীবনে অতি অল্পমাত্র অভাব বোধ ছিল আজ দেখি আমার সেই জীবন কেবলই অভাবময়! অভাব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। অসীম জ্ঞানের নিকট আমি একটী ক্ষুদ্র বালুকণা হইতেও হীনা ও দীনা। আমার নীচতার কোন সংজ্ঞা এ পৃথিবীতে আছে কি না তাহাই খুঁজিয়া পাইলাম না। বাস্তবিক ব্রহ্মোৎসবে এই ভাবটী অতি পরিষ্কাররূপে ভোগ করিয়া দেখা যায়। অভাব বোধ হওয়াই জীবের মুক্তির প্রথম সোপান। অভাব বোধ না হইলে এজন্মে তাহার কখনও

মোচন হয় না। ব্রহ্মোৎসবের এত গুণ এত শক্তি থাকিতে কেন আমরা নিকৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছি? আমাদের পক্ষে কি উৎসব কৃপণ-হস্ত হইয়াছে? আমাদের জীবন অপবিত্র বলিয়া কি এই নির্ম্মল বিশুদ্ধ ব্রহ্মোৎসবের নামে কলঙ্ক অর্পণ করিতে পারি? কখনই না। উৎসবে কি ধন লাভ হয়, কি অভাব তিরোহিত হয় ইহা কি আমরা জীবনে প্রকৃতরূপে সন্দর্শন করিয়াছি? আজ উৎসব সম্বন্ধে যতগুলি কথা বলিয়া ফেলিলাম ইহা কি আপন জীবনের পরীক্ষিত সত্য? এত ধন এত সম্পত্তি জীবন লব্ধ হইলে আজ কিসের দুঃখ ছিল? এত সম্পদ যাহাদের তাহাদের মধ্যে কি আর কোন প্রকারেরই কষ্ট যন্ত্রণা থাকিতে পারে? অসীম অনন্ত রাজ্যের ধন যাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে এ ক্ষুদ্র পৃথিবীতে তাঁহারা কিসের কাঙ্গাল? স্বর্গীয়-রত্ন যাঁহাদের হৃদয়ের অভাব পূরণ করিয়া থাকে তাঁহাদের আবার কামনা কি? স্বীকার করিলাম আমরা এ সকল অমূল্য সত্য উৎসবে পাই নাই, কিন্তু আমাদের জীবনের পরীক্ষিত সত্য নয় বলিয়া কি এই পরম সত্যকে আজ মিথ্যা বলিব? আমরা সংসারের অতি হীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছি, এই হীন মলিন স্থানে থাকিয়া, অপবিত্র হৃদয় লইয়া কি সেই ব্রহ্মোৎসবে যোগ দেওয়া যায়? কি পিতার দান গ্রহণ করা যায়? আমাদের হীনতার জন্য আমরা লাভ করিতে পারি নাই কিন্তু তাই বলিয়া পিতার উৎসবের অপমাননা হইতে পারে না। উৎসবে জীবন্তভাব নিজে লাভ না করিলেও অনেক সাধক লাভ করিয়াছেন ইহা শুনিয়াছি ও জীবন্তরূপে ইহা বিশ্বাস করি।

যাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে করি তাহা বলিতে কেন কুণ্ঠিত হইব? নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইলেও ইহার অন্যথা মনে স্থান দিতে পারি না। এবার নববর্ষোৎসবের মধ্যে এই একটী বিশেষ ভাব হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিলাম যে এত দিন ইচ্ছা সম্বন্ধে যাহা ঠিক করিয়াছিলাম তাহা ভ্রম-পূর্ণ। সেই ইচ্ছা-স্রোতই যেন আমাদিগকে এত লাঞ্ছনা দিয়াছে। চলিতে চলিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া যাওয়া কি অন্য পথে হেলিয়া পড়া সমস্তই যেন তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ইচ্ছার ভাব এই যে আপনার ইচ্ছা সেই পিতার সহিত মিলিত করিয়া কার্য্য করিব এবং আমার ইচ্ছা যখন তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবে তখনই আমি সিদ্ধকাম হইব ও প্রার্থিত ফল প্রাপ্ত হইব। এই বিশ্বাস লইয়াই এত দিন চলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম এবং অজ্ঞাতসারে এ মতের বিষময়ভাবে ডুবিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্বও বিস্মৃত হইয়াছিলাম। এই জন্যেই এত দিন বুঝিতে পারি নাই ইহার মধ্যে কি ভয়ানক ভাব লুক্কায়িত আছে। স্থূল দৃষ্টিতে এই মতের অনিষ্টকারিণী শক্তি মোটেই বুঝা যায় ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী না হইলে ইহার খণ্ডন হয় না। অহঙ্কার স্বার্থপরতা এখনই গুপ্তভাবে এই ইচ্ছা স্রোতে মিশিয়া থাকে যে তাহা বুঝিয়া চলা সামান্য জ্ঞানের কার্য্য নহে। পরের সুখের জন্য একটী কার্য্য সম্পন্ন করিলাম, অন্যের কষ্ট যন্ত্রণা দর্শন করিয়া আর স্থির হইয়া থাকিতে না পারিয়া আপনার কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহার সেই যন্ত্রণা নিবারণের জন্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তথাপি আমি পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্তি পাইলাম না। আমিত্বের

গুপ্ত অস্ত্র অতি প্রচ্ছন্নরূপে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার এই অনুষ্ঠিত কার্য্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া উড়াইয়া দিল ফল হইতে কর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া দিল। আমিত্বের ভাবকে মনে অধিকার প্রদান করিলেই তাহা হইতে স্বার্থফল উৎপন্ন হইবে এবং প্রত্যেক কার্য্যেই আমাকে প্রতারিত করিয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিয়া দিবে। এমন অনেক কার্য্যের ফল নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যাহা পূর্ব্বে ঈশ্বরের আদেশ মনে করিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। প্রথম কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় মনে করিলাম আমার এই কার্য্যের যে ইচ্ছা তাহা নিশ্চয়ই পিতার ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়াছে, কারণ ইহাতে আমার কোন স্বতন্ত্র স্বার্থ নাই। কিন্তু কার্য্যটী শেষ হইতে না হইতেই দেখি আমার ইচ্ছা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত না হইতেই তাহা সংসারের কুটিল পথ আশ্রয় করিয়াছে। আপনার শক্তি দেখিয়া, প্রশংসা শ্রবণ করিয়া এমনি দিশাহারা হইয়া গিয়াছি যে তখন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে কতই কৃতার্থ মনে করিতেছি। পৃথিবীর প্রশংসাধ্বনি, আত্মার বাসনা লইয়া আমি তখন এত দূর জড়িত হইয়াছি যে আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। যখন কার্য্যটী শেষ হইয়া গেল, আমার অবিনীত মস্তক আরও দশগুণ স্ফীত হইয়া উঠিল, অহঙ্কারে আত্মা ভীষণভাব ধারণ করিল। তখন আর একটী বিরোধী স্বার্থ আসিয়া সেই উন্নত মস্তকে সজোরে আঘাত করিল, সেই আঘাতের নিপীড়নে যদি চৈতন্য উদয় হইল তবে অনুতপ্ত হৃদয়ে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে স্বেচ্ছাচারীতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করিলাম; নতুবা পুণ্যের বিরুদ্ধে, পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গমন করিয়া নরক কুণ্ডে নিপতিত হইলাম। এইরূপ আপন ইচ্ছায় চালিত হইয়া অসংখ্যবার প্রতারিত হইয়াছি। এইক্ষণ দেখিতেছি আপন শব্দ যোগ থাকাই মহা অনিষ্টের কারণ। "আপন" বলিতে যে সংসারের স্বার্থের দুর্গন্ধভাব নির্গত হয়, তাহাই আমাদিগকে লক্ষ্য হইতে চ্যুত করিয়া থাকে। এই দুর্ব্বলতা দ্বারাই আমরা অলক্ষিতরূপে সত্য রাজ্য হইতে স্খলিত হইতেছি। নিজ ইচ্ছা রোধ করিয়া, সেই ইচ্ছাময়ের বিশ্ব-জনিন ইচ্ছার চলিতে না পারিলে প্রকৃতরূপে ইচ্ছার কার্য্য বুঝিতে পারিব না। সংসারে যত অনৈক্য ভাব, যত মতের অমিল, ও যত মতের সৃষ্টি, ইহা সকলই ইচ্ছার বিষমতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞান অনুসারে মানবের ইচ্ছাকার্য্য করিয়া থাকে, তাহাও আবার অবস্থা বিশেষে নানা প্রকারে রূপান্তরিত হয়। সাধারণতঃ ইচ্ছার দুইটী ভাগ, সর্ব্বদা আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। একটীর গতি সৎ বিষয়ে আর একটীর গতি অসৎ বিষয়ে। অবস্থা ও কার্য্যবিশেষে ইহা আবার অনেকবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। সেই সকল ক্ষুদ্র অংশ বাদ দিয়া, এস্থলে কেবল প্রধান দুই বিষয় বলিতেছি। সৎ ইচ্ছা অথবা মানবের মৃত্যুর সোপান, ইহা দ্বারা একটী মিথ্যা রাজ্যের সৃষ্টি হয়। সেই মিথ্যা রাজ্যের কার্য্যপ্রণালী সকলই ভেল্কি পূর্ণ। ভেল্কি কি তামসা দেখিবার জন্য মানব মন কত ব্যাকুল ও ব্যগ্র হয়। প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য তাহার এক আনাও হয় কি না সন্দেহ। এই জন্যই বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল অসত্যেরই প্রাদুর্ভাব দেখিতেছি।

যিনি অবাধে আপন অসৎ ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন তাঁহারই আজ সংসারে প্রশংসা। অথচ প্রত্যেক দিন যে কত শত শত লোক এই ভেল্কি দ্বারা প্রতারিত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। এই ভেল্কির পরিণাম ফল হইতে যে গরল উৎপন্ন হইয়া সমস্ত সংসার ধ্বংশ করিতেছে, ইহা কেহ দেখিয়াও দেখিতেছেন না। জীবনে এই অসত্য ইচ্ছার তীব্র যাতনা উপভোগ করিয়াও আমরা তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হইতেছি না। অতি অল্প অল্প করিয়া এই অসত্য রাজ্যের এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে এখন দেখিয়া আশঙ্কা হয় এই অসৎ বাসনা বুঝি সমস্ত সংসারকে গ্রাস করিয়া ফেলে। অসৎ ইচ্ছার যেরূপ বিস্তার হইয়াছে, ইহাতে যেরূপ ভীষণ আঁধারের বিকট মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইতেছে, সৎ ইচ্ছার সেরূপ নির্ম্মল, শুভ্র, স্থির-জ্যোতি আজও বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, সৎ ইচ্ছা এখনও স্বর্গীয় অমর রাজত্বের শোভা আনিতে পারে নাই তাহার কারণ সৎ ইচ্ছা এখনও অমিশ্র খাঁটি ভাব প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার মধ্যে কত ভ্রম, কত দুষিত ভাব মিশ্রিত রহিয়াছে, যে জন্য সেই চিরস্থায়ী সৌন্দর্য্য বিকাশ হইতে পারে না। ধর্ম্ম বলিয়া আজও কত শত অধর্ম্ম কার্য্য অনু-ষ্ঠিত হইতেছে। ইচ্ছা এবং বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কত কার্য্য গুপ্তভাবে সম্পন্ন হইতেছে। এইরূপ অসত্য মিশ্রিত সত্য লইয়া আমরা কিরূপে স্থির সত্য-প্রতিভা লাভ করিবার আশা করিতে পারি? আমার ইচ্ছা সৎ হইলেও তাহা অসম্পূর্ণ এবং কালে নিজ স্বার্থ জড়িত হইয়া তাহা ভ্রমপূর্ণ

হইতে পারে। আমার জ্ঞানের বিপক্ষে এই ভ্রমপূর্ণ ইচ্ছা কার্য্য করিয়া আবার আমাকেই ফাঁকী দিয়া ঠকাইতে পারে। এ জগতে অসত্যেরই বৃদ্ধি, অন্যায়েরই আধিপত্য, এবং অন্ধকারেরই গাঢ়তা দেখিতেছি। আমি ইচ্ছা করিলেই পাপ করিতে পারি কিন্তু ইচ্ছা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি না। ইচ্ছা করিলেই এই মুহূর্ত্তের মধ্যে জগতের সৌন্দর্য্য, জগতের আলো আমার নিকট বন্ধ করিয়া দিতে পারি, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া এ সকল দর্শন করিতে পারি না। অন্যায়ের ক্ষমতা আমার হস্তে, পুণ্যের ক্ষমতা ঈশ্বরের হস্তে। মানব অধিকাংশ কার্য্যই আপনার বলে করিয়া থাকে এবং অবশিষ্ট যাহা ঈশ্বরের বলে করে বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রথম ঈশ্বরের বলেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারে না। অতি অল্পেতেই আপনার বল প্রয়োগের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে। যাই তাহার মধ্যে আপনার বল সংযুক্ত করে, অমনি তাহা ছিন্ন হইয়া মলিনভাবে কারণ হইতে খসিয়া পড়ে। আমরা এই সারা জীবনের মধ্যে কয়টী কায আপনার ইচ্ছা বিস্মৃত হইয়া করিয়াছি? বোধ হয় একটী কার্য্যও এমন পাইব না যাহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্পন্ন করিয়াছি। সুতরাং অসত্যের আধিপত্য ভিন্ন আর কি দেখিব? অসত্য কার্য্যে সংখ্যা নাই, আর যথার্থ কাযের একটীও সম্পূর্ণ নহে, এরূপ স্থলে কি করিয়া সত্যের জয় দেখিব? অসৎ ইচ্ছা প্রবাহিত হইয়া অসত্য জঞ্জাল রাশিকৃত করিয়াছে। এইক্ষণ যে দিকেই চাই কেবল অন্ধকারের ভীষণ

ভাব আসিয়া হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া ফেলে। অন্যায় ইচ্ছা কেবল ভ্রম পথেই লইয়া যায়। আমরা কিছুতেই তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না। আপন ইচ্ছাকে সেই অনন্ত ইচ্ছাময়ে যুক্ত করিয়া এই অভাব হইতে ত্রাণ পাইব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু এবার দেখিতেছি তাহাতেও নিস্তার নাই। ইচ্ছা তাঁহাতে সমর্পণ না করিতেই তাহা দূষিত করিয়া ফেলিতেছি। অপবিত্র হইলে কি করিয়া সে ইচ্ছা তাঁহাকে ধারণ করিবে? আমরা যখন একটী ইচ্ছাকেও নিখুঁত অবস্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে পারিতেছি না, তখন কি করিয়া তাঁহা হইতে বল লাভ করিব? তারের কোন এক স্থান কর্ত্তন করিয়া দিলে কি বৈদ্যুতিক সংবাদ আর পঁহুছিতে পারে? সেইরূপ ইচ্ছার মধ্যে কোন অংশে একটু মাত্র অসত্য থাকিলেও তাহা ঈশ্বরের নিকট পঁহুছিতে পারে না, কিম্বা তাঁহা হইতে শক্তি আনিতে সক্ষম হয় না। সত্যই সত্যকে আকর্ষণ করিয়া লয়। মিথ্যা কখন সত্যের নিকট যাইতে পারে না। আমাদের জীবনে অহঙ্কারের ভাব যে কিরূপ মিশ্রিত রহিয়াছে তাহা ইচ্ছার অনুতে অনুতে বিলক্ষণরূপে দর্শন করিলাম। অহঙ্কার সর্পই আমাদের ইচ্ছাকে দংশন করিয়াছে। সুতরাং সৎ ইচ্ছার প্রধান শত্রুই অহঙ্কার। এক অহঙ্কারই আমাদের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে ও লাঞ্ছনা দিতেছে। ইহার বিষময় ফল এই জন্য আরও বেশী যে অন্যান্য শত্রু প্রবেশ করিতে টের পাওয়া যায়, কিন্তু কার্য্য প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত আর ইহার আগমন বুঝা যায় না। এক ইহার আচরণেই সকল লোক অস্থির তার পর ইহার

যে একটী গুপ্ত চর আছে তাহার উৎপাতে আরও টেকা দায়। সেইটীর কার্য্য আরও অপ্রকাশ্য ও বুঝা কঠিন। তাহার বেশে সকলেই মোহিত হয় ও আনন্দ সহকারে তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া পুষিয়া থাকে। আনন্দ দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে কিন্তু বাহির হয় কালি রাখিয়া। অহংরূপ ইন্ধনে যখন প্রশংসারূপ অগ্নি জ্বালিয়া দেয় তখন জীবনে কি মহাবিপ্লব উপস্থিত হয়। সে মহাকাণ্ড দর্শন করিয়া সকলের প্রাণই ত্রাসযুক্ত হয়। সংসারে আমার বলিয়া কিছু রাখিতে গেলেই ভয়ানক গোল বাঁধিয়া যাইবে। রাজ্যবিপ্লব, সমাজবিপ্লব, বন্ধুবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এইরূপ সকল বাদ বিসম্বাদের মধ্যেই, সকল মনঃপীড়ার মধ্যেই আমার আমিত্ব লইয়া গেল। আমার আমিত্ব থাকাতেই প্রত্যেকের ইচ্ছা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, এবং লক্ষ্যও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। অহংযুক্ত যে অস্তিত্ব ইহা না থাকিলে আর অসামঞ্জস্য চিত্র এ পৃথিবীতে কাহাকেও দেখিতে হইত না। তখন সকল হৃদয় প্রেমের বন্ধনে এক হইয়া যাইত। সকলের কার্য্যই এক উদ্দেশ্যে সংসারে কার্য্য করিত। বিরোধ, অত্যাচার, বিসম্বাদ সকল বিরুদ্ধ ভাবই মীমাংসিত হইত। আমরা আমাদের ইচ্ছাকে মঙ্গলময়ে অর্পণ করিলেই এই সকল বিরোধের নিবারণ করিতে পারি। ইচ্ছাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিব, পরে তাঁহার ইচ্ছায় সংসারে কার্য্য করিব এরূপ হইলে কি আর আমাদের পতনের সম্ভব? জীবনে মলিন স্বার্থযুক্ত না হইলে কে আমাদিগকে ভ্রমে ফেলিতে পারে? অন্ধতা কি অজ্ঞানতা তখনই আক্রমণ করে যখন আমরা নিজের অধীনে থাকি।

হে ইচ্ছাময় পরম পিতা! আজ এই উৎসবে ইচ্ছার যে স্বর্গীয় চিত্র দর্শন করাইলে, ইহা কি আমরা জীবনে সাধন করিতে পারিব? এত দুর্ব্বলতা যাহাদের অন্তরে এখনও বর্ত্তমান, পৃথিবীর মলিন বাসনা আজও যাহাদের হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছে বল নাথ! এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করিয়া তাহারা তোমাতে সকল অর্পণ করিবে? ইচ্ছা, মন পবিত্র না হইলে ত তুমি গ্রহণ করিতে পার না। আমাদের এই অপবিত্র আত্মাকে তুমি কি করিয়া গ্রহণ করিবে? সাধু-দিগের নিকট শুনিয়াছি অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া অতিশয় কঠোর সাধন অবলম্বন করিয়াও যাঁহারা তোমাকে লাভ করিতে পারেন নাই, তোমার মহোৎসবের এক মুহূর্ত্ত সময়ের মধ্যে তাঁহারা তোমাকে লাভ করিয়াছেন। বিশ বৎসর কাল আপনার বল প্রয়োগ করিয়া যাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়া-ছেন আবার তোমার দর্শনমাত্র রাশি রাশি পাপ প্রলোভন অতিক্রম করিয়া অনায়াসে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।

আজ সাহস করিয়াই এই মহোৎসবের আয়োজন করি-য়াছি। যদি তোমার প্রসাদ প্রাপ্ত না হই, যদি তোমাকে পাইয়া জীবনের অসম্ভবনীয় ঘটনা সম্ভবে না আনিতে পারি তবে যে আমাদের এই উৎসব মিথ্যা। তোমাকে লইয়াই এই ব্রহ্মোৎসব তোমার দর্শন না পাইলে কে ইহাকে উৎসব বলিবে? আমরা এক বৎসর কাল কত প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া গমন করিয়াছি, কত প্রকার ইচ্ছাস্রোতে ভাসিয়া তোমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছি; কিন্তু তথাপি তুমি

আমাদিগকে এক দিনের জন্যেও পরিত্যাগ কর নাই, কি তোমার করুণার হস্ত আমাদিগের প্রতি সঙ্কোচ রাখ নাই। যে দয়া বিতরণ করিয়া সেই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছ এবং সকল ভ্রাতা ভগিনীর সহিত সম্মিলিত করিয়া এই মহোৎসবে আহ্বান করিয়াছ সেই কৃপা দৃষ্টিতেই আজ সন্তান-গণের অপরাধ ক্ষমা করিয়া মুক্ত করিবে। চির অভ্যস্থিত কু-অভ্যাসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার পুণ্য পথের পথিক করিয়া দিবে। সংসারের বায়ু সেবন করিয়া যে পাপধূলি হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়াছে, তোমার প্রেম প্রবাহিত করিয়া তাহা ধৌত করিয়া দেও। আজ জীবনের জড়তা নষ্ট করিয়া উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াও দেও। তোমার উৎসব ক্ষেত্র হইতে যেন সকল ভ্রাতা ভগিনী প্রেম, প্রীতি, ক্ষমা ও ভক্তি ফল লইয়া গৃহে ফিরিতে পারি। তোমাকে প্রাণের মাঝে রাখিয়া আবার উৎসবে যেন আসিতে পারি।

ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

সত্য ও ন্যায়।

সত্য ন্যায় মনুষ্যকে এক সম ভূমিতে আনয়ন করে, যে জীবন সত্যরূপ ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়া ন্যায়পথে চালিত হইয়াছে তাহাতেই দেব ভাব স্ফূর্ত্তি পাইয়া স্বর্গীয় ছায়া প্রতি-ফলিত হইয়াছে। স্বর্গের রত্ন মর্ত্ত্যে আসিয়া পরবর্ত্তী শত শত জীবনকে প্রতিভায় বিমুক্ত করিয়া সেই দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে; যে জীবনে যে পরিমাণে সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়,

যাহাতে সেই সাধারণ মূল সত্যগুলি দৃষ্ট হয় তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া দেয় এবং নির্ব্বিশেষভাবে তাহার সহিত মিলিত হইয়া সত্য ও ন্যায়ের জয় জগতে প্রচার করে। উচ্চ নীচ বিচার-কুটিল সংসারের অভক্তি অপ্রেম মলিন মর্ত্ত্য জগতের ঈর্ষা হিংসা যতগুলি বিচ্ছিন্নকর ভাব আছে সমস্ত গুলিই সংসারের দূষিত ভাব হইতে উৎপন্ন; অসত্য ও অন্যায় হইতে জাত বলিয়াই তাহাতে মানব আকৃষ্ট হয় না, কি এক জীবনের সহিত অন্য জীবনের মিলন হয় না। অসত্যের শীতল বাতাস লাগিয়া যে হৃদয় সংযত হইয়া গিয়াছে তাহাতে শত শত পাপ কঙ্কর উৎপন্ন হইয়া ভয়ানক বিপদের আকর হইয়া থাকিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি! যেখানে ন্যায়ের প্রসারণীয়তা নাই, সত্যের আধিপত্য নাই জীবের বিমুক্তাবস্থা কিরূপে সেখানে থাকিতে পারে? সেখানে সহানুভূতি, ভালবাসা প্রীতির পরিবর্ত্তে দ্বেষ হিংসা অপ্রীতি কঙ্কর উদ্গীরণ দ্বারা মনুষ্যসমাজ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া অশান্তির আগার হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী কথা। পার্থিব জগতে বৈদ্যুতিক শক্তি যেরূপ প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে মনুষ্য জগতে সত্য ও ন্যায় ঠিক সেইরূপ হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে কার্য্য করিয়া থাকে। এ শক্তি, শক্তি অনুসারেই চালিত হয় এবং ক্ষমতানু-যায়ী বিস্তারিত হইয়া স্বর্গীয় শোভা বিস্তার করে ও আপনার দিকে টানিয়া রাখে। যেখানে এই ভাবের বিকাশ দেখি হৃদয় সেই স্থানেই নুইয়া পড়ে ও তাহার দিকে ক্রমে অগ্রসর হয়। হৃদয় যে সত্য সূত্রের সহিত মিলিত হয় সেই জাতীয় বৈদ্যুতিক আলো আসিয়া তাহার উপর কার্য্য করে ও সেই

নিদ্রিত তন্ত্রীকে জাগরিত করে এবং জড়তা দূর করিয়া অন্যান্য তন্ত্রীগুলি বাজাইয়া দেয়। কি পার্থিব জগৎ কি আধ্যাত্মিক জগৎ উভয় রাজ্যেই এই শক্তি সমানভাবে করিয়া থাকে। পার্থিব জগৎ না বুঝিয়াই সেই স্বধর্ম্মাকৃষ্ট আর চৈতন্যশীল জগৎ বুঝিয়াও সেইরূপ স্বধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে নাই। শত শত মনীষা সম্পন্ন হৃদয়বান্ ব্যক্তি এই অপ্রকৃত স্রোত রুদ্ধ করিতে যত্নবান হইয়াছেন, জীবনের সমস্ত বল নিয়োজন করিয়া প্রতিকূল ঘটনার সহিত যুঝিয়াছেন, তথাপি সম্পূর্ণরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মনুষ্যসমাজ পার্থিব বলের কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়াও কার্য্যতায় তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতা দেখাইতে অদ্যাপি সক্ষম হয় নাই. ইহা বড় লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। ভাবিতে গেলে হৃদয় স্তম্ভিত হয় মনুষ্য যেমন অতি সুপথে চালিত হইয়া মর্ত্তে অমরাবতীর সৃষ্টি করিতে পারে আবার প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছাচারীতার দ্বারা প্রকৃতির বল বিনষ্ট করিতেও সক্ষম। এই জন্যই সংসারে এত বিরোধী-ভাব প্রবেশ করিয়া মানবের সাধারণ ধর্ম্ম শিথিল করিয়া দিয়াছে। জল যেমন জলের অনুগত এবং অবিশ্রান্ত গতিতে তাহার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য মানব কেন সেরূপ নয়, মানব কি মানবের সহিত সংমিলিত হইয়া আনন্দ পায় না, আরাম পায় না? তাহা কখনই হইতে পারে না; মিলনে সুখ নাই শান্তি নাই, কেহ ইহা স্বীকার করিতে পারেন? এ আকর্ষণ নিজের গুণে নহে, নিজের বিচার কি বিবেচনা সাপেক্ষ নহে। ইহার মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি নিহিত আছে। সেই মহান্ বলই প্রতি নিয়ত মনুষ্য হৃদয়ে কার্য্য করিতে

থাকে। আমরা তাহার বিরোধী হইয়া সেই শক্তিকে আপন পথে চলিতে দেই না। সাংসারিক স্বার্থের জন্য কি বোধ হীন ইচ্ছা পূরণের জন্য সেই সাধারণ অধিকার লোপ করিয়া দেই। আমাদের স্বেচ্ছচারীতা মুলক যে স্বাধীনতা তাহা হইতে অপ্রকৃত যন্ত্রণার অঙ্কুর অঙ্কুরিত হয়, সে অঙ্কুরকালে শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া দুর্গন্ধ পুষ্প ও বিষময় ফল প্রসব করে এবং সমুদায় সংসার বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। মনুষ্যের স্বাধীনতা সৌন্দর্য্য কত উচ্চ দরের তাহা আমরা আদৌ বুঝি নাই অথবা তাহার জ্যোতি কখন হৃদয়ে প্রতিভাত হয় নাই আমরা বুদ্ধির বলেই হউক আর কৌশলেই হউক অথবা যে প্রকারেই হউক আপন স্বার্থ সিদ্ধি করিতে পারিলেই আমি একজন প্রসিদ্ধ স্বাধীন লোক হইলাম এবং নিজের স্বার্থের সহিত কত লোকের স্বার্থের সংঘর্ষণ হইল, কত আয়োজন হইল তাহারা কিছুতেই আমার স্বার্থলোপ করিতে পারিল না; এজীবনে নিজের বলে কত সংগ্রাম উত্তীর্ণ হইলাম, কত লোকের বিজয় নিশান এ শক্তি চালনে হরণ করিলাম আমার বাহার কে দেখে! বাস্তবিক আমরা এইরূপ মহত্ব লইয়াই আজ কাল আমরা আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি, অধীনতার পাশ গলায় জড়াইয়া মনে করিতেছি, না জানি কি অমূল্যহার কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি! অসত্য ও অন্যায়ের প্রহেলিকার মধ্যে নিপতিত হইয়াই কি আমাদের এই বিকৃত অবস্থা ঘটে নাই? সত্য ও ন্যায় ব্যতীত মনুষ্য কখন স্বাধীন ভাব বুঝিতে পারে না এবং আপনার অধিকার পাইতে পারে না। সত্যের জ্যোতি ছাড়িয়া অন্যায়ের

আশ্রয় গ্রহণ করতঃ যতই মানব স্বাধীন হইতে যায়, সুখ শান্তির ক্রোড়ে থাকিতে চায় ততই অসত্য, অন্যায়ের কুটিল শৃঙ্খল আসিয়া তাহাকে বিভীষিকাপূর্ণ সংসারে এবং অশান্তি দুঃখপূর্ণ কুটীরে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। সেই কুটীল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াই মানব উত্তরোত্তর অধীনতার ফাঁসে যাইয়া পড়ে। ফাঁস যখন অত্যন্ত চাপিতে থাকে তখন তাহার মস্তিষ্ক বিলোড়ন হইয়া প্রকৃত জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়; এইরূপ করিয়া সত্যরাজ্যের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট লুক্কায়িত আছে। ন্যায়ের তীক্ষ্ণ ধারও কমিয়া গিয়াছে এবং তৎসঙ্গে কর্ত্তব্য বুদ্ধির অত্যন্ত লাঘব ঘটীয়াছে। আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নকর ভাব এত প্রবেশ করিয়াছে যে একের সহিত অপরের প্রাণের আকর্ষণ নাই, আকর্ষণ হইবে কিসে? হৃদয় বলিয়া একটী পদার্থ থাকিলেত তাহা হইতে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ছুটিয়া অন্য হৃদয়ে চলিবে। আসলই যখন আমাদের হৃদয়ে নাই তখন আমাদের ক্রিয়া দর্শাইবে কোথায়, ধর্ম্মরাজ্যের সম্বল যাহা তাহা আমাদের কিছুই নাই, সত্য নাই, ন্যায় নাই, প্রীতি নাই, ভক্তি নাই, স্নেহ নাই, ক্ষমা, দয়া, সরলতা, স্বাধীনতা প্রেমাদি ইহার কিছুই নাই তখন কোন ভাবে সকলে সংযুক্ত হইবে? বর্ত্তমান যাহা আছে সে সকলই আমাদের বিচ্ছিন্নের কারণ মিলনের কিছু নাই বলিলেই হয়। যেটুকু আছে তাহা না থাকিলে আমরা যে একজাতীয় জীব তাহাই বুঝিতাম না, এবং কেহই কাহাকে চিনিতাম না। যে একটু সংযুক্ত ভাব আছে, পরস্পর সামঞ্জস্যনীয় কার্য্য আছে, আমরা যে প্রকৃতির বল একেবারে বিপর্য্যয় করিতে সক্ষম হই নাই তাহারই কেবল

নিদর্শন রহিয়াছে। প্রকৃতির শক্তি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে প্রাণ বাঁচে না, তাই তাহাকে ত্যাগ করিতে পারি নাই অন্যথা কি করিতাম কি হইত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেই অনেকটা বোধগম্য হয়। আমরা স্বেচ্ছাচারীতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছি স্বভাবের বিরুদ্ধে যাইতে ক্ষমতায় যতদূর কুলায় তাহারও ত্রুটি করি নাই তবে আর কি চাই, ইহার বেশী স্বাধীন বলের কি পরিচয় হইতে পারে, বিরুদ্ধপথে যাইতে অন্যান্য সকল প্রাণী হইতে আমরা বিশেষ দক্ষ হইয়াছি। কপটতার আবরণে এরূপ মণ্ডিত হইতে পারি যে অন্যের সাধ্য নাই তাহা ছিন্ন করিয়া ভিতরের জিনিষ দেখিতে পারে।

ঠিক্ বিপরীত! মঙ্গলময় পিতা মনুষ্যকে যে জন্য স্বাধীনতা দিয়াছেন আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে যাইতেছি। কাজেই আমাদের মধ্যে জাতীয় ভাব নাই, প্রাণের আকর্ষণও নাই যত দিন না আমরা আপনার সত্য বুঝিব এবং তাহার প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইব তত দিন সাম্য ভাবাপন্ন মানবীয় ভূষণাদি কখনই আমাদের মধ্যে থাকিবে না। ধর্ম্মরাজ্যে সত্য ও ন্যায় লাভ করিতে পারিলে অন্যান্য ভূষণগুলি অতি অনায়াসেই সংগ্রীহিত হয়। যে জীবনে সেগুলি সংগ্রীহিত হইয়াছে তাহার জীবন সংসারে নূতন এবং সে জীবন সংসারের মলিন ভাব হইতে পৃথক থাকে, আপন জ্যোতিতে সকলকে মাতাইয়া তোলে। এই শোভনীয় দুঃখপূর্ণ সংসারও সেইরূপ জীবনের আবির্ভাবে আবার জাগ্রত হয় এবং নববলে বলীয়ান হইয়া নৈসর্গিক শোভা ধারণপূর্ব্বক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। এই শ্রেণীর জলন্ত জীবনই পৃথিবীকে প্রকৃত গতিতে চালিত

ক্ষরে অপ্রাকৃত স্রোতের শত সহস্র মুখবন্ধ করিয়া অনুকূল স্রোত পুনঃ সঞ্চার করত পবিত্র শান্তি প্রবাহিত করে। ইহারাই ঈশ্বর সেবক ও ভক্তনামে অভিহিত হইয়া সকলের পূজনীয় হন ও নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান। সেই ধর্ম্মাত্মা ও মহাত্মাদিগের জীবন পাঠ করিলে আমরা অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারি। সাধুভক্তগণের মুখে প্রেমময়ের প্রেমছায়া প্রতিফলিত হইয়া এক আশ্চর্য্য জ্যোতি বিকির্ণ হইয়া থাকে যাহা দেখিলে নয়ন স্থির হইয়া যায় তখন দেখি তিনি জগতস্থ সকলের আত্মীয়। প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া দীনদুঃখী ভ্রাতাভগিনীর সহিত প্রেমবন্ধনে সংযুক্ত হইয়া পুণ্য রাজ্যে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন কাহাকেও ছাড়েন না। সকলের দুঃখে বিগলিত হইয়া ভ্রাতৃভাবে দীন দরিদ্র সকলকেই আলিঙ্গন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্যের ফলপ্রদান করেন, তাঁহারা নিত্য নিত্য পিতার নিকট স্বর্গীয় ফলপ্রাপ্ত হইয়া তাহার স্বাদ বুঝিয়াছেন এবং হৃদয়ও তাহাতে পুষ্ট হইয়া অপার্থিব জ্যোতি ধারণ করিয়াছে যে জ্যোতি লাভ করিয়া সাধারণ মনুষ্য হইতে তাঁহারা সতন্ত্রাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তখন আর তাঁহাদের মধ্যে ভ্রম নাই অন্ধকার নাই এবং নৈরাশ্যের শুষ্কতা ও কঠিনতা নাই। জ্যোতি স্বরূপ হইতে জ্যোতি আসিয়া তাঁহাদের হৃদয় আলোকিত হইয়া থাকে প্রাণ স্বরূপ সেই মহানশক্তি হইতে সকল সময়ই বল আসিয়া থাকে তখন পৃথিবীর ভ্রান্তিতে কেন তাঁহারা পড়িবেন, সংসারের কপটজাল নিশ্চয় সেখানে ছিন্ন হয়, যেখানে পবিত্র স্বরূপের শুভ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সেই পরম শক্তি হইতে যাঁহারা

শক্তিলাভ করিয়া থাকেন পৃথিবীর অসার প্রলোভন তাঁহা-দিগের কি করিতে পারে সকল বিঘ্ন বিপত্তি অতি সামান্ত তৃণের ন্যায় তাঁহাদিগের নিকট প্রতীয়মান হয়, আমরা যে পথ অতি দুরূহ মনে করিতেছি এবং কত চেষ্টায় তাঁহার নিকট যাইয়া আবার পদস্খলিত হইতেছি, অনায়াসে সেই পথ আশ্রয় করিয়া অতি গম্ভীরভাবে ধার্ম্মিকগণ অটলিত পাদ বিক্ষেপে উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে অধিরোহন করিতেছেন। ধর্ম্ম পথ সাধুর নিকট অতি সরল, অতি স্বচ্ছ কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা তাহাতে নাই পাপীর নিকট সেই পথই কঠিন বন্ধুর ও বিপদসঙ্কুল। পাপী পদে পদে ভয় পায় প্রতি মুহূর্ত্তেই আশঙ্কায় অস্থির হয়, কখন কোন্ শত্রু আক্রমণ করে, কখন কোন্ বিপদ আসিয়া মস্তকে চাপিয়া পড়ে, সে সর্ব্বদাই এই জন্য সশঙ্কিত থাকে। অসত্য ও অন্যায়ের অন্ধকারে মনুষ্য যখন ডুবিয়া যায় তখন এই অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। আমাদের এই দুরাবস্থা স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বদা সাবধানে চলা উচিত। কিসে এই শোচ-নীয় অবস্থা দূর হইতে পারে, কিসে অসত্য পাশ ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইতে পারি, পরিত্রাণের পথ আশ্রয় করিতে পারি, প্রতিনিয়ত এই জন্য পরিশ্রম করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে।

সৎসঙ্গ, সদালাপ, সৎগ্রন্থ পাঠ, এবং আদর্শ জীবনের বল অধ্যবসায়ের সহিত জীবনে ধারণ করা নিজ হৃদয়ের দুর্ব্বলতার জন্য প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট বল প্রার্থনা করা এই কয়েকটী পথ আশ্রয় করিতে পারিলে অতি দৃঢ়তা পূর্ব্বক তাহা ধরিয়া রাখিতে পারিলে এই দুর্গন্ধময় পঙ্কিলস্থান হইতে উদ্ধার পাইতে পারি। এক একটী অন্যায়ের জন্য তীব্র অনুতাপ আবশ্যক।

আপনার অন্তরের লুক্কায়িত ঘৃণিত ভাব পরিহারের জন্য অন্তর হইতে প্রার্থনা উত্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত পিতার চরণে পড়িয়া থাকিতে হইবে। তাহা হইলে আপনার আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া সুখী করিতে পারিব। সত্য ন্যায়ের আশ্রয়ে সর্ব্বদা থাকিতে পারিলে কপটতা, অপ্রীতি, অপ্রেম, অভক্তি, অধৈর্য্য ইহা কিছুই থাকিতে পারে না ঈশ্বর-ভক্ত আত্মা সংসার হইতে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে সংসারের অতীত দিব্যরাজ্যে অবস্থিতি করিয়া ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত পূর্ব্বক বিপুলানন্দ উপভোগ করে।

অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়।

দৃঢ়তা।

দৃঢ়তা মানব জীবনের অমূল্য ভূষণ। দৃঢ়তার দ্বারাই মানব, মানব পদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞান বিকাশ হইতে আরম্ভ হইলেই সত্যের আলোক সমস্ত জগতে বিকীর্ণ দেখা যায়, কিন্তু দৃঢ়তা না জন্মিলে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থির হওয়া যায় না, সত্যের যে নির্ম্মল জ্যোতি তাহাও স্থিরতর রূপে হৃদয়াভ্যন্তরে ধারণা করা যায় না। সত্যের আলোক দেখা মাত্র যদি হৃদয়ে দৃঢ়তার প্রাচীর প্রস্তুত না হয়, তবে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মবীজ জীবনে অঙ্কুরিত হওয়া অসম্ভব। সত্য বুঝিতে পারিয়া ও যে মানবগণ সতত অসত্য পথে বিচরণ করিয়া থাকে এবং ধর্ম্মের মূলসত্য জানিতে পারিয়া ও যে মনুষ্যগণ অহর্নিশি অধর্ম্ম পঙ্কে লিপ্ত থাকিয়া মানবীয় ক্ষমতা হইতে স্খলিত হয়, তাহার মূল

কারণ দৃঢ়তার অভাব। দৃঢ়তা হীন হইলেই মানব প্রকৃত পশুর ভাব প্রাপ্ত হয়। দৃঢ়তার জন্যই মনুষ্যগণ উন্নতি পথে অবিশ্রান্ত ভাবে গমন করিয়া জীবনে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে ও পশুগণ হইতে পৃথক হইয়া থাকে। আমরা যে আধ্যাত্মিক ভাবের জন্য পশু হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছি সেই আধ্যাত্মিক ভাবে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রধান সোপান ও প্রধান সম্বল সত্য ও দৃঢ়তা এই দৃঢ়তা লাভ করিতে না পারিলে মানব আপন পদবী লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম সুতরাং পশু ভাব হইতে উত্তীর্ণ কেবল দৃঢ়তার বলেই হওয়া যায়।

সত্যের জ্যোতি পড়িয়া যখন জগৎ সংসার আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত হয় তখন অতি গম্ভীর অথচ অব্যক্ত ধ্বনি সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্য দিয়া শব্দায়মান হইতে থাকে, সেই গম্ভীর অব্যক্ত মধুরধ্বনি হইতে যে একটী কমনীয় ভাব আসিয়া আমাদের হৃদয় মনকে আক্রান্ত করিতে থাকে সেই কোমল ভাব হইতে দৃঢ়তার সূচনা হয়। সত্যেতে সকলি ঠিক, সকলি স্থির, এইটী যখন দর্শন করি তখন আমাদের আত্মা আর পরিবর্ত্তনশীল চঞ্চলভাবে থাকিতে চায় না আমাদের সেই ভাব হইতে দৃঢ়তার জন্ম হইয়া থাকে এবং হৃদয়কে সত্য ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া দেয়। এই দৃঢ়তা হইতে অধ্যবসায়ের অভ্যুদয় হইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে মানবকে সিদ্ধকাম করিয়া দেয়। যদি দৃঢ়তা না থাকিত তবে অতি সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যগুলি কস্মিন কালেও কার্য্যে পরিণত হইয়া অনন্ত পথ অনুসরণ করিতে পারিত না, কি মানবগণও তাহার দ্বারা অনন্ত ধামের যাত্রি হইতেী পারিত না, দৃঢ়তাই মানবের উন্নতির মূল কারণ এবং দৃঢ়তার দ্বারাই উন্নতির

পথ খুলিয়া থাকে। সংসারের মধ্যে থাকিয়া অতি কষ্টে এক বিন্দু সত্যালোক দর্শন করিলাম সেই সত্য বিন্দু ক্রমে বিকাশ হইতে হইতে কালে সত্য সিন্ধুতে পরিণত হইল; ইহা কাহার প্রসাদে? জীবনের প্রারম্ভে একটী ক্ষুদ্র কার্য্যের সূত্রপাত হইত ক্রমে সেই কার্য্য সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া সংসারের যুগপ্রলয় সংঘটন করিল, ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কার্য্য সমস্ত সংসারে ছড়াইয়া পড়িল এবং ক্ষুদ্র জীবনের সামান্ত শক্তির বলে সমস্ত জগৎ কম্পিত হইতে লাগিল ইহা কাহার গুণে? আজ বর্ত্তমানে থাকিয়া ভূতের তস্যভূতের সংবাদ জানিতেছি কাহার জন্য? কাহার বলে সংসারের এই সাম্যাবস্থা? কাহার প্রসাদে জগতের গুপ্ত রহস্য অনায়াসে আজ জানিতেছি? পৃথিবী হইতে কত প্রকারের সুখ-উৎস উৎসারিত করিয়া সুখে জীবন রক্ষা কাহার গুণে হইতেছে? এ সকলই দৃঢ়তার জন্য। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার্য্য হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য পর্য্যন্ত সকলই এই দৃঢ়তা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। সত্যে মানবকে প্রণোদিত করে, স্মৃতি অতীত বিষয় সাক্ষাতে উপস্থিত করে, উৎসাহ হৃদয়কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেয় এবং ন্যায় আসিয়া চালনা করে, তৎপরে দৃঢ়তারূপরজ্জু সকলগুলিকে আবদ্ধ করিয়া স্থির করে, অধ্যবসায় আসিয়া কার্য্যে পরিণত করিয়া দেয়। এই নিয়মাধীন হইয়াই জগতের প্রত্যেক বিভাগের ছোট বড় কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। কোন কার্য্য কোন কালে দৃঢ়তাহীন হইয়া ফলপ্রদ হইতে পারে নাই—পারিবে না। ফলপ্রসবি যত কার্য্য দেখিতে পাই সকলি দৃঢ়তা দ্বারা প্রসূত; জগতের শৃঙ্খলা, সাম্যাবস্থা, উন্নতি যত দেখিতে

পাই সকলই দৃঢ়তার তারতম্যানুসারে বিকশিত হইয়াছে। যাহাতে যে পরিমাণে শৃঙ্খলা, যাহাতে যে পরিমাণ শুদ্ধতা ও রম্যতা এবং যাহাতে যেরূপ পবিত্রতা ও উন্নতি তৎসমুদায়ে সেই পরিমাণে দৃঢ়তা আছে। অনেকে মনে করেন দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় কেবল এক প্রকার প্রতিজ্ঞার বল। ইহাতে সত্যাসত্য ন্যায়ান্যায়, পাপ পুণ্যের বিচার আবশ্যক করে না, ইহা সত্যে চালাও সত্যে যাইবে, অসত্যে চালাও অসত্যে যাইবে, প্রতিজ্ঞা বলই ইহার মূলমন্ত্র। তাঁহাদের এই কথায় আমি কিছুতেই সায় দিতে পারি না, একটু বিশেষ অনুধাবন করিলেই বোধ হয় কেহই এই ন্যায়বিরুদ্ধ মতের পোষকতা করিতে পারেন না। যে কার্য্য সত্যের ভূমি এক চুল পরিমাণ অতিক্রম করিয়াছে তাহা সম্পন্ন করিতে অসাধারণ ক্ষমতা খরচ হইলে, অসম সাহস ব্যয়িত হইলে, কিম্বা শত জীবনের শোণিতপাত হইলেও তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা উদ্দীপক ভাবকে কেহ দৃঢ়তা কি অধ্যবসায়মূলক বলিতে পারে না। আমি পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা শব্দটী বলিয়াছি তাহা বলাও ঐ স্থানে ঠিক হয় নাই, কারণ প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায় ইহার একটীর মধ্যে ও কিঞ্চিৎ মাত্র অসত্য ভাব মিশ্রিত থাকিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত ইহারা সত্যের সহিত, ন্যায়ের সহিত সংযুক্ত সে পর্য্যন্তই কেবল তাহারা উক্ত নামে অভিহিত হইতে পারে এবং ইহা দ্বারাই কেবল উহাদের স্বরূপ নির্ণয় হইয়া থাকে। স্বেচ্ছাচারীতার পাশব বলে যে আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহার মধ্যে ইহাদের পবিত্র শক্তির আরোপ করা কেবল মনুষ্য জীবনের কলঙ্ক অঙ্ক বৃদ্ধি করা বই আর কিছু নহে।

এই পবিত্র শুভ্র দৃঢ়তার, অধ্যবসায়ের কি প্রতিজ্ঞার কিছুরই নির্ম্মলতা নষ্ট হইতে পারে না, লাভের মধ্যে দূষিত ভাবে গ্রহণ করাতে কেবল গ্রহণকারীরই জীবনের বিড়ম্বনা অশেষ প্রকারে হইয়া থাকে। স্বেচ্ছাচারীতার পাশব বলে কেহ উক্ত আখ্যায় ব্যাখ্যা করিতে পারেন না করিলে তাঁহার বাক্যও স্বেচ্ছাচারের দূষিত ভাবে উচ্ছিষ্ট হইবে। যেখানে অস্বাভাবিক পাশব শক্তি কার্য্য করিয়াছে সেখানেই ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া জগতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত করিয়াছে ও নানা প্রকার দুঃখের বর্ত্ম প্রস্তুত করিয়াছে। অপার্থিব দৃঢ়তা, অধ্যবসায়ের সহিত কখনও স্বেচ্ছা-চারজনিত শক্তির মিশ্রণ হইতে পারে না। ইহাদের কার্য্য এত বৈষম্যমূলক যে বুঝিবার ও চিনিবার জন্য কিম্বা খুজিবার জন্য কাহাকেও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। আমরা সত্যেতে স্থিতি করিতে না পারিলে এই স্বর্গীয় দৃঢ়তার প্রকৃত আস্বাদ বুঝিতে পারি না আবার দৃঢ়তার বল ব্যতীত স্থায়ীরূপে সত্যেতে স্থিতিও করিতে পারি না সুতরাং সত্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়তার আবশ্যক। দৃঢ়তায় প্রকৃত দৃঢ়বদ্ধ হইতে পারিলেই আমরা আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারি। পার্থিব ধন রত্ন রক্ষার জন্য যেমন আমা-দের লৌহ নির্ম্মিত বাক্সের আবশ্যক করে এবং তাহাতে রাখিতে পারিলে বাহিরের দস্যু তস্করের ভয় হইতে আমরা মুক্ত হই সেইরূপ আধ্যাত্মিক রাজ্যের সম্বল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইলে দৃঢ়তার শক্ত বেড়া হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। দৃঢ়তার বাঁধ একটু শিথিল হইলেই পাপ দস্যু অসত্য তস্কর

আমাদের বহুদিনের সংগৃহিত সম্বল হরণ করিয়া আমাদিগকে অপার দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া দিবে এজন্য দৃঢ়তার প্রাচীর দ্বারা পূর্ব্বেই যেন হৃদয়ের রত্ন রক্ষা করিতে চেষ্টিত থাকি। ঈশ্বর হইতে দৃঢ়তারূপ অক্ষয় কবচ আমরা প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হইয়াছি সেই অক্ষয় কবচে আবরিত হইতে পারিলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর পাপ প্রলোভন হইতে রক্ষিত হইতে পারিব, সকলেই মুক্তিধামে যাইতে পারিব। পিতার প্রদত্ত এই অমূল্য দৃঢ়তা বর্ম্ম যাঁহারা পরিধান করিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই সংসারে ধন্য ও তাঁহাদের জীবনই সার্থক হইয়াছে।

সেই সকল মহাত্মা সংসারে ক্ষণজন্মা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে দুঃখের সমুদ্রে ডুবাইয়া রাখ কি যন্ত্রণার আগুণেই পুড়াইয়া ফেল কিছুতেই তাঁহাদিগের চিত্তকে চঞ্চল করিতে সক্ষম হইবে না। দৃঢ়তার বলে তাঁহারা প্রবল পরীক্ষার মধ্যে বসিয়াও স্থিরভাবে আপন কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে সক্ষম হন। দৃঢ়তার সাহায্যেই মানবগণ আপনার সীমায় কার্য্য করিতে পারে এবং তাহাতে ঠিক থাকিতে পারে। আমরা সর্ব্বদাই এই নিয়মাধীন কার্য্য দেখিয়া আসিতেছি যে, সংসার যখন মানবকে প্রবলরূপে আকর্ষণ করিতে থাকে তখন মানব আপনার সীমা অতিক্রম করিয়া নিম্নগামী হইতে থাকে, প্রলুব্ধ সংসার ও অবৈধ বৈরাগ্য এই দুয়ের মধ্যে মানবের আবাস স্থান। এই সন্ধি স্থানেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। প্রলুব্ধ সংসার এক দিকে অবৈধ বৈরাগ্য অপর দিকে এই দুই ভাব হইতে রক্ষিত হওয়া যায় কেবল দৃঢ়তাবলে। দৃঢ়তা না জন্মিলে মানবগণ এই সংযোগ স্থলে উপস্থিত হইতে পারে

না। কোন কোন ঘটনার আঘাতে মানবের হৃদয়ে বৈরাগ্য উদয় হয়, এই দুই অবস্থাই মানবকে ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে সংসারের আকর্ষণই প্রবল, যাহা হউক এই দুয়ের তারতম্য আর এখানে কিছু করিতেছি না, যখন দুয়েতেই মানবকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করিয়া থাকে, তখন দুই ভাবই আমাদের পরিত্যাজ্য। এই দুই প্রকার ঝড় হইতে রক্ষা পাইতে হইলেই আমাদের দৃঢ়তার আবশ্যক। সংসার হইতে মুক্ত দৃঢ়তার বলে হইয়া থাকি এবং বৈরাগ্যের অপ্রাকৃত স্রোত হইতেও এই দৃঢ়তার বলে রক্ষা পাইয়া থাকি। যে বৈরাগ্য আমরা পরিত্যাজ্য মনে করিয়া ছাড়িবার জন্য বলিতেছি কালের আবর্ত্তনে আবার এ বৈরাগ্যকেও আশ্রয় করিতে হইবে, আবার এক দিন এই বৈরাগ্যকে অবলম্বন করিয়া সকলকেই উর্দ্ধগামী হইতে হইবে সকল বিষয়েই বৈরাগী হইতে হইবে কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়া নয়। কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়া বিষয়েও বিরাগী হইতে পারি না, অনুরাগী ও হইতে পারি না উভয় দ্বারাই ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন হয়।

যে দিন কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন হইবে সেই দিন হইতে মানবের বৈরাগ্য জীবন আরম্ভ হইবে এবং সেই সময়েই মানবকে বৈরাগ্য ভূষণে ভূষিত হইয়া নূতন বেশে নূতন রাজ্যে যাইতে হইবে। কিন্তু আমরা যদি আপনার সীমায় থাকিতে না পারি তবে তখনও আমাদের সেই মুক্তাবস্থা আসিবে না। যত দিন হউক এক দিন আপনার পদে সকল মানুষকে দীক্ষিত হইতে হইবে তৎপর মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে হইবে।

শ্রীঅন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়,—আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

সত্য।

যাহা সৎস্বরূপ হইতে জাত, তাহাই সত্য। সকল মানবই সেই সত্য সূত্রে গ্রথিত, সেই সত্যে অবস্থিত এবং সেই সত্য মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করিয়া সকলে জীবিত আছি। আমরা যে পরিমাণে সমসূত্রে থাকিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হই সেই পরিমাণে আমাদের মধ্যে সত্যের বাঁধ আছে। এবং সেই পরিমাণে আমরা সত্য রাজ্যে অবস্থিতি করি। সত্যের আকর্ষণ, অসত্যের বিপ্রাকর্ষণ, সত্যে মনুষ্যদিগকে একত্রিত করে, অসত্য আবার সকলকেই তফাৎ করিয়া দেয়। সত্যের এই কয়টী মহৎ গুণ যে আমাদের মধ্যে যে পরিমাণ সত্য থাকিবে সেই পরিমাণ আমরা সত্য আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিব। আবার যে পরিমাণে অসত্য থাকে অসত্যের বিপ্রাকর্ষণে সেই পরিমাণে সত্য হইতে দূরিত হই। এই নিয়মের মধ্য দিয়াই আমরা চালিত হইতেছি।

মিত্রই হউন আর শত্রুই হউন সকলের নিকটই এই নিয়মের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে। আমি একবার ভ্রমে পতিত হইতে পারি দুই বার পারি, না হয় অনেক বারই পারিলাম; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত কাল কখনই ভ্রমে থাকিতে পারি না, অবশ্যই একদিন আমাদিগকে ভ্রমপথ ছাড়িতেই হইবে। হইতে পারে প্রকৃত আকর্ষণের অভাব সত্বেও আমার প্রতি কেহ ভালবাসা অর্পণ করিতে পারেন এইরূপ অযথা নিয়মে বন্ধুতা স্থাপন করিতে পারেন কিন্তু ইহাও নিশ্চয়

বলিতে পারি যে সেই পার্থিব বন্ধন অবশ্য একদিন ছিন্ন হইবে এবং আমা হইতে তাঁহাকে অনেক দূরে যাইতে হইবে। আমার ইচ্ছা কি অনিচ্ছার প্রতি সেই আকর্ষণ খাটিবে না। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্যের বিরুদ্ধে সেই সত্য কার্য্য করিয়া থাকে। প্রকৃতি অতি কঠিন পাষাণময় স্থান হইতেও উৎস সকল উৎসারিত করিয়া সমস্ত জগতের সন্তাপ নাশ করিয়া থাকে আমাদের অতি কঠিন পাষাণ মনেও সময় সময় সেই সৎস্বরূপ হইতে সত্য উৎস উৎসারিত হইয়া হৃদয়ক্ষেত্র প্লাবিত করতঃ শান্তি দিয়া থাকে। তাই বলিয়া এই অসত্য জীবনেও আমরা বাঁচিয়া আছি। যেমন অবিভাজ্য পরমাণু হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে সেইরূপ আবার অক্ষুণ্ন সত্য দ্বারায় সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমস্ত সৌরজগত এক সত্য সূত্রে বদ্ধ থাকিয়া সত্য প্রবাহে ভ্রাম্যমান হইতেছে। সত্যে স্থিত বলিয়াই আমরা সত্য বুঝিতে পারি; যাহার অস্তিত্ব বুঝিয়া শান্তি পাই, সুখ অনুভব হয় আরাম আসিয়া হৃদয়কে সুস্থির করে সেই সমস্তই সত্যে স্থিত। আর যাহার প্রকৃত অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না অথচ তাহার আঘাতে হৃদয় ব্যথিত হয়, কলঙ্কিত হয়, এমন রেখা পড়ে যে মনে হইলেই তাহার গভীরতা দেখিয়া প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। নিশ্চয় জানিতে হইবে উহা অসত্য হইতে জাত হইয়াছে। সত্যের এই সাধারণ সংজ্ঞা জানিলে আমরা সত্য সহজে ভালরূপ বুঝিতে পারি। মূল কথা এ সংসারে যাহার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে তাহাই সত্যে স্থিত। এক দিন এই পার্থিব রাজ্যের আধিপত্য বিলুপ্ত হইবে। বিষয় ব্যাপারও অন্তর্হিত হইবে।

ভাবের ব্যাপকতা ঘুচিয়া যাইবে, সকলই যাইবে। কালের কবলে সকলই লুক্কায়িত হইবে কিন্তু থাকিবে কি? না সেই অবিনাশী সত্য। সত্যের বিলোপ কখনই হইবে না সত্য সকলের প্রাণ। সত্য আছে বলিয়াই আমাদের সত্বা আছে। অন্যথা আমরা কিছুরই অস্তিত্ব বুঝিতে পারিতাম না। আমাদের অস্তিত্ব মুহূর্ত্তের জন্য থাকিত না জড়ের সমস্ত গুণ বাদ দিলে যেমন সেই অবিভাজ্য অণুরাশির অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে আমাদের পার্থিব সকল ধ্বংশ হইলেও সেই অবিনাশী সত্য চিরদিনই থাকিবে। মানব রাজ্যের সাধারণ সম্পত্তি সত্য। এই সত্য সম্পত্তি যে পরিমাণে যিনি লাভ করিয়াছেন যে পরিমাণে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনি সেই পরিমাণে ধনী, সেই পরিমাণে সুখী হইয়াছেন। মনুষ্যগণ সম্পত্তির সীমা অতিক্রম করিয়া এবং রক্ষায় অপারগ হইয়াই অসত্যের আঁধারে পড়িয়া দুঃখে কষ্টে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। আমরা যে এত বিপদে এত অশান্তিতে পড়িয়া থাকি তাহার প্রধান কারণ আমাদের মূলে সত্য না থাকা।

উদ্ভিদ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিতে পাই? যাহা দেখি তাহার কি অর্থ বুঝিতে পারি?—না বুঝিতে ইচ্ছা করি? করিলে কখনই আমাদের এ দশা থাকিতে পারে না। এই যে বৃক্ষ সকল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া কত পান্থের বিশ্রাম সুখ প্রদান করিতেছে কত লোককে পুষ্প দ্বারা মোহিত করিয়া তৃপ্তি দিতেছে, এবং ফলাদি প্রদান করিতেছে। কিন্তু এই বৃক্ষ সকল কাহার সাহায্যে এই সকল রমণীয় গুণে ভূষিত হইয়া সকলকে সুখী করিতে সক্ষম হইল। সেই বিষয় কি

একবারও অনুসন্ধান করিয়া দেখি ? বৃক্ষের প্রাণ কাহার উপর নির্ভর করে ? এই পৃথিবী হউক না উর্ব্বরা ভূমি ; কিন্তু বৃক্ষের মুল না থাকিলে কিছুতেই সে বাঁচিবে না। তাহার মূল ছিন্ন করিয়া দেও তাহার পর যত চেষ্টাই কর না কেন যত কৌশলই খাটাও না কেন, কিছুতেই তাহাকে আর রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহার সেই তেজবান শাখা প্রশাখা রমণীয় ফুল কমনীয় পাতা সুস্বাদু ফল সকলই সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে। আমাদের ধর্ম্ম-রাজ্যের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। ধর্ম্ম বৃক্ষের মূল সত্য। আমরা ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় শান্তি লাভ করিবার জন্য যাই বটে কিন্তু প্রধান মূল সত্যই ভূলিয়া যাই, সুতরাং অসত্য ভাব সকল অনায়াসে আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। যতক্ষণ সত্যের মূল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায় ততক্ষণ কিছুতেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না।

আজ কল্পনায় একটী অসত্য চিন্তা করিলাম; কাল ভাবে তাই পরিণত করিলাম, পরশ্ব হয়ত একেবারেই কার্য্যে সম্পন্ন করিয়া ফেলিলাম। এইরূপে দিনে দিনে আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে মিথ্যা প্রবেশ করিয়া সত্যের বাঁধ শিথিল করিয়া দেয়। যতই অসত্যতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই সত্যভাব যথার্থ কার্য্য উচিত ব্যবহার আমাদের মধ্যে লোপ পাইয়া থাকে। তখন আমরা কি করি, না আরও কপটতা জালে জড়িত হইয়া ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে যাইতে থাকি। কোথায় ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইতে গিয়াছিলাম আর কোথায় মৃত্যুর ভীষণ কবলে নীত হইতেছি। আমরা নিজের দোষে সেই বৃক্ষের ফুল ফল কাহাকেও দেখিতে দিলাম না, তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য

স্বাভাবিক মনোহর ভাব বিকৃত ভাবে জগতের নিকট প্রকাশ করিলাম, এবং জীবনে তাহার অভিনয় দেখাইয়া কত শত লোকের মৃত্যুবান বলিয়া দিলাম। তাই বলি আমরা যে সাধনাতে প্রবৃত্ত হই প্রথমত সত্যকে মূল করিতে হইবে। যদি এই সংসারক্ষেত্র হইতে সত্য মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি তবে তাহাতে যে নিশ্চয় বিশ্বাসরূপ অমূল্য ফল ফলিবে তাহার সংশয় কি? সত্যের আশ্রয়ে বিশ্বাস ফল লাভ হয়, সেই ফল লাভ করিতে পারিলেই যে আমরা অমৃতের অধিকারী হইয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারি। কে অস্বীকার করিতে পারেন? তখন স্বর্গীয় বৃক্ষে স্বর্গীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া স্বর্গীয় গন্ধ বিতরণ করিবে, এবং স্বর্গীয় অমৃত প্রদান করিয়া আমাদিগকে স্বর্গীয় পথে ধাবিত করিয়া আহ্লাদ প্রদান করিবে। আমরা এইক্ষণ নিশ্চয়রূপে বুঝিয়াছি যত দিন না আমরা সত্যকে মূল কারণ করিতে না পারিব ততদিন কিছুতেই প্রকৃত সরল পথ আশ্রয় করিতে পারিব না এবং ভ্রম হইতে মিথ্যা হইতেও মুক্ত হইতে পারিব না। এই ভয়ানক অবস্থা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্মরণ করিয়া চলিতে হইবে। যাহাতে এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইতে না হয় তজ্জন্য খুব সতর্কতার সহিত সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে যে সকল অসত্য রেখা হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যত্ন করিয়া উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। কার্য্যে, চিন্তায়, কি ভাবে কিছুমাত্র অসত্য ভাব না আসিতে পারে। তাহার জন্য সত্য-দ্বারা সমস্ত অঙ্গ একবারেই আবরিত করিতে হইবে। চিন্তায় যাহা করিবে বাক্যে তাহা বলিবে এবং হস্তে তাহা করিবে।

এইরূপ সামঞ্জস্য ভাবে কার্য্য করা চাই। অন্যথা করিলে অসত্য সমুদ্রে ডুবিয়া মরিব। পূর্ব্বস্মৃতি যখন মানস-পট উদ্ঘাটন করিয়া দেখায় তখন কি দেখি? দেখিয়া কি আনন্দ প্রকাশ করিতে পারি? না জীবনে নববল লাভ করিয়া উৎসাহিত হইতে পারি? অসত্যের বিষাদ রেখা দেখিয়া মন আরও নৈরাশ্য সাগরে ডুবিয়া যায়; হায় বাল্যকালের কত সময় না এই অসত্য ব্যবহারে চলিয়া গিয়াছে। যাহার প্রবল আঘাত এই সুদীর্ঘ সময়েও নিবারণে অক্ষম। কত সময় নিজের গর্ব্ব-রক্ষার জন্য, স্বার্থের জন্য এই জীবনে কতই না কপট জাল বিস্তার করিয়াছি। অন্যের সুখের পথে কতই না কণ্টক রোপণ করিয়াছি। ক্ষণিক সুখে ভুলিয়া কতই না অসত্য সঞ্চয় করিয়াছি এই সকল যখন ভাবিয়া দেখি এবং জীবনের অতীত বিষয় যখন আলোচনা করি; তখন কি ভীষণ বজ্রাঘাতে হৃদয় আহত হয়। এই সকল ভোগ করিয়াও যদি শিক্ষা না পাইলাম এবং কর্ত্তব্য পথ না ধরিলাম, তবে কেন না মৃত্যু ঘটিবে। যদি এখন বাঁচিতে ইচ্ছা করি তবে ধর্ম্মপথের সাধকদের পদতলে যাইতে হইবে। তাঁহাদের জীবন পাঠ করিতে হইবে। এবং তাঁহারা কিরূপে সত্য জ্যোতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দৃঢ় করিয়া ধরিতে হইবে। এক একটী সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। এইরূপ বল তাঁহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলে অসত্য হইতে, মিথ্যা কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি পাইব। দেখ বাল্মীকি মুনি কি মন্ত্র জপ করিয়া আপন নশ্বর জীবন অবিনশ্বর করিলেন। কি ছিলেন, সাধনা দ্বারাই বা কি হইলেন ঐতিহাসিক তত্ত্বে জানিতে পাই,

তিনি যখন আপনার দুষ্কার্য্যের ফল জানিতে পারিলেন তখন সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে রাম নাম সার করিলেন এবং সেই মন্ত্র সার জানিয়া অনিদ্রায় অনাহারে দিবানিশি কেবল তাহাই জপ করিতে লাগিলেন। কত যুগ চলিয়া গেল, তাঁহার শরীর পৃথ্বীতে প্রোথিত হইয়া গেল; তথাপি মূল মন্ত্র ছাড়িলেন না, এমন কি অবশেষে তাঁহার রক্তমাংস উই পোকা ধ্বংস করিল তথাপি তাহার সেই প্রাণ মৃতের ন্যায় হইয়াও সেই সাধনায় নিযুক্ত রহিল। যিনি তাঁহাকে সেই মহামন্ত্র দিয়াছিলেন কতক কাল পরে তিনি তাঁহার অনুসন্ধানে আসিলেন, আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে অবাক্ হইলেন। সেই স্থানে জনমানবের নাম গন্ধ নাই কেবল মৃত্তিকা মধ্য হইতে রাম নাম উত্থিত হইতেছে তাহা শুনিয়াই বুঝিলেন মুনি কি অবস্থায় অবস্থিত আছেন। তখন ইন্দ্রকে বলিলেন তুমি সাত দিন অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ কর তাহা হইলে মুনি উত্থিত হইবেন। এই নিয়মে তাঁহাকে উত্থিত করিয়া দেখিলেন। সে শরীরে রক্ত নাই রক্তের গতি নাই, কেবল মৃত কঙ্কাল রাম রাম বলিতেছে। তৎপর আবার তিনি নূতন জীবন প্রাপ্ত হইলেন। এই ঐতিহাসিক-তত্ত্বটীর মধ্যে কি সত্য লুক্কায়িত আছে মনুষ্যগণ যখন পাপে তাপে বড়ই ভারী হইয়া পড়ে যখন আত্মা মৃতভাব ধারণ করে তখনও যদি ঈশ্বরকে মুক্তির একমাত্র কারণ জানিয়া অটল বিশ্বাসের সহিত সেই নাম সাধন করে, তবে নিশ্চয়ই প্রেম স্রোত প্রবাহিত হইয়া তাঁহার সেই বহুদিনের স্তুপীকৃত অসারতাকে ভাসাইয়া নিয়া তাহাকে নবজীবন প্রদান করে।

ক্ষমা।

ক্ষমা মানব জীবনের একটী অমূল্য ভূষণ, এবং একতা স্থাপনের একটী মহৌষধি। এই অমূল্য পার্থিব সম্পত্তি সর্ব্বদা মিলে না। অতি কষ্টে অতি সাধনায় এই স্বর্গীয় ফল মর্ত্তে লাভ করিয়া মানবগণ জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মের বীজ প্রত্যেকের অন্তরে নিহিত আছে। কিন্তু তাহা উপযুক্ত সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া স্বাভাবিক নিয়মে বর্দ্ধিত হওতঃ ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া অতি অল্প লোকের হৃদয় কাননই সুশোভিত করিয়া থাকে। অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই এই অমৃত ফল প্রসূত হয়। ধর্ম্ম-বৃক্ষের ব্রহ্মাণ্ড প্রসরিণী শক্তি, বিশ্বজনীন কার্য্য এবং অনন্ত শান্তিপ্রদ ফল ইহার সকলই চিন্তা বলে কল্পনার সাহার্য্যে কিছু না কিছু স্বীয় জ্ঞানের মধ্যে আনিতে পারি। কিন্তু ইহার প্রকৃত ফল আস্বাদন করা আপন জীবনে বৃক্ষ ব্যতীত হইতে পারে না। অন্যের জীবন সন্দর্শন করিয়া কি ধর্ম্ম জগতের বহির্ভাগে অবস্থান করিয়া এই স্বর্গীয় ফলের সরস তত্ত্ব কথনই অনুভব করা যাইতে পারে না। জ্ঞান এখানে অন্ধ, কল্পনা এখানে ক্ষীণ, চিন্তা এখানে নিশ্চল। সকলই এখানে নিস্তব্ধ ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশ না করিলে এই সকল মোক্ষ ফল লাভের বাসনা কাহার মনে স্থান পাইতে পারে না। ধর্ম্মে মতি হইলে সংসারের সহিত তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠে। সৌভাগ্যক্রমে যদি ইচ্ছা জয়লাভ করিতে পারিল তবে দ্বিতীয় যুদ্ধ পাপের সঙ্গে; এখানেই বিষম প্রমাদ।

পাপ কীট এমন ধূর্ত্ত যে ইচ্ছাকে বিশ্বজনীন ইচ্ছাময়ে উপস্থিত হইতে দেয় না। ইহাদের হস্তে এমনি গুপ্তবান সকল আছে যে অতি কৌশলে ও অজ্ঞাতসারে মুহূর্ত্ত মধ্যে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ইচ্ছাময় হইতে বিযুক্ত করিয়া থাকে।

এই দ্বিতীয় সংগ্রামে উত্তীর্ণ হইলেই মানব সত্যের ভূমিতে স্থির হইতে পারে। একবার বিবেক বৈরাগ্যের সহায়তায় এই সমরে জয়যুক্ত হইতে পারিলেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় মিলিত করিয়া সত্যের ভিত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্থিরভাবে মানর দাঁড়াইতে পারে। তৎপর ঈশ্বর হইতে স্থায়ের জ্যোতি ও প্রেমবারি লাভ লাভ করিয়া জীবনে ধর্ম্ম বৃক্ষের উৎপন্ন হইয়া থাকে। কালে সেই বৃক্ষে ফল প্রসুত হইয়া মানবকে শান্তি দিয়া থাকে। ধর্ম্ম বৃক্ষের ফলের মধ্যে ক্ষমা একটী অতি মহৎ ফল। এক ক্ষমা ফল হইতে অনেক অশান্তির বিনাশ হয়। অনেক অনৈক্যের মূলোৎপাটিত হয়। ক্ষমা ফল ফলিতে আরম্ভ করিলে সাধক হৃদয়ে আশা পবন বহিতে থাকে এবং তথা সে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে পারে যে তাঁহার হৃদয়ে একদিন প্রাথিত ফল প্রসূত হইয়া হৃদয় কানন পূর্ণ করিয়া দিবে। জীবনে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইলেই আনন্দ কি আশার কথা নহে যতদিন না তাহাতে ফল ধরে। ফল না ধরা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করা যাইতে পারে না এবং এই ফল না জন্মিলে আত্মাও কোনরূপে রসপূর্ণ হইতে পারে না। তখন ফলহীন বৃক্ষের স্থায় উর্দ্ধ মস্তকে জগতের ভ্রাতা ভগিনীদিগকে শত শত ঔদ্ধত্যের আঘাতে পাতিত করিয়া থাকে। ফল হীন বৃক্ষকে যেরূপ লঘু বায়ুতেই আন্দোলিত করিয়া থাকে, তদ্রুপ ফল হীন মানব-

গণ ও অতি অল্প কারণে, অল্প যৎসামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় আন্দোলিত হইয়া স্বর্গ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষমার গুরত্ব ও মহত্ব দর্শন করিতে হইলে আমরা এখন কোথায় যাইব! ক্ষমার সেই চির আঁধারে আমরা ক্ষমার্ণবে ডুবিলেই যথার্থ তত্ব জ্ঞাত হইতে পারি এবং ক্ষমার জন্য প্রকৃতরূপে ব্যাকুল হইতে পারি। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য ক্ষমার প্রতি তাকাইলে এমন ঔদ্ধত স্বভাবান্বিত পাষণ্ড নাই যাহার হৃদয় তাতে দ্রবীভূত না হইয়া থাকিতে পারে।

যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, যিনি পবিত্রতার নির্ম্মল চন্দ্রমা, যিনি শুদ্ধ ও পাপ দ্বারা অবিদ্ধ সেই স্বর্গের দেবতা ঈশ্বর সামান্য ক্ষুদ্র মলিন মানবকেও প্রেম করিতেছেন। কত প্রকার অত্যাচার কত প্রকার অবমাননা ক্ষমা করিয়া তিনি নির্ব্বিশেষ ভাবেসকলকেই স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। দেখুন তাঁহার কি আশ্চর্য্য ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা। ইহা বুঝিলে কে আপনার মনকে কঠিন পাষাণে আবরিত রাখিতে পারে? আমি পাপের প্রবর্ত্তনায় এমন ঈশ্বরকেও কত অগ্রাহ্য করিয়াছি, কতবার তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছি, তিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাকে বিনাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, তিনি সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া অবিশ্রান্ত জীবের কল্যাণ বিধান করিতেছেন। সেই পরম ক্ষমাশীল পিতার নিকটবর্ত্তী হইলে সন্তানগণও আশ্চর্য্য ক্ষমা ফল প্রাপ্ত হইয়া অবিকৃতাবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। ক্ষমাতেই মানবগণ সংসারের প্রবল অস্থিরতার মধ্যে শান্ত সমাহিত চিত্তে অটল অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে সক্ষম হন। পৃথিবীর অত্যাচার

ভ্রাতা ভগিনীর অতি কঠোর দুর্ব্যবহার এবং শত্রুগণের অযথা নির্যাতন ইহার সকলই তিনি সহাস্যবদনে সহ্য করিতে সক্ষম হন। শত্রুর শত্রুতা অন্যায়কারীর অত্যাচার তাঁহার সৎব্যবহার দ্বারা পুনঃ তাহাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া প্রত্যুত তাহাদিগকেই নির্যাতন করিতে থাকে তাহারা আপনাদের জালে আপনারা জড়িত হইয়া অতি আশ্চর্য্য কৌশলে শিক্ষা পাইয়া থাকে। যিনি ক্ষমারূপ অমোঘ অস্ত্র লাভ করিয়াছেন তিনি সংসারে নিশ্চয়ই জয়ী হইবেন। ক্ষমার অগ্রে সকল শত্রু পরাজয় মানে। এ পর্য্যন্ত যত ঈশ্বর ভক্ত জন্মিয়াছেন সকলই ক্ষমার ফল দ্বারা জগতকে মোহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক ক্ষমার নিকট সকল বিরোধী ভাব পরাস্ত মানে ক্ষমাশীলের শত্রু কোথাও নাই। এই মলিন সংসারে থাকিয়া এবং জগতের ব্যাপার কাণ্ড দেখিয়া আমরা প্রকৃত ক্ষমার জ্যোতি দেখিতে পাই না এবং বুঝিতেও পারি না; এইজন্য আমরা অনেক স্থানে ক্ষমার ভ্রান্ত পথে গমন করিয়া দোষগুণে জড়িত ক্ষমার ভাব গ্রহণ করিয়া থাকি। বাহিরে ক্ষমার কার্য্য ভিতরে স্বার্থের কার্য্য এইরূপ বিসদৃশ কার্য্য দর্শন করিয়া হৃদয়ে অস্বাভাবিক চিত্র অঙ্কিত করতঃ রুচিকে বিকৃত করিয়া থাকি। ক্ষমার যে জগত মাতান শক্তি, শত্রু বশীকরণ কার্য্য এবং শান্তি স্থাপনের ভাব ইহার কিছুই তখন দেখিতে পাই না। ফলতঃ জীবনে ক্ষমার ফল প্রসূত না হইলে বাহিরের কপট ক্ষমায় জীবন পবিত্র হয় না আত্মা বিকার হীন হয় না। বাহিরের শান্তি রক্ষার জন্য বাহ্যিক ক্ষমা ব্যবহার করিলে বাহিরের শান্তি প্রকৃতরূপে রক্ষিত হইতে পারে না অন্তরের আগুণ বহির্গত

হইয়া শান্তির কৃত্রিম ভিত্তি ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। মানবে মানবে যে সম্বন্ধ তাহা বাহিরের সম্বন্ধ নহে। মানবগণ আত্মায় আত্মায় পরমাত্মার দ্বারা মিলিত, অন্তর ছাড়িয়া বাহির প্রলেপে এ সম্বন্ধ রক্ষিত হইতে পারে না আমাকে এক ব্যক্তি অন্যায় রূপে ভৎর্সনা করিল আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া মিষ্ট বাক্যে তাহার সহিত ব্যবহার করিলাম কিন্তু অন্তরে এমন একটী অবস্থা ঘটিয়া রহিল। আমি পূর্ব্বের ন্যায় আর তাহাকে অন্তরে রাখিতে পারিলাম না ইহা আমার পতনের কারণ হইল। কার্য্যত যদিও আমি ক্ষমাকে অতিক্রম করিলাম না বটে কিন্তু অন্তর তাহাতে সায় দিল কৈ? অন্তর ক্ষমাশীল না হইলে কয় দিন ক্ষমার আবরণে অন্তরের আগুণ চাপিয়া রাখিব। সময় মতে একদিন অবশ্যই অন্তরের অগ্নি বহির্গত হইয়া আমার ক্ষমার কপটধর্ম্ম ভগ্ন করত জগতের নিকট আমাকে প্রকাশ করিয়া দিবে। যখন অত্যাচারীর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া শত্রুর শত্রুতায় ব্যথিত হইয়া আত্মাকে অবিকৃত রাখিতে পারি এবং অন্যায়কারী ভ্রাতার অবৈধ ব্যবহারের জন্য ঈশ্বরের নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিতে সক্ষম হইব ও তাঁহাকে হৃদয়ের ভালবাসা প্রদান করিতে পারিব তখন জানিব ক্ষমার ফল জীবনে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

এ জগতে যাহাকে ক্ষমা বলিয়া থাকে বাস্তবিক তাহা ক্ষমা নহে তাহার প্রকৃত নাম তাচ্ছল্য বা অনুগ্রহ। এই দুই শ্রেণীর ভাব লইয়া সচরাচর ক্ষমার স্থান পূরণ করিয়া থাকে। অত্যাচারিত ব্যক্তি যে ভাবে ও যে কারণেই হউক প্রতি শোধের অধিকার সত্ত্বে চুপ করিলেই তাহার নাম ক্ষমা। মুনি ঋষিগণ

ক্ষমার জন্য কত কাল সাধন করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মাগণ যে ক্ষমার সাধনায় অশেষ কষ্ট ব্রত গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনাবনত অবস্থায় কালক্ষেপন করিয়াছেন সেই ক্ষমা আজ ঘাটে পথে ছড়াছড়ি। সকলই অন্ধ ক্ষমা বুঝিয়াছে ও ক্ষমা ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। ছেলে ছেলেকে খেলার নিয়ম ভঙ্গ অপরাধের ক্ষমা করিতেছে। এইরূপ বাক্যের ত্রুটী; কথার ত্রুটি হাটার ত্রুটি ইত্যাদি ত্রুটির জন্য ক্ষমা বড়ই ব্যবহৃত হই-তেছে। ধর্ম্মতত্ত্ব যতই মানব হৃদয় পরিত্যাগ করিতেছে মানব ততই ক্ষমার গভীর তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া এইরূপ অবস্থা মধ্যে মহান্ ক্ষমা আরোপ করিয়া ক্ষমার প্রকৃত গুরু তত্ত্বকে নষ্ট করিতেছে। এক ব্যক্তি ক্রোধ পরবশ হইয়া আমাকে অযথা কত গালি গালাজ দিয়া গেল আমি তাহাকে নিতান্ত ক্রোধী জঘন্য ও নীচাশয় লোক বলিয়া তাহাকে কিছুই বলিলাম না। ইহা কি আমার ক্ষমা হইল। অপরাধীর দুর্ব্ব্যবহারকে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিলাম অথবা তাহার প্রার্থনায় তাহার প্রতি অনু-কম্পা প্রদর্শন করিয়া প্রতিশোধ না লইলাম ইহার নাম কি ক্ষমা? যদি ইহা ক্ষমা হয় তবে বলিতে পারি ইহার জন্য কাহারও সাধনার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক মানবের মধ্যে এই ভাব বদ্ধমূল আছে। ইহার জন্য মানব এত উচ্ছৃঙ্খল যে ইহার মূলোৎপাটন না করিতে পারিলে মানবের আর শান্তি নাই। এই কৃত্রিম ক্ষমার বিপ্রাকর্ষণ ভাবই আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। এই পৃথিবীর বিষয় রাজ্যে বাস করিয়া সে স্বর্গীয় মহান ক্ষমাকে আমরা কিছুতেই দেখিতে পারি না। ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা না হইলে কেহই ইহার স্বাদ লইতে পারিবেন

না। ঈশ্বর একমাত্র ক্ষমার চিরস্থান। ক্ষমা করিতে হইলে তাঁহার নিকট যাইয়া ক্ষমা শিক্ষা করিতে হইবে। পৃথিবীর কুটীল পাকচক্রের মধ্যে থাকিয়া ক্ষমা শিক্ষা করা যায় না। ঈশ্বরপ্রেম লাভ না হইলে প্রকৃত ক্ষমা জীবনে আসিতে পারে না। ক্ষমার মূলমন্ত্র ভালবাসা, হৃদয়ের প্রেম অর্পণ করা এবং পাপীর দুরবস্থার সহিত সহানুভূতি প্রদান করা। অন্যায়-কারীর অন্যায়াচরণ দর্শনে যদি তাহার দুর্দ্দশার জন্য প্রাণে কান্দিয়া উঠে তবেই জানিব ক্ষমার বীজ জীবনে অঙ্কুরিত হই-য়াছে এই অবস্থাকেই বাস্তবিক ক্ষমা বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ যে অর্থে যে ভাবে ক্ষমার ভাব গ্রহণ করিয়া থাকি তাহা সম্পূর্ণরূপে অমূলক। কাহার কোন অপরাধ কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। ঈশ্বরের এমনি অখণ্ডনীয় নিয়ম, যে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে তাহার ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। কেহ তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এই নিয়ম স্বীকার করিলেই আমরা অতি পরিষ্কার বুঝিতে পারি যে শাস্তি কি ক্ষমা করিবার আমাদের উপস্থিত নিয়মে অধিকার নাই ঈশ্বর এইরূপ ক্ষমা করেন না। আমি অপরাধ করিয়া তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়া কৃত পাপ হইতে অব্যাহতি কোনরূপে পাইতে পারি না। তাঁহার নিয়মাধীন থাকিয়া তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমা এই যে আমা-দের অপরাধের জন্য তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই তাঁহার প্রেম স্নেহ ক্রোড় হইতে নিমেষের তরে তাড়িত করেন নাই। আমি যখনই প্রাণ খুলিয়া পিতা বলিয়া ডাকি অমনি শত আশ্বাস বাণী আমাকে প্রদান করেন ও সুস্থ করেন।

আমরা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে এই ক্ষমার মাহাত্ম্য আমরা প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হইতে পারিব। এই ক্ষমার বিষয় বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা কল্পনা ব্যতিত বুঝিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। আমাদের হৃদয়ের ভাব এখন এত সঙ্কোচ রহিয়াছে। স্বার্থের রস এখন এত জীবনে ভরা রহিয়াছে যে এই প্রমুক্তাবস্থায় আসিতে পারি না ক্ষমার প্রতিকুলাবস্থা দ্বারা আমাদের হৃদয় পূর্ণ রহিয়াছে।

অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়,
আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়।

আজ আমাদের হৃদয়ে যে আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে ভাষা তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম। এমন অপূর্ব্ব আনন্দ, স্বর্গীয় সুখ জগতে অতি অল্প সময়ে ঘটিয়া থাকে। অন্ধ চক্ষু পাইলে, সমুদ্রে মগ্ন হইয়া তরণী দর্শন করিলে যে আনন্দ যে আহ্লাদ প্রাপ্ত হয় এই আনন্দ এই আশ্বাস তাহা হইতে অসংখ্য গুণে উচ্চ ও মহৎ। আমাদের এ আহ্লাদ অতুলনীয়। পৃথিবীতে এমন কোন শব্দ নাই যাহা দ্বারা হৃদয়ের এই অব্যক্ত আনন্দোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে পারে। অন্ধ চক্ষু পাইলে কি হয়? না এই পার্থিব রাজ্যের অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া—তাহার চর্ম্ম চক্ষুর তৃপ্তি সাধন হয়। এইরূপ জলমগ্ন ব্যক্তির তরণী দর্শন করিয়া জীবন রক্ষার উপায় প্রাপ্তে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। পার্থিব জীবনে যদিও ইহা অতুলনীয় সম্পত্তি ক্ষণ-

ভঙ্গুর দেহের যদিও ইহা চরমচিত্র তথাপি ইহা অকিঞ্চিৎকর ও মলিন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের কিছুমাত্র সুখের সহিত ইহার তুলনা হয় না। এই সুখের সম্বন্ধ কেবল জীবন পর্য্যন্ত, দেহ ধ্বংশের সঙ্গে সঙ্গে ইহারও শেষ হইবে। জীবন অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ সুখ যবনিকার পতন হইবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় দ্বারা আমাদের আশার সঞ্চার হইতেছে। জীবনে যে তরী দর্শন করিয়া আমাদের মন উল্লাসিত হইতেছে এবং দুঃখের যবনিকা উত্তোলিত হইয়া সুখের রাজ্য দেখাইতেছে তাহার ফল চিরকাল স্থায়ী। সে আশার বিরাম নাই সে শান্তির বিশ্রাম নাই এবং সে সুখের বিনাশ নাই। ইহকাল পরকাল অনন্তকাল এ সম্বল আমাদের আত্মার সঙ্গের সঙ্গী। এমন অবিনাশী স্থায়ী ধনপূর্ণ ভাণ্ডার গৃহের দ্বারস্বরূপ যে বিদ্যালয় তাহার আগমন আজ কত সুখের এবং তাহার জন্ম দিনই বা কত আনন্দের! এমন জীবন সুহৃদ হৃদয় বন্ধুর আগমনে কাহার না হৃদয় আনন্দে মাতিয়া উঠে? এমন কৃতঘ্ন কে আছে যে এমন সুখের দিনে মুখ মলিন করিয়া থাকিতে পারে? অলক্ষিত রূপে হৃদয়ে এ আনন্দ তরঙ্গ উঠাইয়া থাকে। এ স্বর্গীয় সুখোচ্ছ্বাস জীবনে অনুভূত ব্যতীত বলা যায় না এবং তাহা কথন সম্ভবও নহে। আরও আনন্দ এইজন্য যে অনেক প্রকার বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া আজ দ্বিতীয় বৎসরে এই বিদ্যালয় পদার্পণ করিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে চারি দিক হইতে যেরূপ মৃত্যুবান ইহার জন্য তীক্ষ্ণ হইতে ছিল তাহা দেখিয়া আমাদের মনে এমন আশা ছিল না যে এই বিদ্যালয়ের জন্ম হইবে কি তাহার স্থায়ী জীবন আমরা দেখিতে পাইব। আশা

ছিল না তাই আজ দেখিয়া এত আশা ও আনন্দ। এই বিদ্যালয় দ্বারা জীবনের গতি যদিও আশানুরূপ ফিরাইতে পারি নাই কি সম্বৎসরের ফল দেখিয়া আনন্দ করিবার বিশেষ কিছু দেখিতেছি না। তথাপি হৃদয়ের আনন্দের বেগ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। এই চঞ্চল ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের হস্তে পড়িয়া যে ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই ইহাই আমাদের আনন্দের বিশেষ একটী কারণ। এই বিদ্যালয়ে যে সকল ব্রত গ্রহণ করিয়া জীবনে সাধনের চেষ্টা করিতে ছিলাম। তাহার ফল দর্শন করিলে আর আনন্দের সহিত উৎসাহের সহিত এই উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারি না। যখনি নিজের অকৃতকার্য্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখনই মন বিষাদসাগরে ডুবিয়া যায়। তবে যে নিরুৎসাহ হই নাই তাহা কেবল বিদ্যালয়ের জীবন দেখিয়া। উৎসাহিত হইয়া আশান্বিত অন্তরে যে আজ এই উৎসবে যোগ দানে সক্ষম হইলাম তাহাও এই জন্যই। এই বিদ্যালয় স্থায়ী জীবন লাভ করিয়া আমাদিগকে স্থায়ী ধন বিতরণ করিবে ও স্থায়ী জীবন প্রদান করিবে ইহাই আমাদের স্থিরতর বিশ্বাস ও আশা।

আমরা এ বৎসরে ৩টী ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা এই;— সত্য, ন্যায়পরতা ও প্রেম। বৎসরের এক তৃতীয়াংশ কেবল সত্য ও ন্যায়পরতা সাধনের চেষ্টায় গত হইয়াছে। প্রেম অতি অল্প দিন যাবৎ তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে একবৎসর যাবৎ সত্য ও ন্যায় পালনের চেষ্টা করিতেছি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলাম না অতি সামান্য কারণে সামান্য ঘটনায়ও আমরা সত্য ন্যায় হইতে চ্যুত হইয়াছি;

সত্যের যে প্রকৃত ভিত্তি তাহার ভাব এখনও আমরা ঠিকরূপে ধারণা করিতে পারি নাই। ন্যায়ের সূক্ষ্ম গতিও বুঝিতে পারি নাই। এত দিন আধ্যাত্মিক রাজ্য ন্যায়ের রাজ্য ও সত্যের রাজ্য বলিয়া একটী কথা মাত্র বোধ করিতাম এবং কল্পনাপথেই প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতাম এবার সে অন্ধতা আর নাই। আর কিছু হউক আর না হউক অসত্যের ও অন্যায়ের গাঢ়ান্ধকার বিদূরিত হইয়া সত্যালোক ন্যায় জ্যোতি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বে অন্ধকারে বাস করিয়াও বুঝিতে পারি নাই, আমি কিছুই দেখিতে পাই নাই,—জন্মান্ধ ব্যক্তি যেরূপ জগতের সৌন্দর্য্য দর্শন জন্য ব্যাকুল নহে আমিও সেইরূপ অব্যাকুলিত চিত্তে বাস করিতেছিলাম। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় অসত্যের সেই কপট আবরণ উদ্ঘাটন করিয়া মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এখন আর অন্ধকারে ভয়শূন্য হইয়া থাকিতে পারি না। এত অভাব লইয়া এত অন্যায় শত্রু লইয়া নির্ভাবনায় ঘুমাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করি না এবং অন্ধকার দেখিয়াও ভয় পাইয়া থাকি। তথাপি অভ্যাসের এমনি প্রভাব যে অন্তরের এই অবস্থার মধ্যেও আমাদিগকে কত বার তাহার কুক্ষিগত করিয়াছে। অন্যায়ের যাতনা থাকা সত্ত্বেও অভ্যাস বশতঃ এবং ক্ষণিক ভাবের চাঞ্চল্যতা বশতঃ সত্য রক্ষণে অসমর্থ হইয়াছি। হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতার জন্য এইক্ষণ সাতিশয় কষ্ট বোধ হইতেছে। প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার অন্যথা করা কত নীচতা, ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহা ভঙ্গ করা কত গুরুতর পাপ তাহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। জীবনের এই নীচতা দর্শন করিয়া আজ যার পর নাই কষ্ট বোধ হইতেছে। সত্য ও

ন্যায় সাধন সম্বন্ধে অভ্যাস ও হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই প্রধান অন্তরায় দেখিতেছি। এবং ইহার মূলে সত্যের গুরুত্ব রক্ষা ও তাহার সম্মান না করাই কারণ বলিয়া ঠিক করিয়াছি। একটী সত্য ও একটী ন্যায় জীবন হইতে মূল্যবান। সত্য ও ন্যায়েতেই জীবনের জীবন্ত ভাব এবং তাহাতেই জীবনের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলে কে আপনার মৃত্যু ডাকিয়া আনে? আমরা তাহার প্রকৃত ভাব বিশ্বাস করিলে এইরূপ মৃত্যু কারণে কি যাইতে পারিতাম? প্রথম না বুঝিয়া অসত্যে গমন করি তার পর ইচ্ছা করিয়া তৎপর অভ্যাসের অধীন হইয়া এই বিবিধ নিয়মেই আমরা জীবনের বল ক্ষয় করিয়া মৃত্যুরাজ্যে যাইয়া থাকি। বর্ত্তমান অবস্থা আমাদের অধীন। অভ্যাস প্রবণ জীবন বলিয়াই অসত্যের অন্ধকার দেখিয়া এবং সত্যের আচার দর্শন করিয়াও জীবনের গতি ফিরাইতে পারিতেছি না এই এক বৎসরের চেষ্টায় আমাদের জীবনে যে ফল ফলিয়াছে তাহা দেখিয়া আরও দুঃখ হয়, এবং লজ্জাও হয়। ৩৬৫ দিন অতিবাহিত হইল আমরা সত্য ও ন্যায় রক্ষা করিব বলিয়া আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছি এবং বিশেষরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বৎসর চলিয়া গেল ব্রত পালন দূরে থাকুক সেই অধিকারই আজ পর্য্যন্ত আমাদের জন্মে নাই। কেবল মৃত জীবন জাগ্রত হইয়াছে। অচৈতন্য আত্মার চৈতন্য জন্মিয়াছে এবং জগতের অপ্রকাশিত রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। যে গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত জগত আবৃত ছিল তাহার ভীষণতা বিনাশ হইয়াছে এবং অন্তরে বাহিরেই এক বৈদ্যুতিক ব্যাপার দর্শন করিতেছি—সত্য জানিয়াছি।

কিন্তু জানিলে কি হইবে? দেখিলে বুঝিলেই বা কি হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ না করিলে কি তাহাতে অধিকার না জন্মিলে কোন ফলেরই আশা নাই। প্রকৃতরূপে বলিতে গেলে ইহাকে জাগ্রতাবস্থা বলা যায় না। জাগিলেই কাজ করিতে হয়। চৈতন্য হইলেই খাঁটি পথে গমন করিতে হয় অন্যথা তাহার জাগ্রতের প্রমাণ কি? কার্য্য দ্বারাই জাগ্রত জীবন্ত ভাবের পরিচয় হয় আবার কাজ করিলেই মানুষ জাগিয়া থাকিতে পারে। আমরা যদি এখনও কাজ করিতে অগ্রসর না হই এবং কাজে অসুবিধা দেখিলেই তাহা হইতে নিবৃত্ত হই তবে নিশ্চয়ই অচিরকালের মধ্যেই আমরা ঘুমাইয়া পড়িব। আমরা যে মোহ নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, আবার তাহার ক্রোড়স্থ হইব। এক বৎসরের সাধনে সত্যের ন্যায়ের জ্যোতি কেবল দর্শন করিলাম, কেবল হৃদয়ের অন্ধকার বুঝিতে পারিলাম। এইক্ষণ সেই আলো গ্রহণ করিতে ও অন্ধকার দূর করিতে কত কাল গত করিব? এবং এইরূপ দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করিলে আমাদের এই অস্থির চিত্তে কখনই ধৈর্য্য রাখিতে পারিব না। আশা-ভিত্তির উপর যে ঘর বান্ধিতেছি তাহা কোন কালেও সম্পন্ন হইবে না। সংসারের অবস্থা ও আত্মার অবস্থা দর্শন করিয়াও যদি আবার আমরা নিদ্রাভিভূত হই তবে নিশ্চয় জানিব ইহ লোকে আর এ ঘুম ভাঙ্গিবে না; এ রোগের চিকিৎসা আর রক্তমাংসযুক্ত শরীর থাকিতে হইবে না। সত্য ও ন্যায়ের জ্যোতি পৃথিবীর উপর এইক্ষণ যেরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে লোকের মন যেমন তাহার জন্য লালায়িত হইয়াছে এই অনুকূল অবস্থা আমরা পাইয়া যেন না হারাই শুভকার্য্যের

মাহেন্দ্র ক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া যেন নিজ দোষে এ সুযোগ না ছাড়ি। সুযোগ অতীত হইলে আর তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। ইহা কি জীবনে প্রত্যক্ষ করি নাই জীবনের প্রথম অংশে যে সুযোগ হারাইয়াছি, যাহার জন্য এখনও অনেক সময় খেদ করিয়া থাকি, আমাদের কাতরতা দেখিয়া কি সে সুযোগ ফিরিয়া আসিবে? তাহার জন্য জীবন দিলেও সে আর আসিবে না। এই অবস্থা স্মরণ করিয়া যেন আমরা বৃথা সূচনায় সময় অতিবাহিত না করি। আমাদের হৃদয়ের বল যদি শিথিল হইয়া থাকে তবে উৎসবের এই অনুকূল বায়ু থাকিতেই আমরা বল সঞ্চয় করি। এবং দৃঢ়তার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি। সত্য ন্যায় সাধন সম্বন্ধেও এই হইল যে আমরা ইহার ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। ও অসত্যের আঁধার অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছি কিন্তু প্রেমের বিষয় বলিতে গেলে তাহার ভাব ধারণা করিতেই অদ্য পর্য্যন্ত পারি নাই। প্রেমের আবির্ভাবে হিংসা দ্বেষ অপ্রীতি সকল প্রকার দূষিত ভাব সমূহ বিনষ্ট হয়। যে সকল নীচতার জন্য নরনারী প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিতেছে নানাবিধ অশান্তির কারণ উৎপন্ন করিয়া সর্ব্বদা জ্বালাতন হইতেছে, প্রেমে তাহা সমূলে বিনাশ করিয়া দেয়। যাহার জন্য একে অপরের মতে সহানুভূতি দিতে কুণ্ঠিত হয়, অন্যের কার্য্যে যোগ দান করিতে সঙ্কুচিত হয়, তাহা এই প্রেমের অভাবে হইয়া থাকে। প্রেমে মানুষকে এক আশ্চর্য্য ভাবে রঞ্জিত করে। যাহার প্রভাব সমস্ত জগৎ বশ হইয়া থাকে। শত্রু মিত্র হয় পাপীও বন্ধু হয়, সকল হৃদয় এক হয় সেই প্রেম-সূত্রে গ্রথিত হইয়া সকলে প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া

ভালবাসার সহিত এক কাজে যোগ দিতে পারে। সকল হৃদয় এক সমতল অবস্থায় নীত কেবল প্রেমেতেই হইয়া থাকে। আমরা এই প্রেমের আকর্ষণ জীবনে আনিতে না পারিয়াই এত প্রকার জঘন্যতার মধ্যে বাস করিতেছি।

প্রেমের বিরোধী ভাব সকল এখন আমাদের অন্তরে এত আছে। যাহার কার্য্য দেখিলে আর কিছুতেই আশা করিতে পারি না যে আমাদের জীবনে প্রেমের সাধনা হইতে পারে। প্রেম হইতে আমরা অত্যন্ত দূরে অবস্থিতি করিতেছি। এবার প্রেম ব্রত যে গ্রহণ করিয়াছি তাহা কেবল নাম মাত্র। এই প্রেমহীন হৃদয়ের শুষ্কতা দর্শন করিয়া আমরা বড়ই ভীত ও আশাহীন হইতেছি। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের অপারগতার মূল অন্বেষণ করিলে আবার জীবনে জ্যোতি ধারণের স্বল্পতাই প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। আত্মাতে জ্যোতির হ্রাস হইলেই দুর্ব্বলতা ঘটিয়া থাকে। বাহিরের জ্যোতি যেরূপ প্রাণের সাহায্য করে, প্রাণে আনন্দ দেয়, আশা দেয় এবং বাহ্যিক ভয় বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও জ্যোতির কার্য্য ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। যতক্ষণ ব্রহ্ম-জ্যোতি আত্মার অভ্যন্তরে কার্য্য করে ততক্ষণই আমরা সবল থাকি এবং ততক্ষণই ভয় শূন্য হইয়া আনন্দের সহিত জীবন পথে গতি করিতে পারি। ব্রহ্ম-জ্যোতি আত্মাতে পতিত হইলে সকল আত্মার রস একত্রিত হইয়া প্রেম স্রোতস্বিনীর সৃষ্টি করে। সেই প্রেম নদী প্রবাহিত হইয়াই জগতের শুষ্কতা নাস্তিকতা নষ্ট করত সরস ভাব প্রদান করে। বাসনানলেও উত্তপ্ত ধরাও প্রেমপ্রবাহে স্নান করিয়া শীতল স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করে। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এই

ব্রহ্ম-তেজ বিকীর্ণ রহিয়াছে। আমরা হৃদয় মন জ্যোতি রক্ষণশীল কাচের ন্যায় পরিষ্কৃত ও গুণ বিশিষ্ট করিলেই ব্রহ্ম-তেজ সংগ্রহ করিয়া আত্মার কল্যাণ ও জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারি। নববর্ষে যাহাতে প্রেমের আস্বাদন পাইয়া সকলে মোহিত হইতে পারি তাহার জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। এবার কোন্ কোন্ অংশে আমাদের বিশেষ দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া প্রত্যেকের অনুতপ্ত হওয়া আবশ্যক এবং আগামী বৎসর যাহাতে সেই সকল অপরাধ আমাদের মধ্যে আসিতে না পারে তাহার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া চাই। জীবনের প্রতি এইরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া আর মৃত্যুর পথে কাহাকেও গমন করিতে না হয় তাহার জন্য প্রতি দিন অন্ততঃ একবার করিয়া জীবনের লক্ষ্য ভূমির দিকে তাকান আবশ্যক। এবং অগ্রসরের ভাবও দর্শন করা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রতি দিন কিছু কিছু করিয়া পথ অতিক্রম করিতেছি যদি এইরূপ দেখিতে পাই তবেই আশার কথা তবেই মনে করিতে পারি নির্ব্বানোন্মুখ জীবন প্রদীপ আবার প্রজ্জ্বলিত হইবে এবং প্রেম স্নেহ প্রদান করিলে সেই জ্যোতি স্থায়ীরূপে অনন্তকাল আলো দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবে। যে তিনটী ব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার মধ্যে সত্য ও ন্যায় এই দুইটীর দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যের আবরণ পর্দা উন্মুক্ত হইয়াছে এবং ফল পুষ্প পরিশোভিত স্বর্গীয় বাগান চক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়াছে আমরা এই উন্মুক্ত অবস্থা থাকিতে যদি ফল পুষ্প আহরণের জন্য, যদি সেই রাজ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা না করি তবে আবার অতি সত্বরেই অসত্যের আবরণ

আসিয়া এই স্বর্গীয় বাগান ঢাকিয়া ফেলিবে ও অমৃত ফল হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবে। আমরা এইটী মনে করিয়া যেন প্রাণপণে জীবনের বল প্রয়োগ করতঃ সেই ফলের জন্য ব্যাকুল হইতে পারি। তৎপর তৃতীয় ব্রতের ভাব জীবনে আনিতে না পারিলে কথনই এই সকল সিদ্ধ হইবে না। গত-বার প্রেমের বিষয়ে যে কিছুই নূতন সত্য লাভ করিতে পারি নাই তাহার কারণ জীবনে প্রেমের ভাব না থাকা। আমাদের মধ্যে এইক্ষণ যে প্রেমের ভাব আছে তাহা নির্ম্মল নহে, সংসা-রের মলিনতায় ইহা দূষিত। ইহার ভাব এত অপ্রসস্ত যে কেবল সীমা যুক্ত স্থানে ইহা আবদ্ধ আছে, এবং ক্ষুদ্র স্থানের মধ্যে এ প্রেম কার্য্য করিতে থাকে। যে প্রেমে মনুষ্যকে উন্নত করে—স্বর্গরাজ্যে লইয়া যায় তাহা এইরূপ সংকীর্ণ নহে, সেই প্রেমবাষ্প প্রেম জলধি হইতেই উত্থিত হইয়া পৃথিবীতে প্রেম নদী প্রবাহিত করত জগতের প্রাণে জীবন দান করিয়া আবার অনন্ত প্রেম সাগরে পতিত হয়। আমরা সেই বিশ্ব-জনীন প্রেম লাভ করিতে পারিলে সকল ভ্রাতা ভগিনী একত্রিত হইয়া সেই স্বর্গীয় ফল পুষ্প পরিপুরিত স্বর্গের বাগানে যাইতে পারিব ও ফল লাভ করিয়া অমরত্ব লাভ করিব। একা সে রাজ্যে যাই-বার অধিকার নাই। সকল ভ্রাতা ভগ্নী সম্মিলিত না হইলে সে স্বর্গীয় দ্বার উন্মুক্ত হয় না। প্রেমই আমাদের একত্রিত হইবার সোপান সুতরাং প্রেমব্রত গ্রহণ না করিলে আমরা সকল ব্রত পালনেই অকৃতকার্য্য হইব।

শ্রীঅন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়,
আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

দৃঢ়তা।

কামনা রহিত হইয়া কাজ করা দৃঢ়তা ভিন্ন অসম্ভব সুতরাং ধর্ম্ম জগতের কর্ম্ম-ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়তার উপরে স্থাপিত। ধর্ম্ম জগতের যে বিভাগেই যাও, ইহার অন্যথা কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না। ফলাশা বর্জ্জিত হইয়া কখনও মানব আপনার বলে ধর্ম্ম-রাজ্যে যাইতে সক্ষম হয় নাই। ঈশ্বর প্রদত্ত বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে ও দৃঢ়তার বলে সর্ব্বকালের মানবগণ ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইয়াছে। দৃঢ়তার প্রধান কার্য্য সত্য রক্ষা এবং ধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি সত্য সুতরাং ইহার একের অভাবে ধর্ম্মের অস্তিত্ব অসম্ভব। সত্যে যাইতে হইলে দৃঢ়তার প্রয়োজন। আবার ধর্ম্মে যাইতে হইলে সত্যের প্রয়োজন। সত্য ও দৃঢ়তার এত আনুগত্য সম্বন্ধ যে এই দুইটীর সাহায্য ব্যতীত কোন একটী সৎকার্য্যও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না এই জন্য ধর্ম্ম-জগতের কোন কার্য্য দৃঢ়তা শূন্য মানব দ্বারা কখনও সম্পন্ন হয় নাই। সংসারের কামনার অধীন হইয়া অদমনীয় বাসনার তীব্র উত্তেজনায় সকল প্রকার অসন্তনীয় কার্য্যই আমি আমার এই ক্ষুদ্র বলে এক সময় করিতে পারি, জীবনের ভয় কিছুমাত্র না করিয়া সাধারণ স্বার্থের অপেক্ষা না করিয়া এবং পরিণাম চিন্তা একবারে বিসর্জ্জন দিয়া অতি নির্ভীকের ন্যায় বিপদসাগরের মধ্যেও ঝম্প প্রদান করিতে পারি; শারীরিক মানসিক এবং আর্থিক সকল প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া প্রবৃত্তিগত বৃত্তির উত্তেজনায় শান্তি করিতে পারি, সকলই করিতে পারি। কিন্তু

তথাপি আমার এই অমানুষিক ক্ষমতার ফল নহে। দৃঢ়তায় মানুষকে অমানুষিক ক্ষমতাবান করিয়া থাকে। ইহা ঠিক কথা, কিন্তু তাহা দুই ভাবে নহে দৃঢ়তায় যেরূপ অমানুষিক সংজ্ঞা দেয় আবার দৃঢ়তা হীনতায় সেই সংজ্ঞা দিয়া থাকে দুইয়েরি সংজ্ঞা এক এক; এই এক সংজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়া যে ইহারা কার্য্যতায় একবারেই স্বতন্ত্র তাহা দেখিলে অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে এবং নিশ্চিন্তরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে উভয়ের শক্তি এক নহে এক নীতি এক শক্তি এক পথ অনুসরণ করিয়া উভয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে না সুতরাং প্রত্যেকের নীতি স্বতন্ত্র, শক্তি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র এজন্য কার্য্য স্বতন্ত্র এবং পরিণাম ফলও স্বতন্ত্র। দৃঢ়তায় মানবকে অমানুষিক কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দেব পদবী প্রদান করে আর প্রবৃত্তিগত দুর্দ্দমনীয় শক্তি মানবকে অমানুষিক কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া পশু পদবী প্রদান করিয়া থাকে। একের দ্বারা মানব দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া করণীয় সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করত অবিনাশী অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করে, অপরের দ্বারা মানব নিতান্ত ঘৃণিত কার্য্যের সূচনা করিয়া নিজের অধিকার ও ক্ষমতা লোপ করতঃ বিধ্বংসী মর ভাব আশ্রয় করে। আমরা দৃঢ়তা সাধনের জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এটীও স্থিরতররূপে হৃদয়ে রাখা উচিত যে, কার্য্যে নিষ্কাম না হইতে পারিলে কোনরূপে আমরা দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিব না। মানবের স্বাভাবিক অবস্থায় যদিও ঈদৃশ রীতি নীতি ছিল না বর্ত্তমান অবস্থার ন্যায় এই ভাবে এই অর্থে এ সকল গ্রহণ হইত তথাপি অবস্থার বৈচিত্র্য বশতঃ আজ ইহার অস্বাভা-

বিকল্পকেই সাদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইতেছে। পূর্ব্বে মানবের কামনা বলিতে এই বুঝাইত না যে কামনা তাহার স্বধর্ম্ম ছাড়া এবং বাসনাই তাহার মৃত্যুর কারণ এবং আপনার শক্তির অর্থ এই ছিল না যে তাহার ব্যবহারে তাহাকে শক্তি হীন করে ও বিপথে যাইতে হয়। এই রূপ প্রেম বল, প্রীতি বল সকলই সংসারের কুটিল আবর্ত্তনের মধ্যে পতিত হইয়া কুটিল ভাবে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

এই জন্ম বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে বাসনা রহিত যে কার্য্য তাহাই দৃঢ়তা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাহসের পরা-কাষ্ঠা উৎসাহের জলন্ত শিখা এবং কার্য্যে জীবন উৎসর্গ এই সকল দেখিয়া আর এইক্ষণ আমরা দৃঢ়তার ভাব গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ স্বার্থ প্রণোদিত মানব দ্বারা ইহা সকলই সম্পন্ন হইতেছে। সংসারে কুটিল নীতি অনুসরণ করিয়া বিষয় জ্ঞানের অধীন হইয়া এবং কামনার বশীভূত হইয়া, কত শত মানব অসম্ভবনীয় ব্যাপার সম্ভবে আনিয়া জগতে আশ্চার্য্য অভিনয় রাখিয়া গিয়াছে। বাসনার এই বিষময় দৃষ্টান্ত ও ভাব হইতে সকল প্রকার শক্তি অপ্রকৃতরূপে মানবের মনে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে এবং ফলও বিষতুল্য হইয়াছে। প্রেম প্রীতি ইত্যাদি সমস্ত সৎগুণ গুলিই মানবের দূষিত বাসনা কর্ত্তৃক দংশিত ও কলঙ্কিত হইয়াছে। এইক্ষণ বাসনা বর্জ্জিত হইতে পারিলে পুনঃ আমরা ধর্ম্মের প্রকৃত মিষ্টতা ও স্বাভাবিক ভাব বুঝিতে পারিব এবং কার্য্যেও সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে পারিব। যে কার্য্যের সূত্র লাভ করিয়া আমরা ধর্ম্ম রাজ্যে যাইতে প্রস্তুত হইতেছি, এতদিন সেই সকল কার্য্যের মধ্যেই

নিজের অসাড় বাসনা জড়িত করিয়া ফলের পথ রোধ করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং কার্য্য বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হইয়া ছিলাম। নিজ হইতে কার্য্যের পথ রোধ করিয়া এইরূপে আমরা বিপথে পতিত হইতে থাকি। বাসনা জীবনের প্রতিবাদী হওয়াতেই মানবের এত দুর্গতি হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে একদিকে ধর্ম্ম অপর দিকে কামনা দুই দিক হইতে এই দুইটী প্রতিনিয়ত মানব মন টানিতেছে। কখনও ধর্ম্ম জয়ী হইতেছে কখনও বাসনা জয়ী হইতেছে। ধর্ম্ম জয় লাভ করিয়া পবিত্র সুখ শান্তি প্রদান করে এবং আত্মাকে নির্ম্মল করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে এবং মানব হৃদয়ে প্রকৃত বল প্রয়োগ করে আর বাসনা জয় লাভ করিয়া ভীষণ মুখ ব্যাদান করিয়া জীবনের সমস্ত বল গ্রাস করিয়া ফেলে অথচ একবিন্দু আরাম কি আনন্দ দেয় না। এবং স্থির হইয়া বসিতে একটু সময়ও দেয় না। "ঈশ্বরের কার্য্যের সহিত শয়তানের চির বিবাদ" এই মূল হইতেই বোধ হয় এই বাক্য উৎপন্ন হইয়াছে। ধর্ম্ম-বৃদ্ধিতে মানব ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হয় আবার বাসনারূপ শয়তানের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া মানব পাপ পথে পতিত হয়। মানবের বাসনাই প্রকৃত শয়তান। এই শয়তানের অত্যাচারেই মানবগণ এখন ধর্ম্ম-পথে সহসা অগ্রসর হইতে পারে না। এবং কষ্টে সৃষ্টে একবার অগ্রবর্ত্তী হইলেও আবার পুনঃ স্খলিত পদ হয়। প্রেমই বল আর প্রীতিই বল সকলই এই সর্ব্ব-গ্রাসী বাসনারূপ শয়তানের গ্রাসে পড়িয়া সারহীন হইয়া থাকে। যদি কোনরূপে ফাঁক পাইয়া ইহার ভীষণ গ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে তবে এই অপার্থিব ভাবগুলি

জগতে প্রকাশিত হইতে পারে। সমস্ত জগতে সৌরভ বিস্তার করিয়া পৃথিবীর দুর্গন্ধ দূর করিতে পারে। বাসনার যে অপ্রকৃত স্রোত প্রবাহিত হইতেছে ইহা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্যও আবার দৃঢ়তার আবশ্যক, দৃঢ়তার প্রকৃত বল পাইতে না পারিলে ইহার হাত হইতে কোন ক্রমেই অতিক্রম করা যাইতে পারে না। দৃঢ়তার স্বাভাবিক শক্তি জীবনের লক্ষ্য-স্থান ঠিক রাখে এবং সকল জীবনের সামঞ্জসীভূত কার্য্য ফল উৎপন্ন করে। দৃঢ়তার বলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য করিয়া এবং বিভিন্ন প্রকার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া একরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাসনার ভিত্তি সর্ব্বদা অস্থায়ী তাহার পরিণামও অনিশ্চিত। এক এক জীবনের মধ্যে ইহার ক্রিয়া এক একরূপ প্রকাশ পায়।

অন্ধকার হইতে বাসনার উৎপত্তি হইয়া অন্ধকারে ধাবিত হইয়া থাকে এবং ফলও অন্ধকারের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু দৃঢ়তার একটী ভাবও ইহার ন্যায় অনিশ্চিত নয়। সত্যের জ্যোতি ভিন্ন দৃঢ়তার গতি অসম্ভব, যেমন নাবিক একটী নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিশাল সমুদ্র অতিক্রম করে সেই রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সুবিজ্ঞ মানব ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিষম তরঙ্গান্বিত ভবসমুদ্রের অসত্য অন্যায় তরঙ্গাঘাত উল্লঙ্ঘন করিয়া পার হইয়া থাকে। নক্ষত্রে দৃষ্টি রাখার জন্য যেমন নাবিক একটুমাত্র দিগভ্রান্ত হয় না আপন গন্তব্য পথ বিস্মৃত হয় না সেইরূপ ঈশ্বর বিশ্বাসী এই বিশাল ভবসমুদ্রে সহস্র বাধা অসংখ্য প্রলোভন মধ্যে পতিত হইয়াও আপনার পথ হারায় না ও নক্ষত্র ভ্রষ্ট হয় না।

আমাদের বড় ভ্রম যে দৃঢ়তার ভাব ও দৃঢ়তার কার্য্যকে আমরা কর্কশ বলিয়া বুঝিয়া থাকি। বাস্তবিক দৃঢ়তার মধ্যে কর্কশতার কিছুই নাই। প্রকৃত দৃঢ়তা যাহাকে বলিয়া থাকি তাহার ভাব ও কার্য্য এত মাধুর্য্য পূর্ণ ও রমণীয় যে তাহা দেখিয়া মানব মন না গলিয়া থাকিতে পারে না। দৃঢ়তার দ্বারা যে মানব রক্ষিত হইয়া থাকে তাহার হৃদয়কানন কমনীয় ফলপুষ্পে এমন শোভাযুক্ত হয় যে, যে তাহাকে দর্শন করে সেও তাহার ফল ভোগী কিছু পরিমাণে হয়। হৃদয়ের যে যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে সমস্ত জগৎ মাতাইয়া তুলে তাহা দৃঢ়তার সাহায্যে স্ফুটিত। হৃদয়ের যে ফল সমস্ত জগতের নরনারীকে তৃপ্তি দান করিয়া থাকে তাহা দৃঢ়তা প্রসূত। দৃঢ়তা ব্যতীত হৃদয়-কাননের একটী ভাব বিকসিত হইতে পারে না। মহাত্মা চৈতন্য দেবের হৃদয়ে প্রেমের ফুল বিকসিত হইয়া মানব মন পুলকিত করিয়াছিল। সৌরভে সমস্ত পৃথিবী মাতাইয়াছিল এ সকলই দৃঢ়তার বলে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। যে প্রীতি পুষ্প মহাত্মা বুদ্ধদেবের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তদ্দ্বারা অগণ্য নরনারীকে মোহিত করিয়াছিল ও প্রেমে সকলকে মোহিত করিয়াছিল এই সকলই দৃঢ়তার বলে। দৃঢ়তার শক্তি ভিন্ন ইহার একটীও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মানবের সৌন্দর্য্য মানবের ক্ষমতা মানবের অমরতা এ সকলি দৃঢ়তা দ্বারা বর্দ্ধিত প্রসারিত ও স্থাপিত হয় আমরা অভিনিবিষ্ট চিত্তে দেখি না বলিয়া এই গূঢ় তত্ত্বের মর্ম্মভেদ করিতে পারি না এবং না বুঝিয়া বাহিরে থাকিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি দৃঢ়তা বড়ই কঠিন। অমুক দৃঢ়তা সাধন করিয়া

এমন রুক্ষ ভাব ধারণ করিয়াছে যে কেহ তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আর সুখ পায় না। হৃদয় পাষাণ হইতেও যেন কঠিন হইয়াছে। এই জ্ঞান যদিও পৃথিবীর অবস্থা হইতেই আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে বটে কিন্তু তথাপি এরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ না করিয়া বিশেষরূপে ডুবিয়া দেখা আমাদের প্রত্যে-কের উচিত; মানবের স্বেচ্ছাচারীতা প্রযুক্ত পৃথিবীর স্বাভা-বিক তত্ত্ব অবগত হওয়া সহজ সাধ্য নয়। মূলাধারে গমন ভিন্ন এ রহস্য উদ্ভেদ করা অসম্ভব কথা, সকলই সুদূর পরাহত। আমাদের জ্ঞানের এমন জ্যোতি নাই যে সহসা এ তত্ত্ব ছাকিয়া লয়। এই অপরিবর্ত্তনীয় সৃষ্ট রাজ্যের সকল তত্ত্ব রহিয়াছে বুঝিলে সকলই পাওয়া যায়। পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হওয়া যায় কিন্তু না জানিলে কেমন করিয়া জীবনের এই অভাব পূর্ণ হইতে পারে? মানবের যে শক্তির মূলে কমনীয় ভাব নাই, হৃদয়ে আকর্ষণী মাধুর্য্যভাব নাই তাহা দৃঢ়তামূলক নহে ইহা আমাদিগকে স্বতই বিশ্বাস করা উচিত। বিবেচনা কি যুক্তি লইয়া মীমাংসা করত বুঝিতে যাওয়া কোনরূপেই হইতে পারে না। হইলে জানিব সহজ পথে আমি অবস্থিত নাই। দৃঢ়তা ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি। ইহার মূলে ভ্রান্তি নাই, কঠিনতা নাই, মলিনতা নাই এবং ইহার গতির বিরাম নাই। এ শক্তি ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে। অনন্তকাল ঈশ্বরের আদেশ পালন করিয়া তাহার দিকে গমন করিবেক। এ শক্তিতে যে চালিত হইবে সেও তাহার সাহায্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল উদ্দেশ্য পালন করতঃ অনন্তকাল তাঁহার দিকে ধাবিত হইবে। সাধারণতঃ যে শক্তিকে আমরা দৃঢ়তার শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়া

থাকি তাহা মানবের ইচ্ছা সম্ভূত বল। একের স্বার্থ কিম্বা জাতীয় স্বার্থ কি দেশীয় স্বার্থ এইরূপ এক দেশার্থ স্বার্থ এই সকলের মূলেই ইচ্ছার বল কার্য্য করিতে থাকে। এজন্য নর নারীগণ আবদ্ধ হইতে পারে না কি কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। এক জনের স্বার্থে যখন একটী শক্তির কার্য্য আরম্ভ হয় তখন আমরা তাহার মূলে বৈষয়িক বল দর্শন করিয়া তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি ও তাহার মধ্যে বাসনার গরল সম স্রোত বহিতেছে এরূপ প্রতীতি করিতে পারি। আবার যখন আর একটী স্বার্থমূলক শক্তি একটী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া কার্য্যে বল প্রকাশ করিতে লাগিল অমনি তখন আমরা তাহার মধ্যে একটু মহত্ত্ব দেখিতে পাইলাম এবং তৎপর দেশীয় মহান্ শক্তির নিকট আমরা এক বারেই গলিয়া গেলাম, ভাবিলাম ইহাদের অন্তর কত উন্নত হইয়াছে, হৃদয় কত প্রশস্ত হইয়াছে স্বজাতির জন্য দেশের জন্য কান্দিতে শিখিয়াছে, এবং আবশ্যক হইলে প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নহে। শক্তির উন্নতির চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠার স্থল! এবং নিস্বার্থে জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। মানিলাম নিজ স্বার্থ চেয়ে ইহা অত্যন্ত উদার এবং একের ক্ষুদ্র স্বার্থ হইতে সংস্রগুণে শ্রেষ্ট তথাপি কি স্বার্থের দুর্গন্ধ ইহার মধ্যে বাস করিতেছে না? বাসনার পুতিগন্ধ কি উহার মধ্যে মিশ্রিত নহে। যে বাসনানল একের ক্ষুদ্র হৃদয়ে সম্প্রদায় ছাড়িয়া দেশনয় ছাইয়া ফেলিয়াছে তাহাতে কি? তাহাতে বাসনা অগ্নির তেজের কি ক্ষমতা হইল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ব্যতীত এ অগ্নির নির্ব্বাণ কোথায়? যে অগ্নি একের হৃদয়ে থাকিয়া একের হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল সময়ে সম্প্রদায়ে তাহা

বেড়িয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পরে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া সকল হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল কিন্তু অগ্নি দ্বারা কি কখনও পাপ অসত্য দগ্ধীভূত হইতে পারে ও জগতে শান্তি স্থাপন করিতে পারে? অথচ এ শক্তি বল সামান্য নহে। দেশ দেশান্তর এ অগ্নির তেজে ভস্মীভূত হইতে পারে। যে শক্তির বলে দেশ পাপপঙ্কে কর্দ্দমিত হয়, যে শক্তির বলে দেশ অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে, যে শক্তির বলে শান্তি দেশ হইতে পলায়ন করে; বাস্তবিক তাহা করুণাময় ঈশ্বর প্রসূত নহে। সর্ব্ব-জনীন কল্যাণ-প্রদ যে শক্তি তাহাই ভগবান প্রদত্ত শক্তি এবং সেই শক্তির নাম দৃঢ়তা।

এই দৃঢ়তা দ্বারা যিনি রক্ষিত তাহার মধ্যে পাপ অন্যায় অসত্য সকলই অসম্ভব এবং পৃথিবীর স্বার্থ মূলক শক্তিও অসম্ভব। আর দৃঢ়তা দ্বারা যিনি চালিত তাহার গতির বিরাম নাই কার্য্যের অভাব নাই; তিনি বিধাতার বিশ্বজনীন ভাবে প্রণোদিত হইয়া বিশ্বপ্রেম বিশ্বপ্রীতি লাভ করত হৃদয়কে প্রকৃত শান্তির ক্ষেত্র করিয়া থাকেন এবং শান্তিফল প্রাপ্ত হইয়া আত্মাকে অমর করেন। দৃঢ়তা এক অংশে রক্ষা করা যাইতে পারে না। আমি জীবনে প্রতি কার্য্যে কিছু না কিছু পরি-মাণে সত্য রক্ষা করিয়াছি। তাই জীবনের কার্য্য সত্য পথে থাকিয়া সম্পন্ন করিয়াছি এরূপ বলিতে পারিব না এবং আমাদের কার্য্যের মূল তদ্রূপ ছড়াইবে না। অসত্য মিশ্রিত যে সত্য তাহার ফল সত্য হইতে পারে না সে শক্তি আর বিকাশ পাইতে পারে না, বিন্দু পরিমাণ পাপ জল হৃদয়ে প্রবেশ করিলে কালে হৃদয় পূর্ণ করিয়া ভব সমুদ্রে ডুবিয়া থাকে।

যেমন একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা জল সঞ্চয় হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকাগুলি ডুবিয়া যায়। সেইরূপ পাপ-জলে মানব জীবনও ভব সমুদ্রে ডুবিয়া থাকে সুতরাং একটী ভাব কি কার্য্য সত্য মূলক দর্শন করিলে কিম্বা কোন এক সত্য ব্যবহার দেখিতে পাইলে আমাদের মনে করা উচিত নয় যে তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্যমূলক ও সকল অংশে পূর্ণ। প্রতি কার্য্যের সকল অংশ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে ভুল ভ্রান্তি বাহির হইয়া থাকে। দৃঢ়তা মূলক যে কার্য্য তাহা কোন বিশেষ জীবন বিশেষ পরিবার বিশেষ সম্প্রদায় কি দেশে আবদ্ধ নহে। সকল কালে সকল অবস্থায় ইহার বল সমান কার্য্য করিয়া থাকে এবং সাধারণ মূল সত্য ইহার মূল ভিত্তি।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়,

আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

রামায়ণ

অবলম্বনে লিখিত।

সত্যরূপ ভিত্তিতে মনুষ্য একবার দণ্ডায়মান হইতে পারিলে এই সংসারের প্রলোভন, পৃথিবীর অতুল ঐশ্বর্য্য, পার্থিব আপাতরম্য নানা প্রকার ভোগ বিলাস এই সমস্তই যে তাহার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষিত হয় ইহার প্রকৃত আকর্ষণ ও যে পরাস্ত হয়, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র রাজার উন্নত জীবন। তাঁহার অসাধারণ জীবন

পাঠ করিলে আমরা সত্যের বল অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারি। সত্যের দৃঢ়তা, সত্যের উচ্চতা অনেক পরিমাণে জানিতে পারি। তাঁহার সেই উৎকৃষ্ট সত্য জীবন আমাদের একটী আদর্শ আলেক্ষ্য। তিনি রাজার গৃহে রাজার অতুলনীয় ধন রত্ন রাশির মধ্যে প্রথম ভূমিষ্ঠ হইলেন। প্রথম চক্ষু উন্মিলিত করিয়া কি দেখিলেন না রাজার বিলাসপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধ শ্রেণী নানা ধন রত্নে মণ্ডিত হইয়া রাজভবন উৎভাসিত করিতেছে। ভূমিষ্ঠ হইয়া তিনি রাজভোগে পালিত, রাজশয্যায় শায়িত এবং রাজচালে চালিত হইতে লাগিলেন। প্রথম পানাহারের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের স্রোত তাঁহার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল, সেই ভাবের প্রবলবেগের মধ্যে থাকিয়াসেই বায়ু সেবন করিয়া সেই আহার উদরস্থ করিয়া সকল প্রকার রাজাবস্থায় অবস্থিতি করিয়া তিনি দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি সংসারের প্রবল প্রলোভনের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহার ভাবে ভারত আজও মোহিত এবং উন্নত মস্তকে স্মিতমুখে জগতের নিকট গৌরবের সহিত পরিচিত হইতেছে। তিনি যে সত্য জ্যোতি লাভ দ্বারা এই মর জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন, অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে এমন অসার এমন দুর্ব্বল কোন্ হৃদয় আছে যে উল্লসিত উৎসাহিত না হইয়া থাকিতে পারে? আমরা যে এত অসাড় হইয়া পড়িয়াছি হৃদয়ের সরল ভাব একেবারে শুষ্ক প্রায় হইয়াছে তথাচ এ চিত্র দেখিয়া হৃদয় উথলিয়া উঠে, আনন্দে আশ্বাসে হৃদয় মাতিয়া উঠে। সেই সত্যের

সত্য পরম সত্যকে লাভ করিয়া তাহার সত্য মত পালন করিয়া এ জীবনেকে মুক্ত করিবার জন্য মন নিতান্ত ব্যাকুলিত হয়। মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র রাজার সকল অবস্থাই প্রতিকূলে ছিল। সংসারের যে সকল অবস্থাকে ধর্ম্মের অন্তরায় বলিয়া থাকে, বলিতে গেলে সে সমস্তই প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল; সেই প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে থাকিয়া তিনি প্রকৃতির কোলেই লালিত পালিত হইয়াছিলেন ঘোর বিলাসিতার মধ্যে থাকিয়াও তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য প্রকৃতির সত্য সরলতার তত্ত্ব জানিয়াছিলেন। যে ঐশ্বর্য্য অনেকের বিনাশের কারণ হয়, মৃত্যুবান হয়, সেই ঐশ্বর্য্যের মধ্য দিয়া তিনি জীবনের জ্যোতিকে পাইয়াছিলেন, সুতরাং যাহা প্রতিকূলে ছিল সত্য জ্যোতি পড়িয়া তাহা অনুকূলে আসিল। মৃত্যু অমৃতে পরিণত হইয়া অমরতা আনিয়া দিল। এক সত্য লাভ করিয়াই তিনি সমস্ত কার্য্য এবং জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। রাজ্য কেন, ধন রত্ন কেন, বিপুল ঐশ্বর্য্য কেন সকলেরই গুরুত্ব জানিতে পারিয়া তদনুযায়ী কার্য্যকরতঃ সংসারকে আবার শান্তির সংসার করিয়া তুলিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে প্রজাগণ সুখে শান্তিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কাহার কোন অভাব আছে কি অসুখের কারণ আছে ইহা এক দিনের তরেও কেহ কখনও জানিতে পারে নাই।

ধর্ম্ম যে রাজ্যের মূল ভিত্তি, পরোপকার করাই যে রাজ্যের মূল মন্ত্র ও সকল মনুষ্যের সাধারণ সম্পত্তি সে রাজ্যের আবার অভাব কি? দুঃখই বা কি? যে রাজ্যের উপর বিশ্ব-রাজার দৃষ্টি পড়িয়াছে, প্রত্যেক কার্য্য বিভাগের মধ্য দিয়া তাঁহার

উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইতেছে, তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়, পবিত্র কার্য্য সকল কার্য্যের মধ্যেই সাধিত হইতেছে; কাজেই সেই রাজ্যে কোন অভাব কি অমঙ্গল ভাব কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। এইরূপে মহাত্মা সুখে শান্তিতে ঈশ্বরের পুত্র হইয়া ভ্রাতঃ নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মপথে থাকিতে গেলে সংসার দুর্গমপথে অনেক সময় অনেক পরিক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়। বাস্তবিক সময়ে সময়ে এইরূপ পরীক্ষা অতীব মঙ্গল জনক—কারণ মনুষ্যগণ ধর্ম্ম পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ অলক্ষিতরূপে আত্ম গরিমায় এরূপ ভাবে নিপতিত হয় যে কেহ কিছুতেই তাহার প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না সুতরাং সেই ভ্রমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কোন উপায় দেখিতে পায় না এবং আস্তে আস্তে ধর্ম্মভাবের শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধর্ম্মপথ হইতে চ্যুত হইয়া দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হয়। এই জন্য মধ্যে মধ্যে অগ্নি পরীক্ষা আবশ্যক হয়। সাধকগণের পরীক্ষা দ্বারা গৌরব বর্দ্ধিত হয় ও উজ্জ্বল হয় এবং পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা শক্ত হইয়া আপন আপন কার্য্য সাধনে সক্ষম হন। পরীক্ষা দ্বারা স্বর্ণের গুরুত্ব অধিক, আদর অধিক, এবং কলঙ্ক রহিত হয়।

পরীক্ষার মধ্য দিয়া দুইটী কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে প্রথম শিথিল অঙ্গের উত্তেজন, দুর্ব্বলতার পরিহার; দ্বিতীয় কপটতার মূলচ্ছেদ ও কুটিলতার সর্ব্বনাশ হয়। স্বর্ণে যেমন অন্য পদার্থ থাকিলে পরীক্ষায় তাহা নিশ্চয়ই বাহির হইয়া পড়ে। আর খাটি স্বর্ণ যত পরিক্ষাতেই ফেলি না কেন কখনই যেমন

তাহাকে রূপান্তরিত করিতে পারিব না সেইরূপ সংসারেও প্রবল পরীক্ষাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া এই প্রকার ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। যে সাধক পরীক্ষাতে জয়ী হইলেন, খাঁটি হইলেন, তিনিই বাস্তবিক সাধক হইয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করতঃ প্রকৃত আলোক বিকীর্ণ করিয়া জগতকে মোহিত করিলেন এবং পরবর্ত্তী ভ্রাতা ভগ্নীগণের জন্য প্রকৃত অমূল্য ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গেলেন। তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র এবং সকলের পথ প্রদর্শক হইয়া চিরকালের জন্য সকলকে প্রেম রজ্জুতে বান্ধিয়া গেলেন। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র যখন সংসারে সুখ শান্তিতে বাস করিতে ছিলেন তখন তাঁহার ধর্ম্মবল পরীক্ষার জন্য এক গুরুতর মহা পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল। যে কঠিনতম পরীক্ষা তাঁহার জীবনের উপর দিয়া সাধিত হইতে চলিল, তাহার স্মরণেও আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তিনি প্রতাপান্বিত মহারাজা হইয়া সত্য পালনের জন্য নিতান্ত হীন বেশে ভিখারীর বেশে একমাত্র প্রাণ প্রতিম পুত্র ও সুখদুঃখ-ভাগিনী ভার্য্যা সব্যাকে সঙ্গে করিয়া রাজ্যত্যাগী হইলেন। তাঁহার সুখঐশ্বর্য্য সকলই পড়িয়া রহিল। সকলই রহিল এইজন্য তাঁহার প্রাণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই, কি কনিকা মাত্র কষ্ট বোধ করে নাই। এই সকল ধন রত্নের সুখৈশ্বর্য্যের মায়া ছাড়িতে তাঁহাকে কিছুই চেষ্টা করিতে হয় নাই। কারণ এসকলের প্রতি, তাঁহার অযথা মায়া কখনও জন্মে নাই। তিনি প্রথম হইতেই ইহার অযথার্থ ভাব জানিয়া কার্য্য করিতে ছিলেন। তিনি প্রধান আঘাত পাইয়া ছিলেন এই যে চির-দিন যে কার্য্যকে জীবনের সম্বল করিয়া ছিলেন যে কর্ম্ম

সাধনে তাঁহার প্রাণে একমাত্র আনন্দ আহ্লাদ প্রদান করিত, সেই প্রজাগণের জন্যই প্রাণ ব্যথিত হইয়াছিল ; পাছে তাহারা কষ্টে পড়ে পাছে তাহাদের অভাব সকল দুর না হয় এই চিন্তা তাঁহাকে কিছুকালের জন্য ম্রিয়মান করিয়াছিল। ধর্ম্মপরায়ণা জীবন সঙ্গিনী সব্যা ও রুহিতাস্ত পুত্রের জন্য তাঁহার হৃদয় ইহার ন্যায় এক আনিও কান্দে নাই। তাঁহার পত্নীর প্রবল ধর্ম্ম ভাব। প্রথমতঃ সব্যার নিকট সংবাদ দিতে যদিও তিনি কুন্ঠিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু সেই সঙ্কুচিত অবস্থা তাঁহাকে অতি অল্প সময় ভোগ করিতে হইয়াছিল। যখন শুনিলেন তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী আরও দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আহ্লাদের সহিত এ কার্য্যে সহানুভূতি প্রদান করিলেন, অম্লান বদনে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া সত্য পালনের জন্য ব্যাকুল হইলেন তখনই তাঁহার অন্তরের দুর্ব্বলতা ঘুচিয়া গেল। একজন রাজার পক্ষে যদিও এই সকল অবস্থা অতি ভয়ানক কষ্টপ্রদ বলা যায় তথাপি তাঁহার পশ্চাতে আরও যে সকল কঠোর অবস্থা ঘটীয়াছিল তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নহে। রাজ্য ত্যাগ ও সত্য রক্ষা তাঁহার শেষ নহে। দক্ষিণার জন্য যে সত্যে বদ্ধ হইলেন তাহা পালনের জন্য স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিলেন নিজে বিক্রীত হইলেন। সকলের অর্থ একত্র করিয়া সত্য ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন। নিজকে যেরূপ স্থানে যেরূপ কার্য্যে বিক্রীত করিলেন, ভাবিলে,—সাধারণ মানবের মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়। সেই ভয়ানক অবস্থায় অবস্থিত হইয়া মনুষ্য জীবনের মধ্যে যাহা হইতে আর নীচ কর্ম্ম নাই সেই কার্য্য সাধন করিয়া কিরূপে ব্রত পালন করিলেন। তাহার পর পুত্র পত্নীর সহিত

যে ভাবে মিলিত হইলেন সে হৃদয় বিদারক ভয়ঙ্কর চিত্র দেখিয়া কে স্থির থাকিতে পারে? সেইখানেই তাঁহার জীবনের শেষ অঙ্ক জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত হইল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া ধর্ম্মের জয় নিশান, সত্যের জয় নিশান উড্ডীন করিলেন। তাঁহার জীবনের এই গুরুতর পরীক্ষা আমাদের জীবনে চিরস্মরণীয়। সত্যের বল কত, ধর্ম্মের বল কত সেই বলের কাছে সংসারে পার্থিব প্রবল বল যে কিছুই না এই মহাত্মার জীবন পাঠ করিলেই সকলে তাহা জানিতে পারি। এই চিত্র দেখিয়াও কি কেহ নিশ্চেষ্টের ন্যায় আর থাকিতে পারেন? অসত্য সংসারে ভুলিতে পারেন? সংসারে যাহাকে প্রলোভন বলে সেই প্রলোভন তাঁহার কি পরিমাণে ছিল। তাহার তুলনায় আমাদের প্রলোভনের সামগ্রী কি আছে? এই ক্ষুদ্র সংসারক্ষেত্রে থাকিয়া সামান্য সামান্য প্রলোভনেই যদি আমরা মুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে অপারগ হই তবে জীবনের অবস্থা কি বুঝিব? এই সামান্য প্রলোভনের হস্ত হইতেই যখন মুক্ত হইতে পারিলাম না অকারণ মায়াপাশ ছিন্ন করিতে সক্ষম হইলাম না তখন এ জীবনে আশা কি ভরসা কি। বুঝিয়াছি সত্যের বান্ধ দৃঢ় না হওয়াই আমাদের সকল দুঃখের কারণ সকল দুর্ব্বলতার মূল। প্রলোভন ছোট বড়তে কি করিবে প্রকৃতরূপে সত্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে না পারিলে আর উদ্ধার নাই। এই মন্ত্র জানিয়া মহাত্মাদিগের জীবনের বল জানিয়া সত্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম সত্যস্বরূপ পিতা সন্তানগণকে সুস্থ করুন।

প্রকৃত শিক্ষা।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষালয়ের অভাব নাই, শিক্ষার্থীরও অভাব নাই, চতুর্দ্দিকেই শিক্ষার জন্য নানাবিধ পথ প্রস্তুত হইতেছে। নগরে, গ্রামে, পল্লীতে যেদিকে চাই শত শত শিক্ষালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। শিল্প বল, বিজ্ঞান বল, রাজনৈতিক বল, কৃষিতত্ত্ব বল, কি বিষয় বাণিজ্যই বল এই প্রকার বহুবিধ বিষয়ে শিক্ষার জন্য নানাপ্রকার বিদ্যালয়, নানাপ্রকার সভা ইত্যাদি সংস্থাপিত হইয়াছে। আজ ভারতক্ষেত্র নূতন সাজে সজ্জিত, নূতন ভূষণে ভূষিত হইয়াছে, নূতন গঠনে গঠিত নূতন চালে চালিত হইয়াছে। আপাততঃ সমস্তে কেবল সুখের প্রহেলিকা, আনন্দের ঢেউ অনুভূত হয়, যে দিক পানেই তাকাই সকল যেন আমাদের অনুকূলে চালিত হইয়াছে। এই সকল অবস্থা দেখিয়া কাহার না হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়? আশাতে কাহার না মন নাচিয়া উঠে? এইক্ষণ শিক্ষার জন্য সকলেই ব্যাকুল, নূতন নূতন পথ আবিষ্কৃত করিবার জন্য সকলেরই আন্তরিক ব্যগ্র ভাব দেখিতে পাই। এটীও আমাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূলাবস্থা বলিতে হইবে। সকলইত অতি মনোরম বলিয়া বুঝিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাই কি ঠিকরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? কখনই না।

অতি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে প্রত্যেকের মধ্যেই বিষাদের রেখা স্তরে স্তরে সাজান দেখিতে পাই। যে শিক্ষার বলে আজ এই পার্থিব জগতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে

শিখিয়াছি এবং যাহার প্রসাদে সকল প্রকার বৈষয়িক নানা প্রকার উন্নতি সাধন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি করিয়াছি এবং যাহার প্রসাদে সকল প্রকার বৈষয়িক সুখ স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি, যে শিক্ষায় আমাদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা বাড়িয়াছে, আমাদের অনেক প্রকার কুসংস্কার, অন্ধতা চলিয়া গিয়াছে এবং যে শিক্ষায় আমাদের জ্ঞান গুলি বিকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আজ সে শিক্ষার গুণেই আবার বর্ত্তমান শিক্ষায় আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। ইতিপূর্ব্বে যাহাকে অতি মনোরম বলিয়া বুঝিয়া ছিলাম, যে স্রোতকে সুখের একমাত্র কারণ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম এইক্ষণ বিশেষরূপে ডুবিয়া দেখিলাম প্রত্যেকের মধ্যেই আমাদের দুঃখের প্রবাহ মিশ্রিত রহিয়াছে আমাদিগকে প্রকৃত লক্ষ্য স্থান হইতে চ্যুত হইবার জন্য সমস্ত আয়োজনই সংঘটিত হইতেছে। বৈষয়িক-শিক্ষায় বিষয় তৃষ্ণা এতই বৃদ্ধি হইয়াছে যে সর্ব্বদাই যেন বিষয় লালসা হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এই সকল বিষাদের আঁধার দেখিয়া মন স্তম্ভীত হয়, ভীত হয় এবং নিরাশার সাগরে ডুবিয়া যায়। সাধারণতঃ শিক্ষার দুইটী বিভাগ দেখিতে পাই, একটীর দ্বারা শারীরিক বৈষয়িক বিষয়ে উন্নতি সাধন অপরটীর দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি সাধন, একের দ্বারা শরীরের পুষ্টি অপরের দ্বারা আত্মার পুষ্টি। এইক্ষণ যত প্রকার শিক্ষা হইতেছে তাহাতে কেবল এই একটী বিভাগের উন্নতি সাধিত হইতেছে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র প্রকার কোন শিক্ষালয় কি কোন প্রকার সুবিধা এ

পর্য্যন্ত হয় নাই, অধিকন্তু এইরূপ শিক্ষায় যে সাধারণ সত্য লাভের উপায় আছে সে বিভাগেও এ বিষয়ে পথ রুদ্ধ রহিয়াছে। যে শিক্ষাই হউক না কেন প্রত্যেকের মধ্যেই এই দুইটী বিষয় নিহিত থাকে, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সে শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল লুক্কায়িত হইয়াছে; অবস্থার চাপে পড়িয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে! আমাদের শোকের অবস্থা ব্যতীত আর কি দেখিব? বহুদিন বহুকাল হইতে আমরা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছি, মূল সত্যহারা হইয়াছি, কর্ত্তব্য জ্ঞান হইতে চ্যুত হইয়াছি এবং গৌণে পড়িয়া আত্মার সৌন্দর্য্য পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া বিষয়ের ভীষণ আঁধারে নিপতিত হইয়াছি। যে আত্মাকে বিবিধ ভূষণে সাজাইবার জন্য, যে আত্মাকে স্বর্গীয়ভাবে অনুরঞ্জিত করিবার জন্য, অমর করিবার জন্য, এই অসীম বিষয় রাজ্যের সৃষ্ট হইয়াছে। আমরা কি না সেই আত্মাকে ছাড়িয়া বিষয়কেই সার করিয়া বসিয়াছি এবং বিষয় বিষের কুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়া আপনার মৃত্যু আপনারাই ডাকিয়া আনিয়াছি। এই শোচনীয় অবস্থাগুলি যখনি স্মরণ করি, যখনই চিন্তা করি তখনই নিজেরা যে থাকিতেও মরিয়াআছি, আত্মতত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি ইহা বুঝিতে পারি। আজ আধ্যাত্মিক বিষয়, আত্মার বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিলেও আমাদের সাধ্য নাই যে প্রকৃত ভাব, প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া উঠি। একে আহারাভাবে আত্মা মৃত্যুমুখে পতিত—তাহাতে আবার বিষয় মরুভূমিতে নিপতিত হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে মরীচিকা দেখিয়া ভ্রান্ত হইতেছি। আলেয়ার আলো যেরূপ মনুষ্যদিগকে ভুলাইয়া থাকে বিষয়ের আলো তাহার বাহ্যিক চিত্ত মুগ্ধকারিণী

শক্তি দ্বারা সর্ব্বদা ভুলাইয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত আলো, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হইতে বহুদূরে রাখিয়াছে। আমরা যদি সেই মায়াবিনীর মায়া দ্বারা ভ্রান্ত না হইতাম, যদি আধ্যাত্মিক পথগুলি বিষয়ের আবর্জ্জনা কর্ত্তৃক রুদ্ধ না হইত, যদি চালকদিগের শক্তি নিস্তেজ না হইত, এবং নির্ণয়ের ভ্রম না থাকিত, তবে এই আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের কি আবশ্যক ছিল? আজ যে আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় স্থাপনার দরকার বোধ করিয়া স্থাপনের জন্য প্রয়াস পাইতেছি এবং কত প্রকার অভিযোগে অভিযুক্ত হইতেছি, তখনও কি ইহার ভাব বুঝাইতে কাহারো আবশ্যক হইত? কিম্বা এইজন্য তাদৃশ বিদ্রূপ ব্যঙ্গোক্তি চতুর্দ্দিক হইতে বর্ষিত হইত? যাহা হউক কালের কুটিল আবর্ত্তনেই হউক, আর শিক্ষার বৈচিত্রবশতঃই হউক যেরূপেই হউক, আমাদের নিজ নিজ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। এইক্ষণ আমাদিগের সেই হৃতসম্পত্তি উদ্ধারের জন্য সকলেরই প্রাণগত চেষ্টার আবশ্যক, বুদ্ধির আবশ্যক, জ্ঞানের আবশ্যক ও পথের আবশ্যক। আমরা এই সকল অভাবের মোচন মানসে এই আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়াছি। এই বিদ্যালয় দ্বারা আমাদের সেই উদ্দেশ্য, সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে, ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আপাততঃ যদিও এই বিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালীগুলি অতি কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে এবং জীবনে তাহা সাধন অতিশয় শক্ত ব্যাপ্যার বলিয়া মনে হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত পক্ষে কঠিনতার কিছুই নাই। যাহা মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি, স্বাভাবিক শক্তি, স্বাভাজিক স্ফূর্ত্তি হইতে জাত, যাহা মানবের সুখকর, শান্তিকর,

আরামকর, যাহা আপনা হইতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তাহার জন্যও কি আবার কষ্ট কল্পনা সাপেক্ষ ?

হায়! কেন এই দৃশ্য! আর পারি না, এই ভয়ানক চিত্র আর সহ্য হয় না—বরং ইহার বিরুদ্ধে যাওয়াই মনুষ্যের পক্ষে অতি কঠিন কথা ছিল। কোথায় বিপক্ষে যাওয়াই আমাদের কঠিন ছিল; আর কোথায় স্বপক্ষে যাইতেই আজ এত বাধা এত বিঘ্ন, এত শক্ত ব্যাপার দেখিতেছি এবং কত অন্তরায় মনে করিয়া হতাশ্বাস হইতেছি। আমরা মুখ্যোদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াই সমস্ত সংসারের ঘটনা স্রোতে এতদিন ক্রীড়া করিয়াছি, সুতরাং কোন বিষয়েতেই প্রকৃত সুখ প্রকৃত শান্তি পাই নাই; সুখশান্তির জন্য যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছি, তাহাদের সকলেই বিষ-দন্তে দংশন করিয়া এত দিন জ্বালাইয়াছে। যদি এতদিন আত্মার দিকে দৃষ্টি থাকিত, যদি প্রথম হইতে তাহার গতি তদনুযায়ী করিতাম তবে সমস্ত ব্যাপারই তৎপশ্চাৎ গমন করিয়া প্রকৃত ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিত।

মনুষ্য যে সকল রত্ন লাভ করিলে এই পৃথিবীতে থাকিয়াই স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিতে পারে, প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারে, সেই অপার্থিব অমূল্য রত্ন সত্য, ন্যায়পরতা, সরলতা, স্বাধীনতা, বিনয়, ভক্তি, প্রেম, প্রীতি ইত্যাদি মূল্যবান রত্নরাশি লাভ করিয়াও নিজদোষে আমরা তৎ সমুদায় হারাইয়াছি; সত্যের পরিবর্ত্তে অসত্যতা, সরলের পরিবর্ত্তে অসরলতা ইত্যাদি হৃদয় মলিনকর বিষয়গুলিই জীবনের আভরণ করিয়াছি; সুতরাং প্রকৃত রত্নের মর্ম্ম এবং তাহার ফল আমরা কি জানি ?

জানি নাই বলিয়াই তাহার জন্য আজ প্রাণ কাঁদে না, কি সেই ভূষণের জন্য মন এখনও ব্যাকুলিত হয় না। যদি হৃদয় তাহার আস্বাদ পাইত, সত্যের জ্যোতিঃ একবার দেখিতে পাইত, তবে অসত্যের ও অন্যায়ের ভীষণান্ধকার আসিয়া কি আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে সক্ষম হইত? না—তাহার অশান্তির কুক্ষিগত করিয়া প্রকৃত সুখশান্তি হইতে আমাদিগকে আজ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত? আমরা যথার্থ পথ ছাড়িয়া সার ভূষণ অগ্রাহ্য করিয়াই তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছি, নতুবা তাহার কি ক্ষমতা আছে যে সত্যের জ্যোতির নিকট দাঁড়াইতে পারে? ভ্রাতৃগণ! ভগিনীগণ! একবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া আপন আপন ভূষণের জন্য ব্যাকুল হউন, তাহার উদ্ধারের জন্য এই পার্থিব প্রাণ উৎসর্গ করুন। তবে নিশ্চয়ই জানিবেন আবার সেই স্বর্গীয় রত্ন হস্তে আসিবে, দস্যু হস্তগত ধন আবার ঘরে ফিরিবে এবং আমাদিগকে সুখী করিবে। আমরা যদি সেই ভূষণে সকলেই ভূষিত হইতে পারি, তবে নিশ্চয় জানিবেন আমাদিগের মধ্যে একত্র হইবার যত প্রকার অন্তরায় আছে সে সমস্তই চলিয়া যাইবে এবং এক পরিবারে বদ্ধ হইয়া চিরশান্তিতে আমরা ইহ জীবন কাটাইয়া যাইব।

শ্রীঅন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়,
আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

সত্য ও ন্যায়।

রামায়ণ অবলম্বনে লিখিত।

সত্যহীন জীবন জীবনই নহে, তাহাতে সজীবতার কোন লক্ষণ নাই, বর্ত্তমানতার কোন নিদর্শন নাই এবং সে জীবন থাকার কোন আবশ্যকতা নাই। তাহাতে মলিনতা অসারতা অবস্থিতি করে। অসত্য জীবন সততই ঘৃণিত দূষিত ভাব উদ্গীরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী শত সহস্র জীবনকে বিনষ্ট করে এবং অসত্যরূপ বিষ মিশ্রিত দূষিত বান দ্বারা নিজেও অচিরে মৃত্যুমুখে গমন করে। একটী সত্য-জীবনের আবির্ভাবে জগতের কত উপকার, কত সুখ, কত শান্তি, কত সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় এবং কত গৌরবই রক্ষিত হয়, যাহার সৌরভ অনন্ত কাল প্রবাহিত হইয়াও আর কোন ক্রমে ফুরাইতে পারে না এবং তাহা অবিনশ্বর সত্য হইয়া চিরদিনই পরবর্ত্তী ভ্রাতা ভগিনী দিগকে শিক্ষা দিয়া থাকে। সত্যের যেরূপ জলন্ত ভাব অসত্যের আবার তেমনি মৃতভাব। তাহার আবির্ভাবে আবার জগতের ভয়ানক অনিষ্ট। একটী অসত্য জীবন—একটী পঙ্কিল জীবন দ্বারা এত অপকার সাধিত হয়, যে যাহার অনিষ্টকারী ফল শোধন করিতে আবার কত সময় চলিয়া যায়, কত কাল ব্যয়িত হয়, কত সাধনার প্রয়োজন হয় তথাপি তাহা সিদ্ধ হয় না। যদিও অসত্যের সীমা আছে, সেই স্রোতেরও বিরাম আছে, এর গতিরও নিবৃত্তি আছে; ইহা

স্থিরতর রূপে জানিয়া আসিতেছি।এবং অনেক সময় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইয়াছি কিন্তু তথাপি সেই সীমাযুক্ত অসত্য স্রোত অনায়াসে কি অল্প সময়ে নিবারণ করিতে পারা যায় না। একবার যে স্থান দিয়া দূষিত জীবন চলিয়া যায়, অসত্য প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তাহার নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ জনপদ মধ্যে নিতান্ত মহামারি উপস্থিত হইয়া জীবনের ভয়ানক ক্ষতি করিয়া চলিয়া যায়। অল্প সময়ের মধ্যে এত ক্ষতি করিয়া যায় যে যাহা সারিতে কত শত বৎসর চলিয়া যায়, তথাপি সেই ভগ্ন অঙ্গ পূরণ হয় না, প্রকৃত পক্ষে তাহার পূরণ হইতে পারে কি না সন্দেহ স্থল। অসত্য স্রোতে জীবন দূষিত হইয়া এত অন্যায় আবর্জ্জনা সঞ্চিত হয়, যে আস্তে আস্তে সমস্ত সত্য প্রণালীর মুখই প্রায় বন্ধ করিয়া দেয়। সুতরাং সত্য জীবনের, নির্ম্মল জীবনের অভাবানুসারে কোন জীব অর্দ্ধ মৃত কোন জীবন প্রায় মৃত, কি ভীষণ ভাবে মর্ম্মাহত তাহা আমরা চিন্তা পথে আনিলেই দেখিয়া স্তম্ভিত হইব। এইরূপ অবস্থায় সত্যের স্রোত কত প্রবল হওয়া আবশ্যক এবং কিরূপ জলন্ত সত্য জীবনই বা আবশ্যক তাহা বলার প্রয়োজন করে না। কারণ অবস্থাই তাহার গুরুত্ব বলিয়া দিতেছে।

রামায়ণে ভগীরথের জীবন এই অবস্থায় অবস্থিত। তিনি কোন ঘটনায় নিতান্ত অপমানিত হইয়া বিষাদিত অন্তরে মলিনভাবে সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার জননী পুত্রের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, জননি! আপনি যতক্ষণ না

আমাকে আমার জন্ম তত্ত্ব ও পূর্ব্ববংশীয় সমস্ত বিবরণ না বলিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার এই বিষাদিত ভাব দুঃখপূর্ণ অবস্থা বর্ত্তমান থাকিবেক। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই দুঃখ ভার অপনীত করতঃ আমাকে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করুন। আমি সেই সমস্ত বিবরণ না জানিয়া আজ কোন ক্রমেই জল গ্রহণ করিব না। জননী পুত্রের মানসিক বেদনার কারণ জানিয়া ব্যথিত অন্তরে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপারই পুত্রের নিকট বর্ণন করিলেন। তাহাতে ভগীরথ জানিতে পারিলেন যে তাহার পূর্ব্ববংশ অন্যায় আচরণ করিয়া মুনির কোপানলে ধ্বংশ হইয়াছেন, এবং সেই বংশ উদ্ধারের জন্য এ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টাও হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কেহ পবিত্র সলিলা গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে আনিয়া এই বংশ উদ্ধার করিতে সক্ষম হন নাই। ইহা শুনিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি এই গঙ্গাকে আনিয়া পূর্ব্বপুরুষ উদ্ধার করিতে পারেন তবেই ফিরিবেন অন্যথা এই গমনই তাঁহার শেষ গমন। তাঁহার জননীর তিনি মাত্র সম্বল ছিলেন—অতি আদরের ধন হৃদয়ের ভূষণ ছিলেন। সুতরাং এই প্রতিজ্ঞায় তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন; বলিলেন হৃদয় রতন! তোমার এই অল্প বয়স এখনও তুমি কিছুই জানিতে পার নাই, সংসার কি চিন নাই। এই বালসুলভ অবস্থায় কে কখন এমন কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

এখনও তোমার জীবনের অনেক সময় পড়িয়া রহিয়াছে, সময় মত ব্রত গ্রহণ করিও সময় মত পালন করিও। এক্ষণ এই পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও, আমার কথা শুন। মাতার

এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণেও তাঁহার সেই দৃঢ় সংকল্প কিছুমাত্র শিথিল হইল না,—তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি বিন্দুমাত্র টলিল না বরং আর অব্যক্তরূপে স্থির প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইতে লাগিল। সংকল্পে যাহা ঠিক করিলেন, প্রতিজ্ঞায় তাহা দৃঢ় করিলেন, এবং কার্য্যে তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। দৃঢ় করিয়া যে মন্ত্র ধরিলেন অনেক সাধনায়—অনেক চেষ্টা করিয়া সেই ব্রত রক্ষা করিলেন। স্বর্গ হইতে পবিত্র গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে আনয়ন করিয়া বংশ উদ্ধার করিলেন, এবং পরবর্ত্তী ভ্রাতা ভগিনীদিগের মুক্তির পথ দেখাইয়া গেলেন। ভগীরথের এই জলন্ত চিত্রে কি গুঢ়মন্ত্র নিহিত আছে। আমরা একটুকু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সকল সত্য বুঝিতে পারি। সকল ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া কর্ত্তব্য পথ প্রশস্ত করিতে পারি। আমরা যে বর্ষে বর্ষে এই পার্থিব জগতের উপর এই এই নিয়মান্তর্গত কত কত কার্য্য দেখিয়া আসিতেছি, এবং এই জীবনের উপর দিয়া কত ব্যাপার ঘটিয়া গেল, তথাপি আমরা, যে অন্ধ সেই অন্ধই রহিলাম। এই সকল প্রত্যক্ষীভূত বিষয় দেখিয়া যখন আমাদের সত্য চক্ষু ফুটীল না, তখন কবে যে আর এই অন্ধচক্ষু ফুটিবে বলিতে পারি না। দেখিতেছি নানা প্রকার দূষিত পদার্থ মিশ্রিত হইয়া, বহু প্রকার কলঙ্কিত আবর্জনা পতিত হইয়া, এই পৃথিবীর জল দূষিত হয় এবং নিতান্ত প্রাণহানীকর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কত প্রাণীর বিনাশ সাধন করে। আবার আশ্চর্য্য নিয়মে সূর্য্য রশ্মিদ্বারা সেই কলুষিত জীবন পরিষ্কৃত হইয়া পৃথিবীকে রক্ষা করে, শস্যশালিনী করে, এবং সকল প্রাণীকে

নববারি প্রদান করিয়া সুস্থ করে। কে না বলিতে পারে যদি এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা এই পার্থিব জগতের দূষিত ভাব দূরিত না হইত, যদি রবি করে জীবন পরিস্কার না হইত, তবে কোথায় বা থাকিত মনুষ্য, কোথায় বা থাকিত পশু পক্ষী, কোথায় বা থাকিত বৃক্ষ লতা এবং কোথায় বা থাকিত এই উর্ব্বরা পৃথিবী? এই জীবপূর্ণ, উদ্ভিদপূর্ণ শক্তি শঙ্কুল পৃথিবী এত দিনে অস্তিত্বহীন হইয়া কোথায় বিলীন হইত। সূর্য্য আছে তাই পৃথিবী আবার উর্ব্বরা হয়, শুদ্ধ হয়, এবং জীব জন্তুর, পশু পক্ষীর, বৃক্ষ লতার, প্রাণদায়িনী আরামদায়িনী হইয়া কল্যাণ বিধান করে তাই আমরা নির্ম্মল বিশুদ্ধ জল পান করিয়া সুস্থ হইয়া থাকি। আধ্যাত্মিক রাজ্যে এই সত্য সূর্য্যদ্বারা অপবিত্রতা, অশুদ্ধতা পবিত্রতায় পরিণত হয়। মনুষ্য জীবন যখন পাপ আবর্জনা অসত্য পঙ্কদ্বারা দূষিত হয়, ঘৃণিত হয়, তখন মনুষ্য সমাজ অতি ভীষণ ভাব ধারণ করে। তখন এক একটী দুষিত জীবন আবার শত শত জীবন সংহার করে। আমরা এইরূপ কত শত চিত্র দেখিয়া আসিতেছি। অসত্য পঙ্কে প্রোথিত হইয়া কি ভয়ানক যন্ত্রণায় প্রাণ হারাইয়া থাকে, তাহারও জলন্ত চিত্র দেখিয়াছি। সমস্তই দেখিয়াছি না হয় কল্পনায়ও অন্ততঃ তাহার শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়াছি, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। কিন্তু দেখিয়াছি কি বুঝিয়াছি তাহাতে কি করিবে? যে দেখায় কোন উদ্দেশ্য নাই, যে বুঝায় কোন অর্থ নাই এবং যে জানায় কোন ফল নাই, তাহার দ্বারা কি উপকার সাধন হইতে পারে? আমাদের সম্মুখে জীবনের জীবন সত্য-সূর্য্য যে প্রেম-কিরণ বিস্তার করিয়া সকল জীবনকে আকর্ষণ করিতে-

চেন, সমুদায় জীবনকে সত্যালোক প্রদান করিয়া নব-জীবন প্রদান করিবেন সেই জন্য যে সর্ব্বদা ডাকিতেছেন, তাহা কেন বুঝি না? আমাদের কর্ণ থাকিতে আমরা বধির হইয়াছি, চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইয়াছি তাই তাঁহার আলোক দেখিতে পাই না, কি তাঁহার বাক্যও শ্রবণ করিতে পারি না। রে অসত্য পরায়ণ কৃতঘ্ন মন আর কত কাল মোহ নিদ্রায় অচেতন থাকিবি? একবার চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখ সত্যা-লোক পড়িয়া পৃথিবী আবার কেমন জাগরিত হইয়াছে। শুদ্ধভাবে পবিত্রভাবে চালিত হইয়া জীবন নির্ম্মল করিবার জন্য আবার ব্যাকুল হইয়াছে। আইস! আমরা এই সঙ্গে সঙ্গে এখন জাগরিত হইয়া জীবন পবিত্র করিবার জন্য ব্যাকুল হই। সাধনার অসাধ্য কিছুই নাই। এই সাধনার দ্বারা মহাত্মা ভগীরথ স্বর্গীয় গঙ্গা লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও যদি সেইরূপ সাধনা আরম্ভ করিতে পারি, তবে ঘরে বসিয়া নির্ম্মল জীবন লাভ দ্বারা মুক্ত হইতে পারিব। সাধনায় সিদ্ধি হয়, এই মন্ত্র সার করিয়া ব্রত আরম্ভ করিয়াছি তাহাই যেন জীবনে সাধন করিতে পারি।

শ্রীমতি অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়,
আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

বিনয়।

বিনীত ব্যক্তি সকল সময়েই নিজের দোষ এবং অপরের গুণ দেখিতে পান। তিনি প্রতি কাজেই আপনার দুর্ব্বলতা

ও অপরের পারগতা দর্শন করেন। এজন্য বিনীত লোকের হৃদয় কথনও অহঙ্কারে স্ফীত হয় না এবং আত্ম-গৌরবে মস্তক কথনও উন্নত হয় না। বৃক্ষ যেমন জীবন ভরিয়া ফল পুষ্প এবং ছায়া দান করিয়া জীবগণের সর্ব্বতোভাবে হিত সাধন করে, ও শত্রু মিত্র সকলের নিকট অবনত থাকে; তদ্রূপ বিনয়বান ব্যক্তিও জগতের সকল লোকের মঙ্গল সাধন করিয়া প্রত্যেকের নিকট বিনীতভাবে অবস্থিতি করেন। বিনয় যাহার হৃদয়ের ভূষণ হইয়াছে, তিনি সমস্ত জীবন কেবল পরহিতে রত থাকেন। তিনি শরীরের রক্ত জল করিয়া এবং প্রতি জনের নিকটেই কৃতজ্ঞ ও বিনীতভাবে বাস করিতে পারেন। তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণেকের তরেও দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞাদি কোনরূপ নীচতাই স্থান পাইতে পারে না। প্রতি কাজেই এবং প্রতি বিষয়েই তাঁহার হৃদয়ের উন্নতাবস্থার ও মনের প্রশস্ততার নিদর্শন পাওয়া যায়। অভাবশীল মানবজীবন অনন্ত পূর্ণতার রাজ্যে অগ্রসর হই-তেছে। বিনীত ব্যক্তি এই ভাবটী অতি পরিষ্কার রূপে বুঝিতে সক্ষম। এইজন্য অভাব মোচন বাসনায় জগতের প্রত্যেক ভ্রাতা ভগিনীর নিকট তাঁহার প্রাণ ছুটিয়া যায় এবং নত মস্তকে চিরদিন শিক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে। তিনি জানেন এই পৃথিবী তাঁহার শিক্ষার স্থান এবং শিক্ষাদি দ্বারা জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হওয়াই তাঁহার জীবনের একটী প্রধান কার্য্য। এই শিক্ষার প্রতিকূলে গমন করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য বিষয়ে গুরুতর ব্যাঘাত জন্মে এবং জীবনের অভাব আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।

জীবনের দুরবস্থা অতি সুন্দর রূপে বুঝিতে পারেন বলিয়াই তিনি বিনীত। বিনয় কাহাকেও উপদেশাদি দ্বারা বুঝান যায় না। বিনয় অভাবশঙ্কুল মানব প্রকৃতির চির নিগূঢ় ভাব সম্ভূত। বিনয় যাঁহার হৃদয়ে আছে, দেখা যায় শিক্ষার জন্য তাঁহার প্রাণে এতদূর প্রবল পিপাসা যে তিনি ভেদাভেদ পরিশূন্য হইয়া এবং অহঙ্কারকে একেবারে চূর্ণীকৃত করতঃ জগতস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্ব সাধারণের এবং স্রষ্টার সৃষ্ট রাজ্যের প্রতি পদার্থের নিকটেই শিক্ষার্থী। ঈশ্বর প্রদত্ত একগাছি তৃণকেও তিনি আদরে গ্রহণ করেন ও জীবনের সহায় মনে করিয়া হৃদয়ে স্থান দেন। মঙ্গলময় ঈশ্বর সমস্তের মধ্য দিয়া আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। তিনি এই ভাব জানিতে পারেন বলিয়াই অবনত মস্তকে সকলের নিকট শিক্ষা করিয়া থাকেন। এই সংসারে কৃত্রিম বিনয় দ্বারা কত জঘন্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এবং কৃত্রিম বিনয়ের অভিপ্রায় প্রসূত কত অমঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এই সকল দেখিলে আর ধৈর্য্য ধরে না। বিনয়ের ভানে কত প্রকার স্বার্থ সিদ্ধি, কত প্রকার নীচ বাসনা চরিতার্থ হইতেছে ও হইয়াছে, ভাবিলে প্রাণের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে বিষয় স্মরণেও প্রাণ অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া উঠে এখনও আমরা সেই প্রাণবিনাশক বিষময় ভাবকে হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। আমাদের জীবনের ইহার চেয়ে কি বিড়ম্বনা আছে জগতের ঘৃণিত চিত্রে হৃদয়ে আঘাত পাই কিন্তু আপনার হৃদয়ের ঘৃণিত ভাব একবারও লক্ষ্য করি না। আপনার নীচতা দেখিয়াও দেখি না এবং আমার দুর্গতি জানিয়াও জানি না।

অথচ অপর আত্মার দুর্গতি দেখিয়া তাহাকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। আত্মদোষ দেখিতে না পাওয়া অহঙ্কার প্রসূত ভাব। এই অহঙ্কারের জন্য আমরা বিনীত হইতে পারি না। অহঙ্কার বিনয়ের অত্যন্ত বিরোধী। যে হৃদয়ে অহঙ্কার কিছুমাত্র বাস করে, বিনয় সে হৃদয় হইতে পলায়ন করে। এই দুই বিরুদ্ধ ভাব এক হৃদয়ে বাস করিতে পারে না। মুখে নম্রতা প্রকাশ ও অপরের নিকট অবনত মস্তকে অবস্থিতি কি সকল উপস্থিত বিষয়েই সকলের সহিত এক মত হওয়া ইহা হইলেই কি বিনীত হওয়া যায় না; ইহার একটীও বিনয় রাজ্যের কথা নয়। বিবেককে এক চুল পরিমাণ অতিক্রম করিলেই বিনয় চ্যুত হইতে হইবে। সকলের নিকট বিনম্র হইবে ইহা ঠিক কিন্তু তাহা বলিয়া সত্য ন্যায় এবং বিবেকের স্বাধীনতা কেহই বিনষ্ট করিতে পারিবেন না। করিলে সেই থানে তাহার বিনয় স্খলিত হইবে এবং আত্মা নীচগামী হইয়া অশেষ যন্ত্রণায় ছট ফট করিবেক। আপনার নীচতা লঘুতা দ্বারা সকল প্রকার অহং তত্ত্ব বিনাশ করিতে না পারিলে কখনও বিনয়ের পবিত্রতা কোমলতা দ্বারা মানবকে প্রকৃত বিনয়ী করিবে না। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা বিনয়ের কত প্রতিকূল হৃদয়ের পানে তাকাইলে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। প্রথমতঃ আমরা নিজ জীবনের কত টুকু অভাব অনুভব করিতে পারি, অপর অন্য জীবনে আমাদের শিক্ষনীয় বিষয় দর্শন করিয়া শিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকি কি না? তৃতীয়তঃ নিজের দোষ দুর্ব্বলতা এবং অপরের দোষ দুর্ব্বলতা কি ভাবে অনুভব করিয়া

থাকি ? এই তিন প্রকারে আলোচনা করিলেই আমাদের বিনয়ের গুঢ় রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। নিজ জীবনের অভাব আমরা কতটুকু অনুভব করিতে পারি তাহা বলিতে হইলে আজ আমাকে নূতন সংজ্ঞার বোধ হয় আবিষ্কার করিতে হয়। জীবনের অনন্ত উন্নতি ও উচ্চ অধিকারের বিষয় অনুভব করিলে অভাবের নিম্ন সংজ্ঞা ভাষায় খুজিয়া পাওয়া যায় না, তখন বলিব কি ? জীবন কত নীচে পড়িয়া আছে তাহা ভাষায় কি ভাবে ব্যক্ত করিব ? আরো এজন্য বলিতে সক্ষম নই যে, এত গুরুতর অভাব সত্ত্বেও আমরা কোন অভাবই দেখিতে পাই না। এত অভাব লইয়া বাস করিতেছি অথচ অভাবের বোঝা মোটেই ভারি বোধ হইতেছে না। যে কিছু অভাব বুঝি ও জানি তাহা পার্থিব রাজ্যের ও সাংসারিক জীবনের। আধ্যাত্মিক জীবনের অভাব ও দুর্গতি কিছুই বুঝি না। তৎপর অন্যের জীবনের শিক্ষনীয় বিষয় কিরূপে দেখিতে পাই ও তাঁহার নিকট শিক্ষার জন্য কিরূপ ব্যাকুল। অপর সর্ব্ব সাধারণের নিকটই যে আমরা শিক্ষা করিতে পারি ইহা বুঝা যাক, স্বীকার থাক কোন সময়ের জন্য এরূপ চিন্তাকেও হৃদয়ে স্থান দেই কি না সন্দেহ। এমন মানুষ নাই যাহার কাছে কিছু না কিছু শিক্ষনীয় বিষয় আছে ; ইহাও মনে স্থানই দেই না। সম শ্রেণী কিম্বা কিঞ্চিৎ উৰ্দ্ধশ্রেণী ইহাদের মধ্যেও শিক্ষনীয় বিষয় দেখিতে পাই না। যদি স্থান বিশেষে অবস্থা বিশেষে কিছু অনুভব করিতে পাই তাহাও প্রকৃত আধ্যাত্মিক অবস্থাগত নয়। অতীব উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে যদিও শিক্ষাভাব অতি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই বটে কিন্তু

নিজ অহং প্রসূত ভাব, দর্শনান্ধতা জন্মাইয়া শিক্ষার ব্যাকুলতাকে নিরস্ত করে।

তৎপর আপনার দোষ দুর্ব্বলতা কতটুকু বুঝি ও কয়বার স্মরণপথে উপস্থিত করি, আর অপর ভ্রাতা ভগিনীর দোষ দুর্ব্বলতাই বা কত বার অনুভব ও উল্লেখ করিয়া থাকি এই থানেই আমাদের বিনয়ের আশ্চর্য্য কার্য্য। নিজের দোষ প্রায়ই দেখি না তার পর যদিও বা দেখি তাহাও সকল অংশ কখনও দেখি না কিন্তু অপরের দুর্ব্বলতা যখন দেখি, তখন যাহা নয় তাহাও সম্মিলিত করিয়া ত্রুটীকে গুরুতর আকারে গ্রহণ করিয়া থাকি।

যখনই আমরা চারিজন সম্মিলিত হই, আপন আপন গৌরব ও অপরের অকৃত ভাব লইয়া আমোদ ও পরিহাস করিয়া থাকি। আপন আপন ক্ষমতা, জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা লইয়া প্রকাশ্য অপ্রকাশ্যরূপে আত্মশ্লাঘা করিয়া অপর সকলের অজ্ঞানতা, নির্ব্বুদ্ধিতা, দুর্ব্বলতা লইয়া কত প্রকার বিদ্রূপ ও কুৎসা করিয়া থাকি। অন্যের দোষ বেশী মাত্রায় অনুভব করা ও স্বীয় দোষ মৃদুভাবে দেখা ইহা বিনীতাত্মার অত্যন্ত বিরুদ্ধ ভাব। অপরের দোষ দুর্ব্বলতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে যেমন হৃদয় বিনীত হইতে পারে না তদ্রূপ দুর্ব্বলতা পদে পদে লক্ষ্য করিতে না, পারিলেও বিনয় হৃদয়ে অবস্থিতি করিতে পারে না। বিনীত ব্যক্তি অপরের দোষ দর্শনে যেমন অন্ধ ও গুণ দর্শনে পটু তদ্রূপ নিজের গুণ দর্শনে অন্ধ ও দোষ দর্শনে পটু। বিনয় সকল সময়েই হৃদয়ের লঘুতা দর্শন করায়। যাহাতে মানব বিনীত-ভাব ধারণ করে তাহা জীবনে না জন্মিলে কি করিয়া মানব

বিনীত হইবে? এখন আমাদের হৃদয়ে পূর্ণ অহঙ্কার, এখনও অভাব দর্শনে আমরা ঘোর অন্ধ, তখন বিমল বিনয়ের জ্যোতি কিরূপে দেখিব? আমাদের এই অহংকৃত জীবন লইয়া যে কিরূপে বিনয়ের সাধনা করিব, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। বাস্তবিক আমাদের আত্মার এই ঔদ্ধত্য স্বভাবের বিষয় চিন্তা করিলে মন স্বতঃই হতাশে ভাঙ্গিয়া পড়ে; এবং মনে হয় আর বুঝি এ জীবনে বিনয়ের সাধনা হইল না। মন যখন এখনও পর-দোষ অন্বেষণে ধাবিত হয়, হৃদয় যখন নিজ দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে এখনও সম্পূর্ণরূপে অক্ষম তখন কি করিয়া বিনয়কে হৃদয়ে রাখিব? প্রত্যুত: জীবনের এই শোচনীয় ভাবে অত্যন্ত দুঃখের ও নিরাশার কথা। প্রকৃত বিনয়ের ভাব জীবনে অবলম্বন করা সহজ নয়, বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। স্রষ্টার সহিত সাক্ষাৎ যোগ ব্যতীত বিনয় ভূষণে ভূষিত একেবারেই অসম্ভব।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়,
আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

সত্য ও ন্যায়।

যাঁহার ইচ্ছা সৎ কল্পনা সৎ কার্য্যও তাঁহার সদ্বিষয়ে ধাবিত হইয়া থাকে এবং চতুর্দ্দিকের ঘটনাপুঞ্জও তাহার সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদা সৎপথে চালিত করতঃ তাঁহাকে উত্তরোত্তর কর্ত্তব্য হইতে গুরুতর কর্ত্তব্যে লইয়া চলে। একবার সৎপথে জীবন

চালিত হইলে, প্রতিকূল ঘটনা স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং তাঁহাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করে কাহার সাধ্য? তথন অযথা নিয়মে বিপদাক্রমেও তিনি ভীত কি কুণ্ঠিত নহেন। যত বিঘ্ন আসিয়া মস্তকে পড়ুক, যত দুঃখ আসিয়া লাঞ্ছনা দিউক, কিছুতেই তাঁহাকে ক্লিষ্ট কি মলিন করিতে পারিবে না; কিছুতেই তাঁহার সত্য সংকল্প নষ্ট হইবে না। সত্যস্থিত মন নববলে বলীয়ান হইয়া প্রতিকূল প্রবল স্রোতকেও অনুকূলে প্রবাহিত করিয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া লয়। সত্যনিষ্ঠ রামচন্দ্র বিবাহ করিয়া ঘরে ফিরিলেন, এ শুভসংবাদে অযোধ্যাবাসী সকলের মনে আনন্দের উদয় হইল। এক রামচন্দ্রের সৎ স্বভাবে আত্মীয় বল, কুটম্ব বল, প্রজা বল সকলে যারপর নাই পরিতুষ্ট; তার পর সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা লক্ষ্মীস্বরূপা সীতাকে তাঁহার সঙ্গিনীরূপে বামে দেখিয়া, সকলের হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভাসমান হইল। প্রজাগণ ভাবী সুখাবস্থা স্মরণ করিয়া অতীব আহ্লাদে পুলকিত হইল। এইরূপ সুখপ্রদ অবস্থাবলোকনে—গুণবান্ গুণবতীর মিলনে সকলেই তুষ্ট, সকলেই অনির্ব্বচনীয় সুখে উৎফুল্ল হইল, এ দৃশ্য দেখিয়া অযোধ্যানগরী পর্য্যন্ত যেন ভাবী গৌরবে আশান্বিতা হইয়া, বুক স্ফীত করিয়া সকলকে আহ্বান করিল এবং আপনার আনন্দের ভাব সকলকে প্রদান করিয়া সকলকেই মাতাইয়া ছিল।

বাস্তবিক নিতান্ত অশিক্ষিত লোকেও বুঝিতে পারে সত্য-পরায়ণ ন্যায়বান্ রাজার রাজ্য কি সুখের স্থান কি আরামের স্থান। এই জন্য কি জ্ঞানী কি মূর্খ আপামর সর্ব্বসাধারণ এই স্থানের জন্য লালায়িত। রামচন্দ্র যদিও এই সময় হইতে

সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য এখনও সম্মুখে আইসে নাই যে যৎকিঞ্চিৎ সাংসারিক চাপ পড়িয়াছিল, তাহা স্থির বুদ্ধিতে অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া, আপন কার্য্য দক্ষতার সুন্দর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সামান্য সামান্য কার্য্য দ্বারাই বিলক্ষণরূপে লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। লোকের মন অতর্কিতরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রথম পাদ-বিক্ষেপে সকলে বুঝিয়াছিল। তাঁহার কর্ত্তব্য বুদ্ধি কত প্রখর, সত্যনিষ্ঠা কি দৃঢ় এবং ন্যায় বিচার কি তীক্ষ্ণ। এই সকল মহৎ গুণাবলী দেখিয়াই সকলে তাঁহার রাজত্বকালের প্রতীক্ষায় সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া রহিল। এ দিকে মহারাজ দশরথ সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃত রামচন্দ্রকে দেখিয়া স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। বহু দিন তপস্যা করিয়া যে অমূল্য রত্ন চতুষ্টয় পাইয়াছেন, তাহার প্রভায় তিনি অপরিসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। পুত্র দ্বারা বংশ রক্ষা হয় এবং পরলোকে মুক্তি হয়। এই দুই ভাবে ব্যাকুল হইয়াই মনুষ্যগণ পুত্র কামনা করে। পুত্রার্থে অতি কঠিন সাধনা আবশ্যক হইলেও এই জন্য অম্লান-ভাবে উৎসাহের সহিত সেই সকল কঠিন ব্রত পালন করিয়া থাকে। কেবল পুত্র হইলেই বংশ রক্ষা ও মুক্তি হয় তাহা নহে। সৎপুত্র দ্বারা দুই কুল রক্ষা হইয়া থাকে। সৎপুত্র দ্বারা যেরূপ বংশ রক্ষা হয়, সেইরূপ অসৎ পুত্র দ্বারা আবার বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পুত্র হইলেই অতি আহ্লাদের বা আনন্দের কারণ নাই; যতক্ষণ না সে বংশধর হয়। অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই এইরূপ বংশধর পুত্র লাভ হইয়া থাকে। রামচন্দ্রের ন্যায় বংশধর পুত্র লাভ করিলে কাহার না হৃদয়

আহ্লাদে নাচিয়া উঠে? কাজেই রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে লাভ করিয়া মহারাজ আশাতীত সুখে মগ্ন হইলেন এবং সর্ব্বাংশে উপযুক্ত রামচন্দ্রকে দেখিয়া রাজ্যভার অর্পণের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। রাম রাজা হইবেন এই কথা শুনিয়া সমস্ত নগরবাসীই আনন্দে মাতিয়া উঠিল, সকলের চিরবাসনা পরিতৃপ্তির সময় জানিয়া ভবিষ্যতের মৃত আশা বর্ত্তমানে সজীব দেখিয়া অভাবনীয় সুখ স্রোতে সকলেই ভাসিতে লাগিল। আজ রাম রাজা হইবেন, প্রকাণ্ড রাজ্যের সুখ দুঃখের ভার ঘাড়ে লইবেন এবং গুরুতর কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া কার্য্যোচিত গৌরব ধ্বজা উড্ডীন করিবেন, এই নূতন দৃশ্য দেখিবার জন্য সকলেই সেই কালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজবাটী হইতে সমস্ত জনপদ মধ্যে এই আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইয়া সকলকে জাগরিত করিল, চতুর্দ্দিক আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ, সমস্ত রাজ্যই হর্ষে নিনাদিত, এই আনন্দ হর্ষপ্রদ সময়ে এমন ভীষণ পরীক্ষাগ্নি প্রবলরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল যে তাহার প্রখর তেজে এই প্রকাণ্ড রাজ্যও মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্মীভূত হইতে পারে। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবা মাত্র সকলের মনে মহা ভীতি উপস্থিত হইল। আনন্দ বহ্নি নিরানন্দে পরিণত হইল। সকলেই ইহা বুঝিল যে এই অগ্নি দ্বারা সমস্ত রাজ্য ছার খার হইবে, না হয় অগ্নিতে শোধিত হইয়া অপূর্ব্ব শান্তির রাজ্য স্থাপিত হইবে। যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার তেজ সহ্য করা যদিও দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু একবার ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকিবেক না। ধর্ম্মে অবিচলিত

না হইলে নিশ্চয়ই ইহাতে পুড়িয়া মরিতে হইবে। সত্যনিষ্ঠ রাম যদি ধর্ম্ম বর্ম্ম ধারণ করিয়া থাকেন তবে এ অগ্নি তিষ্টিতে সক্ষম হইবে না। এইরূপ পরীক্ষাগ্নিতে খাঁটি হইয়া থাকিতে না পারিলে যে সমূলেই বিনষ্ট হইবে ইহা নিশ্চয় কথা। আনন্দের ব্যাপার—অকস্মাৎ এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত সকলেই ভীত ও দুঃখিত হইল এবং ইহার পরিণামই বা কোথায় দাঁড়ায় এই মহা চিন্তায় সকলেই চিন্তিত হইল। কিন্তু এই মহাকাণ্ডের মধ্যে—ঘোর বিপ্লবের মধ্যেও রামচন্দ্র স্থির ও শান্ত। তাঁহার মনে মুহূর্ত্তের জন্যও নিরানন্দ উপস্থিত হয় নাই, কি বিচলিত হৃদয়ের শঙ্কটাবস্থাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি এই ভীষণ পরীক্ষাগ্নির মধ্যে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। সত্য বিন্দুতে, ন্যায় দণ্ডেতে স্থির হইয়া সকল বিঘ্ন বাধাকে সামান্য তৃণের ন্যায় ভাষাইয়া দিলেন। যে বিমাতা কর্ত্তৃক এই অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল, তাঁহাকে পর্য্যন্ত উপযুক্ত ভক্তি উপহার প্রদান করিয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মে কত দূর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাহা পালনের জন্য কতদূর সক্ষম হইয়াছেন, এবং তাঁহার সাংসারিক স্বার্থই বা কত দূর ত্যাগ করিতে পারেন, সেই পরীক্ষার জন্যই এই অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই বিশ্বাসের জন্যই তিনি অবলীলাক্রমে সমস্ত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলেন। কোথায় রাম রাজা হইবেন! আর কোথায় রাম সত্য পালনের জন্য আজ বনবাসী হইলেন! এই হৃদয়-বিদারক চিত্র দেখিয়া সকলেই মুহ্যমান। কেবল রাম ও

সীতা ব্যতীত সকলেই শোক দুঃখে জড়িত হইয়া নানা প্রকার বিলাপ দ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র বুঝাইলেন ইহার। মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে ধর্ম্মভাব নিহিত রহিয়াছে এবং ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় অতি সূক্ষ্মরূপে সকল বিপদরাশির মধ্যেই লুক্কাইত আছে। সুতরাং ইহার জন্য পরিতাপ কি ক্ষোভ করা অন্যায়। ধর্ম্মে শক্ত হইবার জন্য সত্যে দৃঢ় হইবার জন্য, সংসার ক্ষেত্র হইতে সময়ে সময়ে এইরূপ প্রজ্জ্বলিত হুতাসন মুখ ব্যাদন করিয়া, মনুষ্যগণকে আহ্বান করিয়া থাকে। তাহার সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া, ভীষণাকার অবস্থা দেখিয়া যিনি কাঁপিয়া গেলেন, যিনি তাহার কুহক মায়ায় ভ্রমে পতিত হইলেন, তিনি ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া দুর্ব্বল সমুদ্রে ঝাপ দিলেন এবং সত্যের আলোক হারা হইয়া অন্ধকারে নিমজ্জিত হইলেন। এইরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই মনুষ্যের মনুষত্ব বৃদ্ধি হয়, মনুষ্য জন্মের স্বার্থকতা হয়। এই সকল মহৎভাব অবগত হইয়া লোকের মন মুগ্ধ হইল। রাম ঐশ্বর্য্যের প্রথম সোপানে পাদবিক্ষেপেই সকল বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, রাজ বাস রাজ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে চলিলেন। রামগত প্রাণা জানকী এই পার্থিব সুখ বিসর্জন দিয়া, রাজার স্ত্রী হইয়া অনায়াসেই কঠিন ব্রতপালনে সক্ষম হইলেন। তিনি রামের জন্য সমস্তই ছাড়িতে পারিতেন, তাহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত কি ব্যথিত হইলেন না। অনুজ লক্ষ্মণও রাম ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। রাম সীতার কল্যাণ কামনা ও তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করা, ইহাই তাঁহার

জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; সুতরাং তিনিও ইহাদের সঙ্গে বনে চলিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আপনার দক্ষিণ হস্ত জ্ঞান করিতেন। এমন কতকগুলি গুণে লক্ষ্মণের হৃদয় ভূষিত ছিল, যাহা দেখিলে এমন হৃদয় নাই যে নিতান্ত মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে। রাম সীতা লক্ষ্মণ ইহারা তিন জনেই সংসারের অনিত্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অপার্থিব স্বর্গীয় সুখে চালিত হইলেন এবং সাংসারিক প্রবল পরীক্ষায় ঝাঁপ দিয়া প্রধান অংশ উত্তীর্ণ হওতঃ দ্বিগুণ বলের সহিত সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শ্রীঅন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়,
আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

সত্য, ন্যায় ও প্রেম।

দৈনন্দিন কার্য্য সকলেই করে; আপন আপন শক্তি অনুসারে জীবন নির্ব্বাহের উপায় সকলেই করে। ধনী, মানী, জ্ঞানী যেরূপ করে, দুঃখী, অজ্ঞানী মূর্খ তাহারাও জীবনের জন্য তদ্রূপই খাটে। ইহার জন্য কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না, অনুরোধ করিতে হয় না, আপনা হইতেই উদ্যোগী হইয়া সূর্য্য উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দিন প্রাণের জন্য খাটিয়া থাকে। এই যে অগণ্য নর নারী প্রতিনিয়ত কার্য্য-ক্ষেত্রে তর তর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, কাহারও আলস্য নাই, বিশ্রাম নাই অবিরাম ভাবে চলিয়াছে, আর ফিরিতেছে

ইহাদের পরিণাম কোথায় ? সময়ের চিহ্ন কি ইহাদের নিকট কিছু আছে ? তিল তিল করিয়া কত সুদীর্ঘ সময় এই ক্ষুদ্র জীবনে অতিবাহিত হইয়াছে, সময়ের তরঙ্গ কত খেলিয়াছে কিন্তু তাহার একটী তরঙ্গের চিহ্ন কি হৃদয়ে অঙ্কিত আছে ? নাই। কাহারও নাই—থাকিবে না। কালের তরঙ্গ চলিয়া গেলে কিছু থাকে না। তবে থাকে কি ? থাকে সময়ের প্রহেলিকা ভেদ করিয়া মানব হৃদয়ের যে তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহাই চিরদিন অবিনশ্বর অক্ষরে কালের বক্ষে বিরাজিত রহিয়াছে এবং থাকিবে। তুমি, আমি, এইরূপ আর কত অযুত অগণ্য প্রাণী এই ভাবে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া এই পৃথিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ৫০। ৬০ বৎসর এই পৃথিবী বক্ষে বিচরণ করিয়া রিক্ত হস্তে চলিয়া গিয়াছে এবং কেহ বা আপনার ধন বিসর্জ্জন দিয়া সংসারের ধূলি সংগ্রহ পূর্ব্বক হৃদয়কে ভারগ্রস্থ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের কাহার কোন নিদর্শন নাই; সংসারে আসিবার উদ্দেশ্য জীবনে সাধিত হয় নাই, তাই কিছু নাই। কেবল আহার বিহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের নাম জীবনের উদ্দেশ্য পালন তাহা ব্যতীতও মানবের অনেক করিবার আছে। এ বিষয়ে বুঝিবার জন্য এমন ঘটনা রহিয়াছে যে তাহার জন্য আমাদিগের কিছুমাত্র চেষ্টার আবশ্যক করে না। পৃথিবীর আদি হইতে কত অগণ্য জীব কাল প্রবাহে চলিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই কিন্তু আজ তাহাদের কোন চিহ্নই দেখিবার মধ্যে নাই। সেই কোটী কোটী জীবনের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিলে আজ জগৎ জীবন্ত ভাবে পূর্ণ থাকিত; সময় তাহাদিগকে পুছিয়া

ফেলিতে সক্ষম হইত না। এই মায়াময় জগতের সমস্তই ধ্বংশ হয়। তাহাই চিরস্থায়ী অবিনাশী সম্পত্তি যাহা মহান-শক্তি হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। মানবের সেই কার্য্যই কাল প্রবাহে তরঙ্গ উঠায় এবং চিরদিন জগৎ বক্ষে পরিচালিত হইয়া আনন্দের সংবাদ বলিতে থাকে। আমরা প্রতিদিন যাহা করিয়া যাইতেছি, এই সুদীর্ঘ সময় যাহা করিলাম তাহার পরিণামও ধ্বংশ। কারণ সকলি আপন বোধে করিয়াছি। আপনার জ্ঞানে যাহা করিব, নিজের স্বার্থভাব অহংকারীত্ব ভাব মিশ্রিত হইয়া তাহা বিনাশের সামগ্রী প্রস্তুত হইবে। মহাপ্রাণে অনুপ্রাণীত আত্মাই সত্য ন্যায় সংরক্ষণে সমর্থ।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানব সেই মহাপ্রাণে প্রণোদিত না হইয়া কার্য্য করিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার বিনাশের পথ রুদ্ধ হইবে না এবং আপনার বাসনাকে সংযত করিয়া কর্ত্তব্য পালনেও সক্ষম হইবে না। ধর্ম্ম জগতে যে সকল মহাত্মা-দিগের জীবন প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতেছে, মৃত মানব সমাজ যাহাদের আবির্ভাবে জাগ্রত হইতেছে তাঁহারা প্রত্যেকেই সেই মহানশক্তিতে পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহাদের ক্ষুদ্র শক্তির উপর সেই মহানশক্তি বল প্রদান না করিত, তবে তাঁহাদের কি সাধ্য ছিল যে শত শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতাকার বিঘ্নকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়? সংসার তাহাদের বল দেখি-বার জন্য কত ফাঁদ পাতিয়াছে কত পরীক্ষাগ্নি চতুর্দ্দিকে প্রজ্জলিত করিয়াছে—কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদিগকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহারা নির্ভীকচিত্তে অটল বিশ্বাসের

সহিত সেই পরীক্ষাগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিয়া আপনাকে পরী-ক্ষিত খাঁটি সোণা করিয়া জগতের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। বিপদ তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করিয়া পরাস্ত করিতে পারে নাই; দুঃখ দারিদ্র তাঁহাদিগকে ক্লিষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই, তাঁহাদিগের অমানুসিক বলের নিকট সকলই পরাস্ত মানিয়াছে। বিপদ তাঁহাদের নিকট সম্পদ মৃত্যু তাঁহাদের নিকট অমৃত লইয়া উপস্থিত হয়। যেখানে দেববল কার্য্য করে পার্থিব বলের সাধ্য কি সেখানে পৃথিবীর দুষিত জঘন্য ভাব লইয়া উপস্থিত হয়? বিষ তাঁহাদের নিকট যাইয়া বিষত্ব হীন হয়; সাধুর ন্যায় কার্য্য করিয়া তাঁহাদিগকে অমরত্ব প্রদান করে। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে, পার্থিব জ্ঞানে যে সকল আপদ বিপদকে আমরা সত্য পথের অন্তরায় মনে করিয়া থাকি, আবার তাঁহাদের নিকট সে সকলই সত্য পথের সাহায্য করিয়া থাকে। এইজন্য এক বিষয়ে একের বিনাশ অপরের উত্থান; একের পতন অপরের উদ্ধার, এইরূপ একের দুঃখে অপরের আরাম দেখিতে পাই। মহাযোগী মহাদেব বিষপান করিয়া জগৎ রক্ষা করিয়াছিলেন; তাহারও মূল মন্ত্র ইহাই। ইহারাই সত্যের নিকট, ন্যায়ের নিকট আপনার জীবনকে অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করিতে পারে, সেই সত্যকে রক্ষা করিতে পারে এবং প্রলোভন জয়ী হইয়া নশ্বর দেহের কার্য্যকে অবিনশ্বর করিয়া যাইতে পারে। ধ্বংশ শীল ব্যাপারকে চিরস্থায়ীরূপে পরিচালিত করিতে পারে। আমরা কার্য্যে অগ্রসর না হইতেই বিপদের আশঙ্কায় পশ্চা-পদ হই; লক্ষ ঠিক করিতে না করিতেই স্বার্থের হানি হইবে

মনে করিয়া ভীত অন্তঃকরণে লক্ষহীন হইয়া পড়ি; তাহাতে সত্যের পরাক্রম ন্যায়ের তেজীয়ান ভাব কিরূপে বুঝিব? ঠিক ভাবে দাঁড়াইতে না পারিয়াই যদি দৌড়াইতে চাই, কথা বলিতে না শিখিয়াই যদি বক্তৃতার জন্য প্রয়াসী হই, আর লিখিতে না জানিয়াই যদি কবি হইতে ইচ্ছুক হই, তবে তাহা যেমন অসম্ভব; আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সত্যে শক্তি অনুভব করাও প্রায় তদ্রূপ। সত্যে শক্ত না হইলে কিরূপে বুঝিব সত্যে কত শক্তি ধরে। দূর হইতে জানিবার জন্য যাহা আছে বিশ্বাসের রাজ্যে তাহাই যথেষ্ট। তাহা দেখিলেই আমরা নির্ভয়ের সহিত প্রবল বিপদে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হইতে পারি। নানা প্রকার পরীক্ষায় পরীক্ষিত আত্মার শক্তি দেখিলেই আমরা এ সাহস লাভ করিতে পারি। আশ্বাসের সুমধুর আহ্বান বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রচুর বল প্রাপ্ত হইতে পারি। আমার চক্ষের নিকট কত শত লোক সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেল ইহাও কি অনুমান সিদ্ধ? স্বীকার্য্যের যুক্তি লইয়া কি ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে? কিম্বা তাহা কেহ করিয়া থাকে? সাঁতার না জানিলেও ইহা যেমন স্থিরতররূপে বিশ্বাস করিয়া থাকি, সত্যপরায়ণ, ন্যায়বান প্রেমিকদিগের জীবনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা সন্দর্শন করিয়াও প্রত্যক্ষবৎ জ্ঞান করিয়া সেইরূপ আশ্বস্ত হইতে পারি। কিন্তু যদি আমি প্রাণের ভয়ে জলে না নাবিয়া উপরে থাকিয়াই সাঁতার শিখিতে প্রয়াস পাই, আর তাহার জন্য বহু পরিশ্রমও করি তাহা হইলেই কি সাঁতার সম্বন্ধে সফল কাম হইতে পারিব? কখনই নহে। এখানে চেষ্টার ফল যেমন অসম্ভব, বিপদ, অসুবিধা, দেখিয়া

শরীর বাঁচাইয়া সত্যরক্ষা করা এবং তাহার ফল পাওয়া সেরূপ অসম্ভব। প্রাণের ভয়, মানের ভয়, কষ্টের ভয়, লাঞ্ছনার ভয় সকল পরিহার করিয়া বিশ্বাসের জোরে জলে লাফাইয়া পড় দেখিবে সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া সংসার সমুদ্র পার হইয়াছ। আর কোন অন্তরায়ই তোমাকে বাধা দিতে পারিবে না। পড়িবার পুর্ব্বে যত ভয়ের কারণ দেখিয়া ভীত হইয়াছিলে, আশাহীন হইতেছিলে, তাহা আর কিছুই নাই, তোমার সাহসের নিকট তাহারা হারি মানিয়া পলায়ন করিয়াছে। প্রকৃত বল না পাওয়া পর্য্যন্ত তোমার মন ঢুলিবে ; এক একটী ঘটনা আসিবে আর তোমার প্রাণ চমকিয়া উঠিবে ; সংসারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার এই দোলায়মান অবস্থা ঘুচিবে না, স্থিরভাবে লক্ষপথে কাজ করিতে পারিবে না। আগে সত্যতে স্থির হও তার পর ন্যায়েতে দৃঢ় হও পরে ঈশ্বর কৃপা অবতীর্ণ হইয়া তোমার হৃদয়ক্ষেত্র সমভূমি করিয়া প্রেমপ্রবাহ প্রবাহিত করিবে। সেই প্রেমবন্যা যখন সংসারের অসারত্ব ভাসাইয়া দিবে, তখন তুমি স্থিরভূমি প্রাপ্ত হইবে। একদিনে কেহ লক্ষস্থানে যাইতে পারে নাই, একদিনের চেষ্টায় কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। সকলি আস্তে আস্তে একটু একটু করিয়া সম্পন্ন হয়, এই জগতের নিয়ম তুমি আমি ইহার অন্যথাচরণ করিয়া কেন কৃতকার্য্য হইব? যে ভাবে প্রতিদিন কাজ করিতেছ তাহা করিলে চলিবে না, তাহাতে সময়ের মূল্য জানিতে পারিবে না। এমত কতকগুলি কার্য্য নিত্য করা আবশ্যক যাহাদ্বারা অল্প অল্প অগ্রবর্ত্তী হইতে পার, কালে লক্ষস্থানে পৌঁছিতে পার। আপনার

প্রবৃত্তির উত্তেজনায় কিছু করিবে না, আপনার স্বার্থ কাহারও মধ্যে খুঁজিবে না। বিশ্বজনীন ভাবে প্রণোদিত হইয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। তাহা হইলে অবিচলিতরূপে সত্যকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। মহাজনদিগের হৃদয়ে যে শক্তি কার্য্য করিয়াছে আমাদের হৃদয়েও তাহার অঙ্কুর রহিয়াছে। আমরা সত্যসার ন্যায়বারি প্রদান করিলে তাহা হইতেই তেজস্বান বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল প্রদানে আমাদিগকে সুখী করিবে। আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা উচিত ! কেননা অভ্যস্ত বশতঃ অলক্ষিতরূপে অসত্যভাব প্রবেশ করিয়া বারবার আমাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছে। এইজন্য ন্যায়ের তীক্ষ্ণধারে সর্ব্বদা বাস করিতে হইবে। আর দৃঢ়তার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিতে হইবে। প্রকৃতির কোলে থাকিয়া বিশুদ্ধভাবে কার্য্যকর এই ঈশ্বরের আদেশ ; ইহা রক্ষা করিতে পারিলেই তুমি কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া স্থির হইবে। পিতার আদেশ পালন করিতে যদি কুটিল সংসারে যুগান্তর উপস্থিত হয়, তোমার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়; আর এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে তাহা অম্লান বদনে স্বীকার করিবে। কারণ তোমার নশ্বর প্রাণের জন্য ঐ অমূল্য সত্য নষ্ট হইতে পারে না। তোমার স্বার্থের জন্য উহা বিকৃতভাবে প্রচার করিয়া নরকের পথে যাইতে পার না। নিজের সমস্ত অর্পণ করিয়াও যদি তাহা রাখিতে পার তবেই মনুষ্য নামের যথার্থ গৌরব রক্ষা করিলে। অন্যথা যে অসার তাহাই রহিলে। অন্যায়ের সেবা করিয়া আমাদের শক্তি

যেরূপ ক্ষীণভাব ধারণ করিয়াছে, এত দিনের অলসতার সেবা করিয়া আমরা যেরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে এইরূপ নিরুৎসাহ ভাব লইয়া কখনও গন্তব্য পথে যাইতে পারিব না। যদি প্রবল উৎসাহানলে জীবনকে ফেলিয়া দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে পারি তবেই আশা করিতে পারি একদিন উদ্দেশ্য পথে পৌছিতে পারিব।

শ্রীমতি অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়,
আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

ভাগবত সার।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে কোথাও সঙ্কলন, কোথাও ব্যাখ্যা দ্বারা লিখিত।

যাঁহা হইতে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, যিনি সকল বস্তুতে সদ্রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার অস্তিত্বে সকলের অস্তিত্ব এবং যাঁহা ব্যতীত সকলই আকাশ কুসুমবৎ মিথ্যা, যিনি কারণের কারণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, জ্ঞানময় মহান্ পুরুষ, যিনি ধর্ম্মের আবহ, শান্তির নিলয়, সত্ত্ব রজঃ গুণাবলী যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, যাঁহার অধিষ্ঠানে সংসাররূপ মরীচিকার উচ্ছেদ হয়, আত্মার অহঙ্কারিত্ব ঘুচিয়া যায় এবং জীবের মায়িক সম্বন্ধ নিরস্ত হয়, সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। এই শ্রীমদ্ভাগবত

শাস্ত্রে এমন অমূল্য সত্য রত্ন আছে, যাহা লাভ করিলে মানবের কপট আবরণ ছিন্ন হইয়া যায়, মুক্তির বাসনা নিরস্ত হয়, এবং জীব মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হওতঃ কামনা রহিত হয়। দৈব ঘটিত ও কার্য্যজনিত যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহার বিনাশকারী আরামপ্রদ মহৌষধ ইহাতে নিহিত আছে। সেই সত্যের মধ্য দিয়া গমন করিতে পারিলে পরমার্থ লাভ হয় ও অনায়াসে পরম বস্তুর দর্শন হয়। ইহাতে এত অধিকতর ধ্রুব সত্য নিহিত আছে যে, ধর্ম্মরাজ্যে যাইবার জন্য শাস্ত্রের আবশ্যক করে না বলিলেও হয়। অন্যান্য শাস্ত্র পাঠে যেন ঈশ্বরকে সহসা ধরা যায় না, কিন্তু এ শাস্ত্র তেমত নহে। প্রত্যেক পৃষ্ঠা পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎরূপে দর্শন ও হৃদয়ে ধারণ করা যায়। এজন্য অনন্যমনা হইয়া এ শাস্ত্র শ্রবণ ও তদুপযুক্ত সাধন করিতে পারিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। এক কল্প বৃক্ষ হইতে যেমন নানা বিধ ফল প্রসবিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে সুধাপূর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভাগবত শাস্ত্ররূপ কল্প বৃক্ষ হইতে সত্য, ন্যায়, দয়া, প্রেম ইত্যাদি মোক্ষপ্রদ ফল প্রসবিত হইয়া অগণ্য নর-নারীকে শান্তিধামের যাত্রী করিয়া থাকে। আগ্রহের সহিত সকলেরই এই সত্যামৃত পান করা বিধেয়। এই অমৃত পান করিবার জন্য তৃষিত হইয়া শৌণকাদি ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে অতি কঠোর যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদা তাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি আশয়ে ব্যাকুল অন্তরে নানা প্রকার অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন এমন সময়ে উগ্রশ্রবা নামে সূত তথায় উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপিপাসু ঋষিগণ সেই অবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত

পুলকিত হইলেন ও সমাদরে বসিবার আসন প্রদান করিয়া অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত! তুমি ইতিহাস, পুরাণ এবং সকল প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ আছ। বিশেষ মনীষা সম্পন্ন মুনিগণ যে সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের সহবাসে ও অনুকম্পায় তুমিও সেই সকল অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছ। অতএব সেই সকল শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা দ্বারা যে সকল অবিরোধী শ্রেয়ঃ সাধন নিশ্চয় করিয়াছ, তাহা আমাদিগকে শ্রবণ করাও। এই কলিযুগের প্রায় সকল লোকই অল্পায়ু, তাহাতে আবার কোন কার্য্যেই বিশেষ উদ্যোগী নহে; একে অলস, তাহাতে আবার বিঘ্ন দেখিলেই ব্যাকুল হওতঃ কার্য্যে নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। এই প্রকার শারীরিক মানসিক নানাবিধ উপদ্রবে উত্যক্ত হইয়া অধিকাংশ মানবই কর্ত্তব্য কর্ম্মে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দেয়। সুতরাং বহু পরিশ্রম কি নানা প্রকার কষ্ট কল্পনা করিয়া এই সাগর সদৃশ শাস্ত্রসমূহ মন্থনপূর্ব্বক তত্ত্বসুধা সংগ্রহ করতঃ যে ইহাঁরা অমরত্বের পথ খুলিতে পারিবেন, সে আশা সুদূর পরাহত। কিম্বা জ্ঞাতব্য শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা যে শ্রেয়ঃসাধন ঠিক করিয়া লইবেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব হে সাধো! সকল শাস্ত্র আলোড়ন দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ সেই সকল উদ্ধারিত সার বর্ণনা করিয়া প্রসন্ন কর। জগতের গূঢ় রহস্য জানিবার জন্য আমরা নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি, তুমি সেই বিষয় ব্যক্ত করিয়া আমাদের ব্যাকুলতার শান্তি কর। যাঁহার নামে ঘোর সংসারাশক্ত বিবশ বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণও সংসার হইতে মুক্ত হয়, যাঁহার নাম স্মরণমাত্র ভয় ভীত হইয়া পলায়ন করে, যাঁহার

পদ আশ্রয় করিয়া মুনিগণ অলৌকিক স্বর্গীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহার সহবাসজনিত বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইয়া মুনিগণ আবার শত শত লোকের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাঁহার পবিত্র নাম স্তব করিয়া মানব সিদ্ধ কাম হয়, শুদ্ধ হয়, সেই কলুষনাশন পতিত পাবনের যশঃকীর্ত্তন ও শ্রবণ করিতে কাহার না ইচ্ছা করে? গঙ্গার জল পরিষ্কৃত তাহাতে অবগাহন ব্যতীত যেমন শরীরের অপরিচ্ছন্নতা ধৌত হয় না, সেইরূপ ভগবানের সহবাস প্রাপ্ত না হইলে জীবগণ পবিত্রতা লাভে সক্ষম নহে।

যিনি পাপীর পাশ সংহারের জন্য রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাপীর নিকট উপস্থিত হন, যিনি ব্রহ্মরূপে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতির মূলে বর্ত্তমান থাকিয়া বিশ্বজনীন উদার কার্য্যের পরিচয় দিতে-ছেন, যাঁহার প্রেমে প্রমোদিত হইয়া নারদাদি জ্ঞানীগণ গীত-চ্ছলে গুণ বর্ণনা করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, সেই ভগবানের তত্ত্ব জানিবার জন্য আমাদের বলবতী শ্রদ্ধা ও প্রবল ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমা-দিগকে তাহা শ্রবণ করাও। হে বুদ্ধিমন্! ঈশ্বরের মঙ্গলভাব ও শুভকার্য্যের বর্ণন কর; তিনি ঈশ্বর, আপন ইচ্ছানুসারেই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। সূত! যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা অনেক সময় তৃপ্ত হইয়াছি সত্য, কিন্তু ভগবানের পবিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া এ পর্য্যন্ত বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। রস নিঃসারিত ইক্ষু সদৃশ জীবনই তাহার পরিচয় দিতেছে। সুধা স্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন পাইলে এবং তাঁহার প্রেম সুধা পান করিতে পারিলে কি জীবন এই রূপ শুষ্কভাব ধারণ করে? হরি চরিত্র শ্রবণ করিতে

করিতে কত শুষ্ক হৃদয় সরস হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর সরস জীবন সেই ভাবে সম্বর্দ্ধন করিয়া পরমার্থ লাভে সক্ষম হইয়াছে। সাধকের হৃদয় দ্বারা যিনি জগতের গূঢ় ও কপট রহস্য উচ্ছেদ করতঃ যে সকল আশ্চর্য্য কার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং অমানুষিক ব্যাপার সংঘটন করিয়া সাধারণ মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে পরাস্ত করিয়াছেন, তাহার সমুদায় শক্তি বর্ণন কর। হে সূত! কলিযুগ উপস্থিত দেখিয়া আমরা পাপ ভয়ে ভীত হওতঃ পুণ্যলোক প্রাপ্তি মানসে এই পুণ্যক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকাল সাধ্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বসিয়া আছি। তোমার বর্ণিত ঈশ্বরতত্ত্ব শুনিবার আমাদের এই উত্তম সময়। আমরা মানবের সত্যনাশক দুস্তর পাপ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার মানস করিয়াছিলাম; এ সময়ে তোমাকে কর্ণধার সদৃশ সাহায্যকারী প্রাপ্ত হওয়াতে মনে হইতেছে, ইহা যেন ঈশ্বর কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইল। সূত! জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, ধর্ম্মরক্ষণশীল সাধকগণ যখন মর্ত্তলীলা সম্বরণ করেন, তখন ধর্ম্ম কাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে? বেদবেত্তা শৌণকাদির এই সকল প্রশ্নে লোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবা অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং তাঁহাদের বাক্যের সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিবাক্য দান জন্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্ররোচনের পূর্ব্বে গুরুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্ত্তব্য বিধায় সূত স্বীয় গুরু শুকদেবের ঐশ্বর্য্য চরিত্র বর্ণন দ্বারা নমস্কার করিতেছেন—যিনি বাসনা শূন্য হৃদয়ে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করতঃ কঠোর সন্ন্যাসাশ্রম করিয়াছিলেন, যাঁহার অসাধারণ যোগবলে সমস্ত সংসার গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছিল, যিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে

প্রবেশ করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্যাসনন্দন শুকদেবকে নমস্কার করি। যাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা, যিনি সংসাররূপ ঘোর অন্ধকার হইতে উদ্ধারের জন্য অধ্যাত্ম প্রকাশক অনুপম দীপস্বরূপ বেদসার ও পুরাণের গুহ্য মর্ম্ম সংসারিগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মুনিশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে নমস্কার করি। এবং কারণের কারণ, ঈশ্বরকে নমস্কার করি। সাধক ও দেবীগণকে নমস্কার করি। সূত এইরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া ঋষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনি সকল! আপনারা আমাকে অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। ঈশ্বর বিষয়ক প্রশ্ন মানবের পরম মঙ্গল-জনক। ইহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়। আপনারা সর্ব্ব শাস্ত্রের সার ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছেন, যাহা জানি বলিতেছি—শ্রবণ করুন। ধর্ম্ম দুই প্রকার; সকাম ও নিষ্কাম। সংসারের সাধারণ ধর্ম্ম যাহা, তাহাই প্রবৃত্ত লক্ষণাক্রান্ত, আর স্বর্গধামে যাইবার যে ধর্ম্ম, তাহাই নিবৃত্তি লক্ষণ যুক্ত। ফলাভিসন্ধান বিরহিত এবং অসংখ্য বিষয় কর্ত্তৃক জড়িত হইয়াও অপ্রতিহত ভাবে ঈশ্বরে যে অটল ভক্তি জন্মে, তাহাই পরম ধর্ম্ম এবং তাহাই পরম মঙ্গল। কেন না তদ্দ্বারা অশেষ বিপদ অতিক্রম করিয়া চিত্ত উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হওতঃ প্রসন্ন হয়।

ব্রহ্মে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিলে অনিত্য বিষয়ে বৈরাগ্য এবং প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বিষয়ের দূষিত ভাব ও সংসারের নীরস তর্কাদি হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া বিশ্বাসের ভিত্তিকে কখনও টলাইতে সক্ষম হয় না। যে সকল কার্য্য ভাব ও ধর্ম্ম বলিয়া

প্রসিদ্ধ, তাহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি তদ্দ্বারা ঈশ্বরানুরাগ ও ঈশ্বর প্রীতি উৎপন্ন না হয়, তবে অনুষ্ঠিত শ্রম সকলই নিষ্ফল জানিতে হইবে। বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়, জীবের মুক্তি পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম, তাহার ফল কখনও অর্থ, মণিমাণিক্যাদি হইতে পারে না এবং ধর্ম্মের যে অবিরোধী সত্য, তাহারও ফল কাম হইতে পারে না। আবার বাসনার ফলও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নয়। কেবল জীবন ধারনের জন্য যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তন্মাত্রই বাসনার ফল। তদ্রূপ ইহলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা যে মানবের মোক্ষপ্রাপ্তি প্রচলিত আছে, তাহাই উহার ফল নহে; পরম তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়াই ইহার প্রকৃত ফল। অনেকের বিশ্বাস, হৃদয়ে যখন তত্ত্ব জানিবার ভাব উদয় হয়, তখনই ধর্ম্ম-পিপাসু হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়। পরম তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্মে জ্ঞান হওয়াকেই তত্ত্বজ্ঞান বলেন। সাধারণ ও বিশেষ তত্ত্বের ভাব লইয়া এবং এই দুই তত্ত্ব জড়িত হইয়া বহু প্রকার তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রদ্ধাশালী মুনিগণ বেদান্ত শ্রবণ দ্বারা যে পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যে বৈরাগ্য ও ভক্তি দ্বারা আপনার মধ্যে সেই তত্ত্ব দেখিতে পাইয়াছে, তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব। হে ঋষিগণ! মানবের যে চারিটি আশ্রমের উল্লেখ আছে, তাহার যে কোন আশ্রমেই হউক না কেন যদ্দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন হয় ও ঈশ্বর প্রীত হন তাহাই সিদ্ধি প্রাপ্ত ও ফলপ্রদ। ভক্তি উৎপন্ন করাই মানব জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। আবার ঈশ্বর সেবা ব্যতীত তাহা অসম্ভব। সুতরাং সকলেরই একাগ্রচিত্তে

প্রতিনিয়ত সেই ভক্ত বৎসল ভগবানের তত্ত্ব শ্রবণ মনন কীর্ত্তন এবং তাঁহাকে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহাকে ধ্যান করিয়া মানবগণ জ্ঞান অসি প্রাপ্ত হওতঃ অহঙ্কারাদি বিবেকের সকল প্রকার অন্তরায়কে সমূলে উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হয়, সেই জ্ঞানময়ের আদেশকে ইচ্ছার সহিত কে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে? যদি সেই মঙ্গলালয়ে কাহারও প্রীতি না হয়, তবে অগ্রে তিনি সৎকার্য্যাদি দ্বারা আপন বিবেককে জাগ্রত করুন, পরে অনুতাপানল প্রজ্জলিত হইয়া তাঁহার অবিশ্বাস মোহান্ধকার ভস্মীভূত করিয়া তাঁহাকে নিষ্পাপ করতঃ সেই ঈশ্বর সেবায় প্রবৃত্তি ও তাঁহার ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিবে। তখন ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিতে এবং ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে নিশ্চয়ই ব্যাকুলতা জন্মিবে। একবার ঈশ্বর বাক্যে অনুরাগ জন্মিলে সকল অন্তরায় তিরোহিত হওয়ার আশা হইল, কারণ দৃষ্টি পড়ামাত্র হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং সত্যস্বরূপ ঈশ্বর মানবের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদের হৃদ্গত সকল প্রকার দূষিত ভাব ও মলিন কামনা সকল নষ্ট করিয়া থাকেন। প্রতিনিয়ত ব্রহ্মের সেবা করিতে পারিলে অচিরে সকল অশুভ বিনাশ হইয়া ঈশ্বরে স্থির ভক্তি জন্মে। তখন রজঃ তমো গুণাশ্রিত কাম, লোভ, মদ, মাৎসর্য্যাদি প্রবলরূপে আক্রমণ করিয়া চিত্তকে কখনই আর বিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। ঈশ্বরকে লাভ করিয়া চিত্ত সত্ত্বগুণে স্থির করিয়া স্থির প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। ভক্তি যোগ দ্বারাই বাসনার বিরাম হয় ও হৃদয়ানন্দকারী অমৃত স্বরূপকে লাভ করিয়া চিত্ত প্রসন্ন হয়। কামনার নিবৃত্তি হইলেই ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় এবং

তত্বজ্ঞান জন্মিলে আত্মার আত্মা পরমাত্মার সহিত প্রগাঢ় যোগ স্থাপিত হয়; তার পর মানবের মোহ অহঙ্কারাদিরূপ যে হৃদয়গ্রন্থি, তাহা আপনা হইতেই ছিন্ন হইয়া যায়। অসম্ভব সম্ভব করিয়া, সকল সংশয় দূর করিয়া, ঈশ্বর কৃপা হৃদয়ে উপস্থিত হওতঃ সকল অন্তরায় নষ্ট করিয়া থাকে। এই সকল কারণে জ্ঞানীগণ অনিত্য বিষয় বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া পরম আহ্লাদের সহিত হৃদয় নির্ম্মলকারী পবিত্রস্বরূপে সর্ব্বদাই ভক্তি করিয়া থাকেন। প্রকৃতির রজঃ তম সত্ব গুণের মূলে যদিও এক মহান্ পুরুষ যুক্ত থাকিয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তথাপি সত্ব গুণ আশ্রয় করিয়া ও সত্বভাবে ধ্যান করিয়াই মনুষ্যগণ মোক্ষফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক এক কার্য্য সাধন জন্য ঈশ্বরের নামেরও পৃথক পৃথক সংজ্ঞা হইয়াছে। সকল কার্য্যের মূলে ঈশ্বর দর্শন সাতিশয় সাধন সাপেক্ষ। রজঃ তম সত্ব গুণের এত স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় যে, কাষ্ঠ ধূম অগ্নি এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন ভাবের যত পার্থক্য, ইহাও তদ্রূপ। প্রবৃত্তিশূন্য নির্ম্মল জীবন কাষ্ঠে যখন প্রকৃতির রজঃ তমোগুণ প্রস্ফুটিত হয়, তখন ব্রহ্মতেজে বাসনা জঞ্জালে ধূম উদ্গত হইয়া জীবনকে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিতে থাকে; তৎপর সত্বগুণে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া জীবকে মুক্তিধামে লইয়া যায়।

এই জন্যই মুনিগণ, সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। যখন যেকালে মানবগণ সাধকদিগের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছেন, সকলেই ইহ সংসারে আপনার শ্রেয়ঃ দেখিতে পাইয়াছেন। পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী লোকেরাই সংসারের

প্রবল আসক্তি তুচ্ছ করিয়া, হিংসা, দ্বেষ পরিশূন্য হৃদয়ে শান্তি-স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে সক্ষম। বিষয়াসক্ত মানব, আপন স্বার্থানুরূপ উপাস্য দেবতার কল্পনা করিয়া পূজা করিয়া থাকে। এই জন্য রজো, তমোগুণাধিক্য ব্যক্তিগণ পার্থিব সুখ ঐশ্বর্য্য, পুত্রাদি কামনায় নানা প্রকার ব্রত এবং প্রজাপতি ইত্যাদির অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ব্রহ্মোপসনার দ্বারাই কেবল জীবের মুক্তি হইয়া থাকে এবং সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্যও এই। বেদাদির তাৎপর্য্য দেখ, কেবল ঈশ্বরতত্ত্ব মানব হৃদয়ে মুদ্রিত করা। এইরূপ যজ্ঞাদি কার্য্যও তাঁহারি আরাধনার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যা এবং ধর্ম্ম ইহার সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য সেই ঈশ্বর। ব্রহ্মই সকলের পরম ও শেষগতি। এই সমস্ত জগতের সৃষ্টির কারণ তিনি। সৃষ্টির মূলে এবং বিশ্বের সকল কার্য্যের মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন বলিয়াই তিনি বিভু। তিনি সত্যস্বরূপ নির্গুণ অথচ সকল গুণের আকর। আকাশ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত। আবার সেই আকাশই স্বীয় গুণ দ্বারা মানবের নিকট তাঁহাকে প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ সমস্ত গুণের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া দেখিলে গুণের আধাররূপে তিনি গুণবানের ন্যায় প্রকাশ পান। কিন্তু বাস্তবিক তিনি গুণবান নহেন। গুণের অতীত, চৈতন্যরূপে সকল কালে তিনি প্রকাশিত। যেমন অগ্নি কাষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া, কাষ্ঠাদির তারতম্যানুসারে নানা প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্রূপ বিশ্বাধার-পরমেশ্বর সমস্ত গুণের অন্তে স্থিত হইয়া পাত্রের তারতম্যানুসারে নানারূপে প্রকাশ পান। সৃষ্ট বস্তুর মধ্য দিয়া নিজে প্রকাশিত হইয়া

থাকেন। ভগবান, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, নর সকলকেই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। বিবেক দ্বারা মানবের অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ ভাবের আবির্ভাব করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিবার শক্তি প্রদান করিয়া জাগ্রত রাখেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল কাল জুড়িয়া এবং অসীম ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া তাঁহার এক বিরাট মূর্ত্তি প্রকাশিত। তাঁহার ঐ বিরাট মূর্ত্তির মধ্যে ভূলোকাদি সমস্তই ভাসমান। কিন্তু রজঃ, তম গুণাদি অস্পৃষ্ট যে বিশুদ্ধ সত্য তাহাই তাঁহার যথার্থ রূপ। ঐ বিরাট মূর্ত্তির সকলই অপরিমিত, অসীম হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, বদন, মস্তক ইহার সকলই অপরিমিত অসীম এই অদ্ভুত বিরাট মূর্ত্তির সকল কার্য্যই আশ্চর্য্যজনক। যোগীগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সর্ব্বদাই এই বিশ্বজনীন সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পান। এই বিরাট মূর্ত্তিই সমুদায় সৃষ্টির বীজ। সকলই ইহাঁ হইতে হইয়াছে অথচ তিনি অব্যয় কোনকালে তাঁহার বিনাশ নাই। তিনি কেবল সৃষ্ট বস্তুর বীজ এমত নয়, আবার সকলের নিধন অন্তিমে আবার সকলেরই প্রবেশ স্থান। এই অক্ষয় বিরাট মূর্ত্তিই ধ্যান করিয়াই সনৎকুমারাদি মুনিগণ অতি দুর্গম ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করতঃ স্বর্গ আশ্রয় করিয়াছিলেন। এবং এই মহান্ শক্তি হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইয়া রসাতলগত ধরা অর্থাৎ পাপপূর্ণ পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করেন। সাধকগণ এই বিরাট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন তাহা দ্বারা নিষ্কামধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। তাহা বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির নিদান হয়। এক এক সাধকের হৃদয় দ্বারা ঈশ্বরের এক এক ভাব বিশেষরূপে প্রতিভাত হয়। যিনি যে বিষয়ের সাধনা করেন

তাঁহার মধ্যে সেই বিষয়ই বিকাশিত হয়। ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তির গর্ত্তজাত কুমারদ্বয়ের মধ্যে কি ঈশ্বরনিষ্ঠার ভাব, কি নিস্বার্থ ত্যাগের ভাব। এইরূপ এক এক সাধক কর্ত্তৃক এক এক ভাব সিদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া, জগতের লুপ্ত তত্ত্ব ও গুপ্ত তত্ত্ব সকল অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। এক সময়, অলর্ক প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ দ্বারা বিশ্বাস ও প্রেম এবং নির্ভরের কি অপরাজিত স্বর্গীয় শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। ভক্তবৃন্দ কি অসাধারণ ক্ষমতা প্রভাবে সকল লোকদিগকে আপনার অধিকারে আনিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া কর্ত্তৃত্ব পদ লাভ করিয়াছিলেন। ঋষভ মহাত্মা, শান্তধীর মানবগণকে সকল আশ্রম পূজিত যে বিশুদ্ধ পথ অর্থাৎ পরমহংস সম্বন্ধীয় পবিত্র রীতি নীতি সকল দেখাইয়াছিলেন। অরাজকতা মহামারীর উৎপীড়নে ঋষিগণ যখন নিতান্ত জালাতন হইতে-ছিলেন সেই সময় পৃথুরাজ ঈশ্বর প্রেমে বিগলিত হইয়া পৃথিবী হইতে তত্ত্বরূপ মহৌষধি দোহন দ্বারা মহামারীর শান্তি করিয়া-ছিলেন। হে বিপ্রগণ! এই কারণেই পৃথুর রাজত্বকাল, সর্ব্ব-জনের এত আদরণীয় এবং তাঁহার ভাব এত কমনীয়। যখনই পাপভরে পৃথিবী যায় যায় হয় তখনই ব্রহ্মদাসগণ দ্বারা তাহা পুনঃ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের সত্য রাজ্য কখনও বিনাশ হইতে পারে না। ধরার মলিন পঙ্কিলভাবে যখন অমৃত প্রণালীর দ্বার সকল বদ্ধ হইতে যায়, ব্রহ্মশক্তির বলে অতি নীচ জীব দ্বারাও তখন সেই বাধা উন্মুক্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মভক্তের নিকট পাপাসুর পরাভূত হইয়া যায়। সত্য অনুচর হইয়া অমৃত যোগাইয়া দেয় এবং অমৃতের অধিকারীগণকে তাহা পান

করায়। বলদর্পিত পাপাদিগকে রুদ্রমূর্ত্তি ব্রহ্ম তৃণবৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া সত্যের জয় প্রতিষ্ঠা করেন। ধার্ম্মিকের মধ্যেও যদি কণিকা মাত্র অসত্য ভাব মিশ্রিত থাকে তাহাও ব্রহ্ম-জ্যোতির নিকট বাহির হইয়া পড়ে। বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কারও তাহার নিকট প্রশ্রয় পাইতে পারে না। অহঙ্কারীর দ্বারাই তাহা দমন করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়গণ যখন ঈশ্বরদ্রোহী হইয়া অন্যায় বলে রাজত্ব পদ গ্রহণ করিতে-ছিল অতি অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাদিগকে সত্যের নিকট প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জীবনদান করিয়া পৃথিবী হইতে মুক্ত হইতে হইয়াছিল। মানবগণ বুদ্ধিহীন হইয়া যখন ভ্রমের আশ্রয় লইয়াছিল তখন ব্রহ্ম ভক্ত ব্যাস তাহাদের ভ্রমনিরাকরণের জন্ত ধর্ম্ম বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া বেদভাণ্ডারে সঞ্চিত করেন। ঈশ্বরের কার্য্য করিবার জন্ম যখন নরগণ প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখনি ঈশ্বর হইতে বল প্রাপ্ত হইয়া মহাবীর্য্যবানের কার্য্য সম্পন্ন করতঃ দেব পদবী লাভ করিয়াছেন। এইরূপ ব্রহ্মশক্তির সহিত মানবের ক্ষুদ্র শক্তি মিলিত হইয়া অসাধারণ প্রভাবে পৃথিবীর পাপ ভার লাঘব করিয়া থাকে। এইক্ষণ ঘোর কলির আবির্ভাব। সত্যদ্বেষী দেবদ্বেষী পাপ অসুর-গণের অত্যাচারে সকলেই মোহে আচ্ছন্ন। এই মোহান্ধকারও সত্যালোক দ্বারা একদিন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কলির এ দুর্দ্দিন চিরদিন থাকিবে না। ঈশ্বরের সেবক দ্বারা আবার সত্য যুগ আসিবে। হে দ্বিজগণ! গুণের নিধি ভগবানের কোন্ স্বরূপটীর বর্ণনা করিব। অপার অসংখ্য স্বরূপের স্বরূপ-তত্ত্ব কত বলিব? যেমন খোদিত জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র

ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া জলাশয় পূর্ণ করিয়া ফেলে সেই রূপ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীর মধ্য দিয়া প্রত্যেক ঘটনার মধ্য দিয়া, সকল পদার্থের মধ্য দিয়া, প্রত্যেক কার্য্যের মধ্য দিয়া ব্রহ্মতত্ত্বরস নিস্থত হইতেছে। তাঁহার স্বরূপে সমস্ত জগৎ ওতপ্রোত। সকলের মধ্যেই তাহার ভাব রহিয়াছে। মহাপ্রভাবশালী মানব, ঋষি, মনু, মনুপুত্র প্রভৃতি যত মহাত্মা দেখিতে পান সকলের মধ্যেই তাঁহার অবিনাশী ভাব রহিয়াছে। হে ঋষিগণ, পূর্ব্বে যে সকল পরম পবিত্র সাধকের কথা বলিলাম তন্মধ্যে কাহার কাহার মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি অল্প বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, কাহার কাহার মধ্যে বিশেষ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার কারণ কেবল সাধনার ইতর বিশেষ। এই জগৎ পাপরূপ দৈত্য দ্বারা উপদ্রুত হইলে সর্ব্বকালে এই ঈশ্বরভক্তবৃন্দই পাপ দৈত্য বিনাশ পূর্ব্বক মানবগণকে নিরুপদ্রব করিয়া সুখী করিয়াছেন। ভক্তহৃদয়ে ভক্তবৎসল ভগবানের আশ্চর্য্য শক্তি দর্শন করিয়া যে মানব পবিত্র মনে প্রতিনিয়ত সেই ভগবানের নাম ভক্তিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করেন দুঃখ-রূপ এই সংসার হইতে তাঁহার পরিত্রাণ হয়। জ্ঞানই জীবের রূপ। জ্ঞান ব্যতীত যে রূপ তাহা বিনাশী। এইরূপ গুণ মায়া গুণাশ্রিত। শরীরের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার বিনাশ হয়। মানবের আত্মা নিরাকার এবং পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। মেঘ যেমন বায়ুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, জীবাত্মাও সেইরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আত্মা পরমাত্মায় বাস করিয়াও যে কলঙ্কিত হয়, তাহা শরীরি মায়া গুণের কর্ম্ম জনিত। জ্ঞানই

মানবের উপাধি, জ্ঞানই মানবের মানবত্ব। জন্ম হইলেই জীবের পার্থিব শরীর লইয়া একটীর উপাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে বটে কিন্তু তাহা প্রকৃত মানবের পরিচায়ক নহে। জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত মানব জীবনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশ্য থাকে। এই জন্যই পুনঃ জন্মের কথা অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাই। যখন সৎ অসৎ জ্ঞান দ্বারা মীমাংসা করতঃ মিথ্যা হইতে জীব আপনাকে উন্মুক্ত করে তখন মানব জ্ঞান যোগে যোগী হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপে লীন হয়। সংসার চক্রের মায়া-কারিণী শক্তি ব্রহ্মতেজে দগ্ধ করিতে পারিলেই জীবের ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি হয়। তত্ত্বজ্ঞেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। তৎপরেই জীব পরমানন্দ স্বরূপে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মের মহিমার্ণবে ভাসিতে থাকেন। কর্ম্ম এবং জন্ম রহিত ভগবানের সাধনা দ্বারাই জীব জন্ম ও কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে অর্থ ও অন্যান্য কর্ম্ম জনিত কাল ভোগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। হে ঋষিগণ! পণ্ডিতেরা অন্তর্য্যামী ভগবানের গুহ্য সেই সকল সত্য জ্ঞাত হইয়া বর্ণন করিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর কর্ম্মহীন হইয়াও এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন এবং অন্তর্যামীরূপে সকল ভূতের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সকলের নিয়ন্তা। কুবুদ্ধি, তর্কাদি কৌশল দ্বারা সেই পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। ভগবান আপন স্বরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেই ব্যাপ্ত রাখিয়াছেন। অজ্ঞলোকেরা তাহা বুঝিবে কি প্রকারে? ভক্তগণ কপটতা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বর সেবায় রত হইলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বরূপ মাহাত্ম্য জানিতে পারেন। হে ঋষিগণ! আপনারাই

ধন্য কেননা এইরূপ ঈশ্বর জিজ্ঞাসু হইয়াই মানব মৃত্যুকে জয় করতঃ অমরত্ব লাভ করে।

আমি আপনাদিগের নিকট যে ভাগবত পুরাণ বলিতেছি তাহা ব্রহ্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ এবং সকল বেদের সমতুল্য। ইহাতে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অতি উত্তম উত্তম শ্লোক বর্ণিত আছে। মহর্ষি বেদব্যাস লোকের কল্যাণার্থ এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ইহা পাঠ করিলে মানব পুরুষার্থ লাভ করিয়া পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। মহর্ষি বেদব্যাস, লব্ধ জ্ঞান এবং ইতিহাসের সার সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থ দ্বারা স্বীয় পুত্র ধীমান শুকদেবকে উপদেশ দিয়াছেন। মহারাজ পরীক্ষিত ঋষিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণ ত্যাগার্থ অনশন ব্রত গ্রহণ দ্বারা গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইলে শুকদেব এই শাস্ত্র তাঁহাকে শ্রবণ করান। তখন অজ্ঞান তিমিরে সকলের চক্ষুই অন্ধ ছিল, সুতরাং এই পুরাণের অভ্যুদয়ে দিবাকর সদৃশ হইল। বিপ্রর্ষি শুকদেব সেই স্থানে পাঠ আরম্ভ করিলে তাঁহার অনুগ্রহে আমিও তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহা পাঠ করিয়াছি। এইক্ষণ আমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে ইহা আপনাদিগকে শ্রবণ করাইব। স্থত এই কথা বলিলে যজ্ঞকর্ম্মব্যাপৃত মুনিগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য শৌনক মুনি স্থতের অশেষ প্রশংসা করতঃ সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন "হে মহাভাগ স্থত! তুমি অতিশয় সদ্বক্তা, মহাত্মা শুকদেব যে ভাগবত তত্ত্ব বলিয়াছেন তাহাই আমাদিগের নিকট বর্ণন কর। হাঁ স্থত! কোন যুগে এই ভাগবত তত্ত্ব প্রচারিত হয়? মহর্ষি বেদব্যাস অনেক গুলি ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও আবার কিজন্য ভাগবত সংহিতা করিলেন? এবং এ বিষয়ে তাঁহার

প্রবর্ত্তক কে? আর কোথাইবা ইহা সংগ্রহ করিলেন? তুমি এইমাত্র বলিলে ব্যাস তনয় শুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে ভাগবত তত্ত্ব শ্রবণ করান। শুকদেব মহাযোগী ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল না। একমাত্র পরব্রহ্মে সতত চিত্ত সমাধান করিয়া মায়ারূপ শয্যায় জাগ্রত অবস্থায় বাস করিতেন। এজন্য সাধারণ লোকে তাঁহার স্বভাব জানিতে না পারিয়া মূঢ়ের ন্যায় বোধ করিত। তিনি যে ভেদ দৃষ্টি বিরহিত ছিলেন অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পে তাহা বুঝা যাই-তেছে। সে যাহা হউক যখন তিনি সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক কুরুজাঙ্গলদেশ ভ্রমন করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় অবস্থায় হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন পুরবাসী লোকেরা তাঁহাকে কিরূপে চিনিল? আর ঈদৃশ মুনির সহিত পাণ্ডুবংশাবতংশ রাজর্ষি পরীক্ষিতেরই বা কিরূপে কথোপ-কথন হইল? উভয়ের পরস্পর সংবাদেইত ভাগবত সংহিতার সৃষ্টি হয়? এই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা বহুকাল সাপেক্ষ। শুনিয়াছি একটী গো দোহন করিলে যতটুকু সময়ের আবশ্যক করে তাহার অতিরিক্ত কোথাও তিনি অপেক্ষা করেন না। তবে কিরূপে যোগীবর শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। নিশ্চয়ই এই বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য্য জনক হইবে, অতএব আমাদের নিকট তাহা বল। লোকে অভি-মন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের জন্ম ও কর্ম্ম অতি আশ্চর্য্য জনক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহাও আমাদের নিকট বলিতে হইবে। আর একটী কথা পাণ্ডুবংশ উজ্জ্বলকারী রাজা পরীক্ষিত সাম্রাজ্য-পদ অগ্রাহ্য করিয়া সুখসম্পদ উপেক্ষা করিয়া কিজন্য দেহ

ত্যাগার্থ প্রস্তুত হইলেন। শত্রুগণও যাঁহার পাদ পদ্মে রাশি রাশি অর্থ অর্পণ করিয়া প্রণাম করিত, তিনি তরুণাবস্থায় কিজন্য প্রাণের সহিত সেই রাজশ্রী বিসর্জ্জন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন? ধার্ম্মিক ব্যক্তি অন্যের দুঃখ ঐশ্বর্য্যের নিমিত্তই জীবন ধারণ করেন। রাজা পরীক্ষিতও একজন পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া কত লোক প্রাণ ধারণ করিত, কত প্রকারে উপকৃত হইত সেই বহু জন আশ্রয় দাতা কেন নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন?

মানবজীবনের সৌন্দর্য্য।

সৌন্দর্য্য এই শব্দটী উচ্চারণ মাত্র মানবমন বাহ্য প্রকৃতির প্রতি ধাবিত হয়। কাহার লক্ষ্য বর্ণ, কাহার লক্ষ্য অঙ্গ সৌষ্ঠব, এই প্রকার বাহ্য প্রকৃতির এক একটী বিভাগ লইয়া এক এক মন ধাবিত হয়। বাস্তবিক সাধারণ সংসারের গতি এই। সাধারণ সভ্যতার মধ্য দিয়া দেখিলেই অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে, মানবের বর্ত্তমান অবস্থা কোথায় স্থিত। এই একটী মাত্র অবস্থায় ডুবিয়া জানিতে পারিব, আমরা সৌন্দর্য্য—সম্পত্তি কত হারাইয়াছি এবং সৌন্দর্য্যের গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিতে কত অসমর্থ। কাহাকে সৌন্দর্য্য বলিব? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকলের সমস্ত অবয়ব একটী সামান্য সূক্ষ্ম বীজের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, সেই ক্ষুদ্র বীজ দর্শন করিয়া কে কখন মনে করিতে পারে যে সেই শাখা প্রশাখা সমন্বিত গগনস্পর্শী বৃক্ষ

তাহার সূক্ষ্ম গহ্বরে অবস্থান করিতেছে? যত দিন প্রকৃতির রমণীয় উদ্যানে এইরূপ বৃক্ষের বিকাশ দেখে নাই, তখন বলিলে কে ইহা বিশ্বাস করিত? সকলেই তখন এই প্রত্যক্ষীভূত প্রকৃত সত্যটীকে আকাশকুসুমবৎ অলীক বাক্যাড়ম্বরে উড়াইয়া দিত। অনন্ত গুণসমন্বিত মানবজীবনও আজ ভাবী রাজ্যের সেইরূপ চির কুক্ষিগত। আজও মানবের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। আমরা বুঝিতে পারি না, মানব সৌন্দর্য্যের প্রতিভা কত, তাহার ক্ষমতা কত, জানি না সেই সৌন্দর্য্য এই নশ্বর পৃথিবী কি স্বর্গীয় শোভায় বিভাসিত হইবে; সমস্ত জগৎকে বিমুগ্ধ করিবে, স্বীয় সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবাইয়া ফেলিবে। সুতরাং মানবজীবনের সৌন্দর্য্য বলাও আমাদের পক্ষে আজ সেই প্রকার দুরূহ ব্যাপার। যাহা বলি না কেন, সকলের মধ্যেই আমাকে সেই লাঞ্ছনায় পড়িতে হইবে। আমি নিজে যখন জানিতে পারি নাই, আমাদের সৌন্দর্য্য কি, তখন সেই রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দুই চারিটা মত বলিব, তাহাতে কেনই বা জগতের নিকট হাস্যাস্পদ না হইব? হাস্যাস্পদ হইব নিশ্চয় জানি, কিন্তু তথাপি এ বাসনা ছাড়িতে পারি না; আমি অন্যের ঘৃণা তাচ্ছিল্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহাতে প্রবেশ করি নাই, নিজ গুরুতর কর্ত্তব্য জ্ঞানে শিক্ষায় প্রণোদিত হইয়াই এই সত্য আবিষ্কারের জন্য কল্পনা রাজ্যের আশ্রয় লইতেছি। কল্পনাপথে ঘুরিতে ঘুরিতে যদি সৌভাগ্যক্রমে প্রকৃত সত্য লাভ করিতে পারি, স্বাভাবিক গতিতে চালিত হইয়া আপন রাজ্যের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পারি, তবেই আমার পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে। প্রকৃত সৌন্দর্য্যের তত্ত্বানুসন্ধান

করিলে দেখিতে পাই, কি পার্থিব জগৎ, কি অন্তর্জ্জগত উভয়ের মধ্যেই সৌন্দর্য্য এক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিয়া কার্য্য বিস্তার করিতেছে। পার্থিব জগতে বিকাশের অন্তরায় অতি অল্প, সেইরূপ উন্নতিও নির্দ্দিষ্ট সীমান্তর্গত। মানবজীবনের সৌন্দর্য্য যেমন অশেষ বিঘ্ন-বিপত্তির অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে, তেমন তাহার গতিও অনন্তকাল একটু একটু করিয়া প্রস্ফুটিত হয়, একটু একটু করিয়া জগৎ অনুরঞ্জিত করে। এইরূপ অনন্তকাল কিরণ প্রদান করিয়াও তাহা মলিন হয় না। উত্তরোত্তর আরও উজ্জ্বলবর্ণে শোভান্বিত হয়। প্রকৃতির নিয়মে বীজ অঙ্কুরিত হয়, বর্দ্ধিত হয়, কালে ফল প্রসব করিয়া আপন অভিনয় শেষ করে। কুসুম বিকশিত হয়, রমণীয় সৌন্দর্য্য মানবমন মুগ্ধ করে, স্বর্গীয় গন্ধ বিতরণ দ্বারা নিদ্রিত মন জাগরিত করতঃ স্বীয় লীলা সমাপ্ত করে। সূর্য্য নিজ কক্ষস্থিত হইয়া পৃথিবীর কার্য্য সম্পন্নপূর্ব্বক অস্তমিত হয়; চন্দ্র সুধা বর্ষণ করিয়া কৃষ্ণ পক্ষের গাঢ়ান্ধকারে বিলীন হয়। এইরূপ পার্থিব জগতে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইয়া আবার নিবিয়া যায়। কিন্তু চেতন রাজ্যে ইহার ভাব ঈদৃশ নিষ্প্রভ নহে। মানবজীবন একবার উন্নতি সোপানে আরোহণ করিলে তাহার পতন নাই। অনন্ত কাল সোপান হইতে সোপানান্তরে অধিরোহণ করে। প্রথম প্রথম অনেক সময় পাপ-রাহুর গ্রাস ভয়ে সশঙ্কিত থাকিতে হয় বটে, কিন্তু কয়েক সোপান উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আর সে আশঙ্কা থাকে না। যতই অগ্রসর হয়, বাধাবিঘ্ন ততই কমিয়া পথ প্রশস্ত করে। পার্থিবরাজ্যে বিঘ্নাদি যদিও সামান্য-

কারে আক্রমণ করিয়া থাকে, তথাপি তাহার নষ্টকারীতা শক্তি নিতান্ত কম নহে। একটী আবশ্যক ফল উৎপন্ন করিতে কত যত্ন, কত চেষ্টার আবশ্যক, আবার কেবল পরিশ্রম যত্ন দ্বারাও সে ফল পুষ্প বিঘ্ন বাধার ভয় হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা যায় না। ফলাশায় বীজ মৃত্তিকায় বপন করিলাম, সেই বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পরে কত অন্তরায় উপস্থিত হইল। মৃত্তিকা সরস সারবান হইলে ভৌতিক নিয়মে বীজ অঙ্কুরিত হইল, এবং আশানুরূপ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া ভাবী আশার সঞ্চারও করিল! কিন্তু কিছুকাল পরে দেখি, আমার প্রধূমিত আশাশিখা প্রায় নির্ব্বাণের উপক্রম হইয়াছে, উপযুক্ত জীবন তাপবিহীনে তাহার জীবন প্রায় শেষ হইয়াছে। যদি সে বাধাও অতিক্রম হইল, আবার নূতন প্রকারের বিঘ্ন উপস্থিত হইল, বিষপূর্ণ দন্তদ্বারা অসংখ্য কীট আমার যত্নলব্ধ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যভাণ্ডার সেই সতেজ বৃক্ষটীকে কর্ত্তন করিয়া সকল আশা ভরসা ফুরাইয়া দিল। এইরূপ এক বাধা অতিক্রম করিলে অপর বিপদ আসিয়া অন্তরায় হয়। জগতের যত কুসুমের উদ্গমন হয়, সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ পরিস্ফুট অবস্থায় তাহার কয়টী বিকশিত হইয়া সৌন্দর্য্য বিস্তার করে? কয়টী সুগন্ধ বিতরণ করিয়া মানব মন পুলকিত করে? কতক কোরক অবস্থায়, কতক অর্দ্ধ পুষ্পিতাবস্থায় প্রকৃতির উদ্যান ম্লান করতঃ কীটকবলে কবলিত হয়; আর তাহার সৌন্দর্য্য জগতে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না এবং মনুষ্যও তাহার গুণের পরিচয় পায় না। তাহার কার্য্য সেই স্থানেই শেষ হয়। বৃক্ষ হইতে ফল পুষ্প উৎপন্ন পক্ষে তাপ জলের অভাব এবং কীটাদির আবির্ভাব ইহা কত বিঘ্নকর,

তাহা কে না বিদিত আছেন? এখন এই ভৌতিক রাজ্য ছাড়িয়া মানবরাজ্যে গেলে কি দেখিতে পাই? একবার তাহাই দেখা যাউক। এই বিপুল সংসারক্ষেত্রে এপর্য্যন্ত কত অগণিত মানবের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু এই সংখ্যাতীত লোকের কয়টী মনুষ্য প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত হইয়া সংসার উদ্যান শোভান্বিত করিয়াছে? প্রকৃত অবস্থায় স্থিত হইয়া কেবল আলোক দ্বারা চালিত হইয়া এবং নৈসর্গিক সার গ্রহণ করতঃ কয়টী মনুষ্য মানবজীবনের সৌন্দর্য্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছে? জীবনের প্রথম অঙ্ক হইতে শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত কয়টী জীবন সত্যে স্থিত হইয়া ন্যায় গতিতে চলিয়া গিয়াছে? ভৌতিক রাজ্যের উদ্যান মধ্যে যে বিপ্লব দেখিয়া আসিলাম, সংসারক্ষেত্রে মানবজীবনের অভিনয় কি তাহা হইতেও ভীষণতর নহে? এ বিশাল সংসারক্ষেত্রে কত অগণ্য অগণ্য জীবকলি মুকুলিতাবস্থায় স্বীয় লীলা সম্বরণ করিয়াছে; কত জীবন-পুষ্প সত্য ও ন্যায় জ্যোতিঃ অভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃতের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়াছে। কত জীবন পাপকীটের বিষম দংশনে দষ্ট হইয়া অভিনয়ক্ষেত্রে কলঙ্ক রেখা অঙ্কিত করতঃ জীবনলীলা পরিসমাপ্ত করিয়াছে। এইরূপ সত্যাভাবে ন্যায়াভাবে জীর্ণ শীর্ণ এবং পাপকীটে কর্ত্তিত জীবন সঙ্কুল দ্বারা সংসার উদ্যান কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আজ সংসার নাট্যশালার পট উদ্ঘাটন করিলে এই বিভীষিকাপূর্ণ ভীষণ চিত্র দেখিয়া মন অস্থির হইয়া উঠে, ধমনীর রক্ত রুদ্ধ হইয়া এক তীব্র যন্ত্রণার উদ্রেক করে। যে দিন সত্য রাজ্য হইতে মনুষ্যের পদ স্খলিত হইয়াছে, ন্যায়-দৃষ্টি হইতে চক্ষু প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে, প্রেমলালসা

হইতে হৃদয় বিতৃষ্ণ হইয়াছে, সেই দিনই এ স্বর্গীয় সংসার গহন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্বসংহারক প্রবৃত্তি নিচয়ের আবাসভূমি হইয়াছে, এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের স্বর্গীয় শ্রী বিনষ্ট হইয়া পার্থিব মলিনতায় পূর্ণ হইয়াছে। অগণ্য জীবন-প্রবাহ পাপস্রোতে শরীর ছাড়িয়া দিয়া বর্ষাকালীন প্রবাহের ন্যায় কাল সমুদ্রে বিলীন হইয়াছে। সংসারসাগরের এই ভীষণ হইতে ভীষণতর অভিনয় দেখিয়া মানবজীবনের পূর্ণলাবণ্য দেখিবার আশা কিরূপে করিতে পারি? যে পরিমাণ মানব জীবন বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পরিমাণই তাহার লাবণ্য হইয়াছে এবং সেই পরিমাণই সৌন্দর্য্য স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়াছে। যে লাবণ্যে জ্যোতি নাই, সে সৌন্দর্য্যে অবিনাশী মাধুর্য্য নাই এবং যে অস্তিত্বে অমরত্ব নাই তাহা পার্থিব রাজ্যের দূষিত, ঘৃণিত ভাব সম্ভূত। তাহা মানবের অস্পর্শনীয় ও পরিত্যাজ্য; বাস্তবিক তাহা প্রকৃত সৌন্দর্য্যে অভিহিত হইতে পারে না এবং সেই অস্তিত্বের স্থায়িত্ব নাই। যে সৌন্দর্য্য দেহের সহিত সংযুক্ত নয়, দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধ্বংশ কস্মিনকালেও সম্ভবে না। শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সংসারক্ষেত্রে যে সকল মহাত্মাদের জীবন পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল এবং যে সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছিল, অদ্যাপিও তাহা অক্ষুণ্ণ ও জলন্ত রহিয়াছে। সেই বিমল সৌন্দর্য্যে এখনও মানবমন মোহিত হয়, এবং তাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্য হইতে অলক্ষিতরূপে রক্ষিত হওতঃ অসত্য রাজ্য হইতে উত্থিত হয়। স্বভাবের কোলে যে জীবন রক্ষিত হয়, সত্যে তাহা স্থিত হইয়া ন্যায়পথে গতি করতঃ পবিত্র প্রেম বিস্তারে

জগৎকে আয়ত্ত করে এবং জীবনের কার্য্য সমষ্টি দ্বারা এক অপরিবর্ত্তনীয় জলন্ত জ্যোতিঃ পৃথিবীতে রাখিয়া পার্থিব লীলা সমাপ্ত করে। সেই অনাহত জ্যোতিঃ হইতে অনন্তকাল যে কিরণ বিকীর্ণ হয়, তাহার লাবণ্যময়ী স্নিগ্ধভাবই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। এ সৌন্দর্য্য কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না—স্মরণ করাইতে হয় না; যখনই মানব নেত্র তাহাতে পতিত হয়, তখনই তাহা পলক রহিত হইয়া স্থিরভাবে সৌন্দর্য্যসুধা পান করে। সে অবিনাশী সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মানবের অস্থির হৃদয় ও চঞ্চলতা পরিহার পূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করে; এবং মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় সেই সৌন্দর্য্যরাশিতে ডুবিয়া থাকে। পৃথিবীর প্রারম্ভকাল হইতে এ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সংসার নাট্যশালায় কত জীবনের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, কিন্তু আজ তাহার পটোদ্ঘাটন করিলে কয়টী অভিনেতৃর অভিনয় চিহ্ন দেখিতে পাইবে? আবার যাহা দেখিব, তাহা কি সম্পূর্ণ? যদি জীবনের অর্দ্ধ চিত্র দেখিতে পাই, তবেই যথেষ্ট; ইহার বেশী আর কোনরূপেই আশা করিতে পারি না। কি আশ্চর্য্য! বাস্তবিক তাহাই দেখিতেছি স্মৃতির দ্বার খোলা মাত্র যে ভীষণ চিত্র উপস্থিত হয়, তাহার পানে তাকাইতে ভয়ে বিহ্বলে চক্ষু স্থির হইয়া যায়। এত অসংখ্য অগণিত অভিনেতৃর আগমন হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকেরও বেশীর চিহ্ন মাত্রও নাই। অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহার মধ্যে কোনটীর এক রেখা, কোনটীর এক আনী, কোনটীর বা কতকাংশ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। এমন কি কোন একটী বিভাগও পূর্ণ জ্যোতিঃ প্রদানে সক্ষম নহে। এক একটী অংশের মধ্যে আবার কত

কাল রেখা পতিত হইয়া সেই নিষ্প্রভ আলোকটীকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে। জীবনের পূর্ণ জ্যোতিঃ দূরে থাকুক, অর্দ্ধ জ্যোতিঃ মধ্যেই কত ভ্রম কালিমার ছায়া পতিত হইয়া কিরণ নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে। এই অন্ধকার পূর্ণ অভিনয় স্থান দর্শন করিয়া বাস্তবিকই হৃদয় কম্পিত হয়। এই সংসার উদ্যানে যতগুলি বৃক্ষ জন্মিয়াছিল, অধিকাংশই প্রায় বিনাফলে জীবনলীলা শেষ করিয়াছে, আর কতক কেবল অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কোনটী পুষ্পিত, কোনটী বা দুই একটী ফল প্রদান করিয়া সংসার উদ্যান শূন্য করতঃ চলিয়া গিয়াছে। যত গুলি ফল পুষ্প দ্বারা এইক্ষণ উদ্যান ভূমিকে শোভান্বিত করিয়াছে, তাহার মধ্যেও কত কলঙ্ক, কত অসার ভাব দেখিতে পাই। পাপকীট স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই, এইরূপ সরস সারবান জীবন এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। এই ভয়ানক অবস্থান্বিত সংসার উদ্যান যে ঈদৃশ ভীষণ ভাব ধারণ করিবে, তাহাত নিশ্চিত কথা। সংসার ক্ষেত্রে মানব জীবনের যে শোচনীয় ভাব দর্শন করিলাম, তাহাতে শাখা পত্র সমন্বিত পুষ্পিত ফলবান বৃক্ষের আশা কত কালে পূর্ণ হইবে, তাহা কল্পনার অতীত। সুতরাং মানব জীবনের পূর্ণ বিকাশ কত কালে হইবে ও কত সময়ে প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিস্তার হইবে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা ধারণা এক প্রকার অসম্ভব। বিকাশের যতগুলি অন্তরায় দেখিতে পাইলাম, তাহার মধ্যে অসত্য, অন্যায় এবং অপ্রেম এই তিনটী সর্ব্ব প্রধান। মানব-জীবন সত্যে গঠিত হইতে না হইতেই অলক্ষিতরূপে অসত্য কীট প্রবেশ করিয়া সত্যের ভীতি শিথিল করিয়া দেয়, তৎপর

অন্যায়কীট অতি অল্পায়াসেই হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ নানা প্রকার গণ্ডগোল করিয়া গতির বিভ্রম জন্মায় এবং পরে অপ্রেমরূপ বৃশ্চিকের বিষম দংশনে মানবগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই ত্রিবিধভাবে মিলিত হইয়া মানবগণ বিষয়রূপ স্বার্থ সমুদ্রে ঝম্প দিয়া কর্ম্মরূপ গরল উৎপন্ন করতঃ হৃদয়কে কলঙ্কিত করে ও চির অশান্তি ভোগ করিতে থাকে। এই প্রকারে আস্তে আস্তে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি শত্রুগণ গৃহে প্রবেশ করিয়া জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। মানব জীবনের অধোগতি এইরূপেই সংঘটিত হইয়াছে। একদিনে কি এক বর্ষে এ পতন হয় নাই এবং অল্প সময়ে উত্থানেরও সম্ভাবনা নাই। এত বিপর্য্যয়ের মধ্যে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে আবার সমস্তের মূলে একটী মাত্র কারণ লক্ষিত হয়। সেই এক কারণ হইতেই সকল বিপদের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। "ঈশ্বরে অবিশ্বাস" এই মুখ্য কারণটীতেই সকল অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। পরম সত্যে অপ্রীতি স্থাপন করিয়াই মানবগণ বিষয় হলাহল পান করিয়াছে এবং সেই বিষের দারুণ জ্বালায় আজ জনসমাজ ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। জাগতিক সকল জীব জন্তু মধ্যে মনুষ্যকে সর্ব্বপ্রধান করিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যকে অনন্ত সৌন্দর্য্যের প্রার্থী করিয়া স্বর্গীয় শোভায় সজ্জিত করিয়াছেন। মানব সমাজের দিকে তাকাইলে তাহাতে প্রেমময়ের প্রেম জ্যোতি দর্শন করিয়া সমস্ত সংসার বিমুগ্ধ হইবে এবং প্রতি জনে সেই অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরের বিমল জ্যোতি দর্শন করিয়া তাহাতেই সকলে চিরমগ্ন থাকিবে। যে সংসার পবিত্রতায় পূর্ণ থাকিবে, তাহা কি না

আজ পাপরূপ পিশাচের আধিপত্যে নরকের বিভীষিকা দর্শন করাইতেছে। অসংখ্য অসংখ্য প্রাণীকে ভোগলালসা-রূপ লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। নরক সদৃশ এই ভীষণ চিত্র দর্শন করিয়া কে স্থির থাকিতে পারে? সম্মুখে এই আতঙ্ক পূরিত ভীষণ চিত্র দেখিয়াও কি এখনও আমরা মোহ নিদ্রায় মগ্ন থাকিব? এখনও কি নিশ্চিন্ত মনে প্রবৃত্তির দাসত্বেই নিযুক্ত থাকিব? যদি ইহা দেখিয়াও এই অসার প্রাণ জাগ্রত না হয়, তবে জানিলাম, এ পৃথিবীতে আমাদের আর উদ্ধার নাই। অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইতে হইবে, এবং এই অন্যায় কার্যের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অতি কঠোর অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইতে হইবে। হায়! আজ যে মোহে অভিভূত হইয়া আপন সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিতে বসিয়াছি, জানি না ইহার পরিণাম দুদিন পরেই যে ইহার জন্য আমাকে ভয়ানক যাতনায় দগ্ধ করিবে এবং কত সুদীর্ঘ সময় এই ভীষণ যাতনায় অস্থির থাকিতে হইবে, এখনও তাহা বুঝিলাম না। আমার ক্ষণভঙ্গুর দেহ, এই অস্থায়ী জীবন, কালস্রোতে এক দিন বিলীন হইবে। এই যে পার্থিব সৌন্দর্য্য, যে লাবণ্যে পৃথিবীর কীট বাস করে, তাহাও কালের মহাগ্রাসে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যে বাকচাতুর্য্যে আজ জগতের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছি, তাহারও মর্ম্ম প্রকাশ হইয়া পড়িবে, ইহার সমস্তই ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে। সময় প্রভাবে সকলই বিলীন হইবে, কিন্তু থাকিবে কি? থাকিবে জীবনে যদি কোন মনুষ্যোচিত কার্য্য করিয়া থাকি যদি ন্যায় পথে থাকিয়া কাহারও কোন উপকার করিয়া

থাকি, যদি সত্যভাবে উদার প্রেমে মিলিত হইয়া পবিত্র কার্য্য সাধন করিয়া থাকি, কেবল তাহাই থাকিবে। তাহাই কেবল অনন্তকাল সঙ্গের সঙ্গী হইয়া বিমল সুখ শান্তি বিতরণ করিবে! শত শত বর্ষ গত হইল, পার্থিব উদ্যানে পুষ্প বিকশিত হইয়া কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। ফুল গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার কার্য্য আজও ফুরায় নাই। তাহার সুগন্ধ এখনও হয়ত জনসমাজে বিস্তার হইয়া মানবমন পুলকিত করিতেছে। যখন এই ভৌতিক রাজ্যের গুণও কত সহস্র বর্ষ অবস্থিতি করে, তখন অবিনাশী মানব সৌন্দর্য্যের বিনাশ কোথায়? ইহকাল পরকাল সকল সময়েই এই সৌন্দর্য্য সাথের সাথী থাকিয়া আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করিবে। জীবন পৃথিবী হইতে যাইবে বটে, কিন্তু জীবনের ভাব টুকু স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য টুকু চিরকাল জলন্তভাবে জগতে অঙ্কিত থাকিবে। আমরা অমূল্য অক্ষুণ্ণ সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়া কেন নিজ দোষে হারাইতে বসিয়াছি? কেন সেই স্বর্গীয় রত্ন তুচ্ছ করিয়া মৃত্যু-মুখে গমন করিতেছি? আমাদের সেই অস্বাভাবিক গর্ভ্ত বিষসদৃশরুচি দেখিয়া কি বুঝিয়াছি? ইহাই কি জানিতেছি না যে, আমরা অসত্যের ভীষণ আঁধারে নিমজ্জিত হইয়া প্রকৃত জ্ঞান হারাইয়াছি; ন্যায় পথ ভ্রষ্ট হইয়া দুঃখ যন্ত্রণার আশ্রয় লইয়াছি। যদি আমাদের মধ্যে সত্যের বন্ধনী দৃঢ় থাকিত, ন্যায় জ্যোতিঃ তীক্ষ্ণ থাকিত, আর প্রেম প্রীতির প্রবল আকর্ষণ থাকিত, তবে কখনই এই বিপদ সঙ্কুল অবস্থা আমাদের মধ্যে স্থান পাইত না। এইক্ষণ এই দুঃখকর অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহাতে অসত্য ও অন্যায়ের গতি রোধ করিতে পারি, জীবনের পাপ

সমূলে নিঃশেষ করিতে পারি, তাহার জন্য সংস্বরূপে প্রাণ মন উৎসর্গ করি, এবং ন্যায়বান পিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হই। তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই আমাদের অবস্থা আবার ফিরিবে। আবার আমাদের প্রাপ্য সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া জীবন সৌন্দর্য্যময় করিয়া সুখী হইতে পারিব।

উৎসব উপলক্ষে অন্নপূর্ণা সন্তানগণের পাঠের জন্য লিখিয়াছেন।

ওহে পিতা দয়াময় করুণানিলয়।
সকলের প্রাণ দাতা মঙ্গল আলয়॥
জীবন দিয়াছ তুমি করিছ পালন।
আবার অন্তিমে তুমি ক[illegible]ব গ্রহণ॥
তব কৃপা সমভাবে পায় জীবগণ।
ইহার অন্যথা নাথ না হয় কখন॥
অপার তোমার দয়া বুঝিব কেমনে।
অবোধ বালিকা আমি কিছুই জানিনে॥
কৃপা করি যদি দেখা দেও স্নেহময়।
অবশ্য হইব আমি সংসারে নির্ভয়॥
পুণ্যের সোপান তুমি জ্ঞানের আধার।
বালিকা শরণ লয় চরণে তোমার॥
জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতা বল বুদ্ধি যত।
সরল সুমতি দিয়ে রাখিবে সতত॥

চিরকাল তব কাছে রাখিবে ইহারে।
নিয়োগ করিবে সদা পর উপকারে॥
আর কি প্রার্থনা নাথ জানাব তোমাকে।
আজীবন তব কাযে মতি যেন থাকে।

হতেছে আনন্দ কিসের লাগিয়া,
সবে দেখি আজ কায তেয়াগিয়া,
বিষাদ জড়তা সব পাসরিয়া ;
মনের আনন্দে করিছে উৎসব।
সকলের পিতা সকলের মাতা,
অখিল তারণ জগতের ধাতা,
আসিবেন শুনি আমাদের হেতা ;
তাই মন দিয়ে করি হে উৎসব॥
তিনি আমাদের জীবনের ধন,
তাঁ হ'তে পেয়েছি দেহ বুদ্ধি মন,
সকলে তাঁ হ'তে করি দরশন ;
এমন পিতায় কে পাসরি থাকে।
এস ভাই বোন সকলে মিলিয়ে,
সে দয়াল নাম বদন ভরিয়ে,
করি অবিরাম গগন কাঁপায়ে ;
জীবনের বল যতক্ষণ থাকে॥
ওহে দয়াময় পিতা সবাকার,
সন্তানে গ্রহণ কর গো এবার,

সরল হৃদয় থাকিতে মোদের ;
তোমাতে জীবন দোলাইয়া দেও।
শৈশবে তোমার অধীন হইলে,
চিরকাল রব স্বভাবের কোলে,
সকল যাতনা ঘুচিবে তা হ'লে ;
এ বাসনা পূরণ করিয়া দেও ॥

সম্বৎসর পরে,
পুনঃ এই ঘরে,
উৎসবের স্রোত বহিয়া পরাণে।
জাগাইল মোরে মধুর আহ্বানে ॥
অমিয় সাগরে,
ভাসাবার তরে,
প্রেমময় পিতা প্রসারিয়া স্নেহ।
খুলিয়া দিলেন প্রেমের প্রবাহ ॥
তাঁহার আহ্বান,
শুনিয়া পরাণ
পুলকে পূরিল, না সরে বচন।
এস গো পূজিগে তাঁহার চরণ ॥
প্রাণ মন খুলে,
ভাই বোন মিলে,
সম স্বরে ডাকি হৃদয় ভরিয়া।
দুঃখের জীবন যাউক চলিয়া ॥

ধন্য প্রেমময়,
ধন্য দয়াময়,
আনন্দ উৎসব জীবনে আনি।
কৃতার্থ করিলে দাসের পরাণি॥
করি প্রণিপাত,
বিনয়ের সাথ,
প্রীতি উপহার কর গো গ্রহণ।
তোমাতে সঁপিনু মম এ জীবন।

উৎসব দেখিয়ে, পুলকিত হয়ে
মিলিনু এখানে আসি।
ভাই ভগ্নীগণ, হয়ে একমন,
পিতায় ডাকিছে বসি॥
শুনিয়া সে ডাক, হলেম অবাক,
জানি না কি ভাব হ'ল।
জীবনের দশা, ভাবিয়া সহসা,
আকুলিত প্রাণ হ'ল॥
কোথায় ছিলাম, পাসরি এলাম,
চক্ষু পেয়ে তবু অন্ধ।
পিতায় ভুলিয়ে, স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে,
এমতি হয়েছে মন॥
পিতার আদেশ, না পালি অশেষ,
যাতনা পেলাম কত।

লোকের গঞ্জনা, শুনি কত নানা,
কাটালেম কাল এত ॥
দয়ার সাগর, গুণের আকর,
অধমতারণ হরি।
কৃপাদান করি, সন্তান তোমারি,
স্নেহসূত্রে রাখ ধরি ॥
বহুদিন পরে, আসিলাম ঘরে;
শুনিয়া তোমার বাণী।
তোমার প্রসাদে, তরিব বিপদে,
মনেতে নিশ্চয় জানি ॥
অতি অকিঞ্চন, তোমার সন্তান,
অস্থির প্রকৃতি ভারি।
ব্যাকুলিত হয়ে, কাতর হৃদয়ে,
মাগিছে কৃপা তোমারি ॥

উৎসব আসিল, হৃদয় জাগিল,
আনন্দে ভাসিল মন।
দাদা দিদি সনে, মিলিয়ে এখানে,
প্রেমেতে বাঁধিব মন ॥
যিনি সবাকার, হন মূলাধার,
তিনি পিতা স্নেহময়।
ধুলা খেলা ভুলে, এস গো সকলে,
গাইব তাঁহারি জয় ॥

ধন্য দয়াময়, হইয়ে সদয়,
অবোধ বালক ব'লে।
করিতে গ্রহণ, এ ক্ষুদ্র জীবন,
এসেছেন হেতা চলে॥
থাকিব না ভাই, এস ত্বরা যাই,
পিতার চরণে সবে।
পিতার বচন, করিলে শ্রবণ,
অমর হইব ভবে॥
কোথা অন্তর্য্যামী, হৃদয়ের স্বামী,
জানিনে ডাকিতে মোরা।
জানিনে পূজিতে, জানিনে ভজিতে,
জীবন চাঞ্চল্য ভরা॥
যদি কৃপা করি, দেখা দেও, হরি
সংসার দুর্গম পথে।
শিশু-প্রাণ লয়ে, ভয় শূন্য হয়ে,
থাকিব তোমার সাথে॥
ওহে স্নেহময়, পিতা দয়াময়,
সন্তানে গ্রহণ কর।
প্রদানি সুমতি, রাখ এ মিনতি,
সৎকার্য্যে নিযুক্ত কর॥

আহা কি আনন্দ হেরি এই গৃহে,
কাহারই মুখ বিষাদিত নহে,

সবাই প্রফুল্ল অতীব উৎসাহে ;
গায় ব্রহ্ম নাম বদন ভরিয়া।
চারিদিক আজ ধ্বনিত করিয়া॥

বিষাদের ভাব কোথা নাই আর,
সবার হৃদয়ে আনন্দ অপার,
আমারও প্রাণে আহ্লাদ অপার ;
এ রমণীয় চিত্র নয়নে হেরি।
কি যে ভাব হল বলিতে না পারি॥

যাঁহার কৃপায় সুখের হিল্লোল
বহিয়া করিল সকলে আকুল,
এস গো আমরা হইয়া ব্যাকুল
গাই তাঁর নাম সরল পরাণে ;
ফুটাই মোদের জীবন প্রসূনে॥

ওহে কৃপাময় করুণা নিদান,
তুমি আমাদের সকলের প্রাণ,
ডাকিছ সকলে দিতে পরিত্রাণ ;
খুলিয়া তোমার উৎসবের দ্বার।
অজ্ঞান সন্তানে দেও করি পার॥

কর বর দান যত দিন রব।
তোমারি আদেশ পালন করিব।
তব নাম গেয়ে জীবন কাটাব।
তোমাতেই অটল রাখিয়া মতি॥

দেখ ভাই বোন কি আনন্দ আজ,
সবাই বলিছে জয় বিশ্বরাজ,
ভুলিয়া অসার সংসারের কাজ,
কাতর প্রাণেতে ডাকিছে পিতায়।
সাধিতে আজিকে জীবনের কাজ,
সবাই উতলা মথিয়া সমাজ,
পিতার তরেতে করিছে বিরাজ,
এ দৃশ্য দেখিয়া নয়ন জুড়ায়।
আমরা অবোধ বালক বালিকা,
এ সনে ফুটায়ে বিশ্বাস কলিকা,
আনন্দে উঠায়ে ব্রহ্মের পতাকা,
জয় ব্রহ্ম জয় সকলে বলি।
পিতার প্রেমেতে মাতায়ে জীবন,
করি জয়ধ্বনি কাঁপায়ে ভুবন,
* * * *

উপসংহার।

বন্ধুবর্গের সাহায্যে অন্নপূর্ণা চরিত ও অন্নপূর্ণার রচিত প্রবন্ধাবলী, এবং বন্ধুগণের মন্তব্য সহ, মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। ইহা যেরূপে মুদ্রিত হওয়া উচিত ছিল, নানা কারণবশতঃ সেইরূপ সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইতে পারিল না; কারণ আমি অন্নপূর্ণার মৃত্যুর পরে দুই বৎসর কাল উন্মাদাগারে থাকিয়া

সর্ব্বস্বান্ত ও নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি; তাহার পরে আবার প্রিয়তম পুত্র সুহৃদের বিয়োগজনিত শোকে হৃদয় ভগ্ন হইয়াছে, হাতে কিছু মাত্র সম্বল নাই। এমত অবস্থায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী রায় জমিদার মহাশয়ের সাহায্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা প্রাপ্ত হইয়া, অতীব সংক্ষেপে জীবন চরিতাংশ লিখিতে প্রবৃত্ত হই। তৎপর অন্যান্য সহৃদয় বন্ধুগণের সাহায্য পাইয়া মন্তব্য এবং প্রবন্ধাবলী মুদ্রিত করিতে সাহসী হই।

পাঠকগণ, অন্নপূর্ণার প্রাত্যহিক বিস্তৃত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও আলোচনা, ইহাতে দেখিতে পাইবেন না। সংক্ষেপ করাতে জীবনের সমস্ত বিষয় আমি এবার লিখিয়া উঠিতে পারিলাম না। নূতন লেখক বলিয়া বিষয়গুলি যথাস্থানে, যথোপযুক্তরূপে সন্নিবেশিত হয় নাই; নিজের অযোগ্যতায়, ভাষার অক্ষমতায়, কোন কোন স্থলে অনাবশ্যকীয় প্রসঙ্গ দেখিয়া বিরক্ত হইবেন। অনেক স্থলে ভাবও পরিস্ফুট হয় নাই; বলিতে গেলে এবার জীবন চরিতের কতকগুলি উপাদান মাত্র সংগৃহীত হইল। তবে পাঠকগণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বন্ধুগণের মন্তব্য ও অন্নপূর্ণার প্রবন্ধাবলী সমস্ত অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে, তিনি যে বিশেষ প্রতিভাশালিনী, প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণা নারী ছিলেন, তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। তিনি শৈশবকাল হইতে শিক্ষার বিশেষ সাহায্য পান নাই, অথচ স্বাভাবিক বিদ্যানুরাগ, আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি, বিনম্র স্বভাব বশতঃ অশেষ অন্তরায় সত্ত্বেও যত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি আধুনিক বঙ্গনারী-সমাজে উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইবেন। যদি তিনি শৈশবকাল হইতে উপযুক্ত রূপ শিক্ষা পাইতেন, তাহা হইলে

নারীসমাজের উচ্চতম শিক্ষার স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। তিনি স্বীয় অধ্যবসায় দ্বারা, পিতৃগৃহে, স্বামীগৃহে ও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আলাপে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহাও নিতান্ত সামান্য নহে। সর্ব্বোপরি তাঁহার জীবনের প্রধান ভূষণ "ঈশ্বরভক্তি", "সত্য নিষ্ঠা", "সরলতা", ও "নিস্পৃহতা" প্রভৃতি ধর্ম্মভাব বিশেষ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল; বলিতে গেলে তিনি জীবনে ধর্ম্ম প্রচারের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার একাদশটী সন্তান হইয়াছিল, তাহাদের প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে কত কষ্ট ভোগ ও কীদৃশ সহিষ্ণু হইতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার পর আবার নিয়মিতরূপ "উপাসনা" ও ধ্যান ধারণা এবং সভাসমিতিতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। অবশেষে গৃহদাহে, স্বামীর উন্মাদ রোগে, সর্ব্বস্বান্তেও পরমেশ্বরের প্রতি অটল নির্ভর রাখিয়া যে আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকেরই শিক্ষনীয়। অন্নপূর্ণার জ্ঞানকৃত অপরাধ সামান্যই ঘটিয়াছে। কোন কোন সময় স্বামীর নির্দ্দয় ও নিদারুণ ব্যবহারে তাঁহাকে যে অপরাধী হইতে হইয়াছে, তাহা দুর্ব্বল বঙ্গনারীর পক্ষে মার্জ্জনীয়। সজ্জনগণ, দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণই গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিশেষ জনসমাজে, দোষাংশ উদ্ঘাটন করিয়া ফল নাই। গুণাংশ মাত্রই শিক্ষণীয়, এই জন্য পণ্ডিতগণ, জীবন চরিতে, উজ্জ্বল, শুভ্র ধর্ম্মজীবন ও কার্য্যশীল জীবনই প্রকাশ করিয়া থাকেন; দুর্ব্বল, অন্ধকার অপূর্ণতা প্রকাশে কোনও উপকার হয় না বলিয়া তাহা চিরকাল অপ্রকাশিত থাকে।

অন্নপূর্ণার যে কোনই দোষ ছিল না ইহা বলিতে পারি না, কিন্তু গুণের সঙ্গে তুলনায়, সে দোষ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষণীয়।

এবার মুদ্রাঙ্কনে যাঁহাদের নিকট হইতে যে সাহায্য পাইয়াছি ও যে আশ্বাস পাইয়াছি তাহা এ সঙ্গে মুদ্রিত হইল।

এবারে অন্নপূর্ণা চরিত সহস্র খণ্ড মুদ্রিত হইল। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ এক টাকা। যদি ঈশ্বর কৃপায় শীঘ্র সমস্ত পুস্তক বিক্রয় হইয়া যায় তাহা হইলে অবশিষ্ট অর্থে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেপারিলে যতদূর সুন্দর করা যাইতে পারে, তাহা করিবার ইচ্ছা রহিল।

দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কনের উপযুক্ত অর্থ না হইলে, তাঁহার কোন রূপ স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা হইবে। বগুড়া সুতরাপুরে অন্নপূর্ণার নির্জ্জন উপাসনার প্রিয় পুষ্প বাটীকায় তাঁহার সমাধি স্থাপিত হইয়াছে ও স্বতন্ত্রভাবে স্মৃতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে।

লেঃ—

শ্রীশ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়।

সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার।

যে সকল মহোদয় ও মহোদয়াগণ এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যের জন্য যত দান করিয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু বিপীনবিহারী রায় জমিদার মাণিকদহ ... ৫০৲

" " অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী ডাক্তার জয়পুর ... ২৫৲

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণেন্দ্রনাথ সরকার জমিদার মাদলা ...	১০৲
„ „ বরদাকান্ত বসু বি, এ, ময়মনসিংহ ...	১০৲
„ ছৈয়দ অলি উল্লা সাহেব জমিদার বগুড়া ...	১০৲
„ বাবু কালীমোহন দাস ডাক্তার বগুড়া	৫৲
„ „ „ „ ডাক্তারের স্ত্রী বগুড়া ...	১৲
„ „ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বগুড়া	৫৲
„ „ নৃত্যগোপাল সান্যাল „	৫৲
„ „ কেদারনাথ সাহা মোক্তার বগুড়া ...	৫৲
„ „ পূর্ণচন্দ্র গুহ শিলচর	৫৲
„ „ গুরুচরণ মহালানবিশ কলিকাতা	৫৲
„ „ নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় দোগাছি ...	৫৲
„ সাহ নজমদ্দিন আবুল হোসেন জমিদার বগুড়া ...	৫৲
„ বাবু গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল নীলফামারী ...	৪৲
„ „ ভাগবচ্চন্দ্র রায় উকীল বগুড়া	৫৲
„ „ যোগেশচন্দ্র মজুমদার বগুড়া	২৲
„ „ পূর্ণচন্দ্র দাস বগুড়া	৩৲
„ „ শ্রীমন্ত রায় কবিরাজ বগুড়া	২৲
„ „ „ „ কবিরাজের স্ত্রী বগুড়া ...	১৲
„ „ বনমালী দেব কবিরাজ বগুড়া	২৲
„ „ কৃষ্ণগোপাল সান্যাল খাজাঞ্জি বগুড়া ...	২৲
„ „ উমানাথ মজুমদার বগুড়া	২৲
„ „ উৎসবচন্দ্র মৈত্রেয় ইঃ সব ইনস্পেক্টার বগুড়া	২৲
„ „ রাজেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত কবিরাজ বগুড়া ...	২৲
„ „ কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বগুড়া	২৲
„ „ মহেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ...	২৲
„ „ ললিতচন্দ্র দাস বগুড়া	২৲
„ „ মোহিনীমোহন বসু বি, এ, হেড মাষ্টার জিলা স্কুল বগুড়া	২৲
„ „ রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী বগুড়া	২৲

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত মজুমদার উকীল বগুড়া ... ২৲
" " রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইঃ সব ইন্‌স্পেক্টার বগুড়া ২৲
" " শশীকান্ত বসু বগুড়া ... ... ২৲
" " বেণীমাধব চাকি বি, এল, বগুড়া ... ২৲
" " গৌরগোপাল রায় " ... ২৲
" " রাজকিশোর চৌধুরী " ... ২৲
" " বৈদ্যনাথ সান্যাল বি, এল " ... ২৲
" " মধুসূদন সান্যাল " ... ২৲
" " বৈকুণ্ঠনাথ খাঁ উকীল " ... ২৲
" " রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় টাঙ্গাইল ... ১৲
" " কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী সাহাজাদপুর ... ১৲
" " যাদব চন্দ্র ব্রহ্ম সন্তান বগুড়া ... ... ১৲
" নিমাই চাঁদ সন্ন্যাসী চান্দাইকোণা ... ১৲
" " গিরীশ চন্দ্র মৈত্রেয় ডেমাজানি ... ... ১৲
" " দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী কুন্দগ্রাম ... ... ১৲
" " সারদানাথ খাঁ বগুড়া ... ... ১৲
শ্রীমতী হরিসুন্দরী হালদার কলিকাতা ... ... ১০৲
" রাধারাণী হালদার " ... ... ৫৲
" দুর্গাসুন্দরী দেবী বগুড়া ... ... ৫৲
" প্রসন্নময়ী দেবী বগুড়া ... ... ১৲
" সুকুমারী চট্টোপাধ্যায় বগুড়া ... ... ১৲
" সুমতি চট্টোপাধ্যায় " ... ... ১৲
অগ্রিম মূল্য বাবদ ময়মনসিংহ হইতে শ্রীমতী সুশীলা বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ... ... ১০৲

যাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারি শঙ্কর দাস গুপ্ত এল, এম, এস, বগুড়া ৫৲
" " মধুসূদন ঘোষ ডাক্তার বগুড়া ... ... ৫৲
" " সাত আনীর কর্ত্তা জমিদার বগুড়া ... ৫৲

15/20 IMPERIAL